ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১৪০১ঃ২

প্রণব কুমার ভট্টাচার্য	ইতিহাসে মুদ্রার উপাদানঃ প্রসঙ্গ প্রাচীন বঙ্গদেশ
মোঃ গোলাম মরতুজা	প্রাচীন বাংলার নগর সভ্যতার বিকাশ ও রূপরেখা
মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকী	যশোহর জেলার নামকরণঃ একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
মুহম্মদ মনিরুজ্জামান	রঙ্গপুরে রাজা রামমোহন রায়ের মন্দির ও একটি বিতর্ক
সফর আলী আকন্দ	১৯৪৭ সালে ভারত বনাম পাকিস্তান প্রশ্নে সিলেটে গণভোট ও র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ
মোঃ মাহবুবর রহমান	১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনঃ নির্বাচনী কর্মকাণ্ডের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
সন্দীপক মল্লিক	প্রাবন্ধিক-এর বিশ্ববীক্ষাঃ প্রেক্ষিৎ-বাংলাদেশ
আবু তাহের বাবু	বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা এবং শিল্পী রশীদ চৌধুরী
এম. ফয়জার রহমান	টোটেমবাদঃ আদিম সমাজের একটি বিশ্বাস
সুলতানা মোসতাফা খানম	নিঃশব্দ আততায়ীঃ মূল্যবোধ ও প্রথা প্রতিষ্ঠান
মোঃ ছাদেকুল আরেফিন	বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষায় এবং সামাজিক গবেষণায় মাঠ পর্যায়ের তথ্যসংগ্রহে সমস্যাঃ একটি পর্যালোচনা
ইসরাত জাহান রূপা	তামাকবলে কর্মরতা নারীশ্রমিকঃ মাঠ পর্যায়ে তথ্যভিত্তিক একটি জরীপ প্রতিবেদন
এ.এইচ.এম.মোস্তাফিজুর রহমান	বি.আর.ডি.বি'র গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন প্রয়াসঃ একটি মূল্যায়ন
ঝরনা নাথ	'সিডও' কনভেনশনঃ নারী অধিকার ও বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন
এম. জয়নুল আবেদীন	জাতীয় বাজেট ১৯৯৫-৯৬ ও কতিপয় প্রস্তাবনা

আই.বি.এস জার্নাল

সম্পাদকমণ্ডলী

শাহানারা হোসেন
ইতিহাস বিভাগ, রা.বি.
আ. ন. শামসুল হক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রা. বি.
খন্দকার আব্দুর রহিম
বাংলা বিভাগ, রা.বি.
এ. এইচ. এম. জেহাদুল করিম
সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, রা. বি.

এস. এ. আকন্দ
সামাজিক ইতিহাস, আই.বি.এস.
এ. কে. এম. সিরাজুল ইসলাম
কৃষি অর্থনীতি, আই.বি.এস.
প্রীতি কুমার মিত্র
ইতিহাসতত্ত্ব, আই.বি.এস.
এম. জয়নুল আবেদীন
অর্থনীতি, আই.বি.এস.

মাহ্‌মুদ শাহ্‌ কোরেশী
সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস;
পরিচালক, আই.বি.এস.

প্রবন্ধে উদ্বৃত্ত তথ্য ও মতামতের জন্য ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ-এর কোনো দায়-দায়িত্ব নাই।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ
সম্পাদক, আই.বি.এস. জার্নাল
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী ৬২০৫
বাংলাদেশ।

আই.বি.এস. জার্নাল

১৪০১ঃ২

মাহ্‌মুদ শাহ্‌ কোরেশী
সম্পাদিত

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশকঃ
মোফাজ্জল হোসেন
সচিব, আই.বি.এস.
ফোনঃ ৪৮৫৩

প্রকাশ কালঃ
চৈত্র ১৪০১
এপ্রিল ১৯৯৫

মূল্যঃ ৫০.০০ টাকা

প্রচ্ছদ শিল্পীঃ
ডঃ আবু তাহের বাবু

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণঃ
সোনালী প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং লিঃ
এ/১৭৪ শিল্প নগরী, রাজশাহী। ফোনঃ ৫৮৪২

সূচীপত্র

প্রণব কুমার ভট্টাচার্য	ইতিহাসে মুদ্রার উপাদানঃ প্রসঙ্গ প্রাচীন বঙ্গদেশ	১
মোঃ গোলাম মরতুজা	প্রাচীন বাংলার নগর সভ্যতার বিকাশ ও রূপরেখা	১৭
মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকী	যশোহর জেলার নামকরণঃ একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	৩৫
মুহম্মদ মনিরুজ্জামান	রঙ্গপুরে রাজা রামমোহন রায়ের মন্দির ও একটি বিতর্ক	৪৫
সফর আলী আকন্দ	১৯৪৭ সালে ভারত বনাম পাকিস্তান প্রশ্নে সিলেটে গণভোট ও র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ	৫৫
মোঃ মাহবুবর রহমান	১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনঃ নির্বাচনী কর্মকাণ্ডের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা	৮৫
সন্দীপক মল্লিক	প্রাবন্ধিক-এর বিশ্ববীক্ষাঃ প্রেক্ষিৎ-বাংলাদেশ	১২৫
আবু তাহের বাবু	বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা এবং শিল্পী রশীদ চৌধুরী	১৩৩
এম. ফয়জার রহমান	টোটেমবাদ ঃ আদিম সমাজের একটি বিশ্বাস	১৪৩
সুলতানা মোসতাফা খানম	নিঃশব্দ আততায়ী ঃ মূল্যবোধ ও প্রথা প্রতিষ্ঠান	১৬১
মোঃ ছাদেকুল আরেফিন	বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষায় এবং সামাজিক গবেষণায় মাঠ পর্যায়ের তথ্যসংগ্রহে সমস্যা ঃ একটি পর্যালোচনা	১৭৭
ইসরাত জাহান রূপা	তামাককলে কর্মরতা নারীশ্রমিকঃ মাঠ পর্যায়ে তথ্যভিত্তিক একটি জরীপ-প্রতিবেদন	১৮৭
এ.এইচ.এম.মোস্তাফিজুর রহমান	বি.আর.ডি.বি.-র গ্রামীণ দারিদ্র্যবিমোচন প্রয়াস ঃ একটি মূল্যায়ন	২০১
ঝরণা নাথ	'সিডঅ' কনভেনশনঃ নারী অধিকার ও বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন	২১৭
এম. জয়নুল আবেদীন	জাতীয় বাজেট ১৯৯৫-৯৬ ও কতিপয় প্রস্তাবনা	২২৫

প্রবন্ধকার পরিচিতি

প্রকাশিত প্রবন্ধের ক্রমানুসারে

ডঃ প্রণব কুমার ভট্টাচার্য	ঃ	উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের (শিলিগুড়ি) ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর
জনাব মোঃ গোলাম মরতুজা	ঃ	পি-এইচ.ডি. ফেলো, আই.বি.এস; খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবান ও রুরাল প্লানিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক
ডঃ মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকী	ঃ	সাবেক পি-এইচ.ডি. ফেলো, আই.বি.এস; সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
জনাব মুহম্মদ মনিরুজ্জামান	ঃ	পি-এইচ.ডি. ফেলো, আই.বি.এস; রংপুর কারমাইকেল কলেজের ইসলামের ইতিহাসের সহযোগী অধ্যাপক
ডঃ সফর আলী আকন্দ	ঃ	সাবেক পরিচালক; সামাজিক ইতিহাসের পুনর্নিয়োগপ্রাপ্ত প্রফেসর আই.বি.এস
ডঃ মোঃ মাহবুবর রহমান	ঃ	প্রাক্তন পি-এইচ.ডি. ফেলো, আই.বি.এস; প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ডঃ সন্দীপক মল্লিক	ঃ	ওরফে অনাথবন্ধু মল্লিক; সাবেক এম. ফিল. ফেলো, আই.বি.এস; পি-এইচ.ডি. (ঢাকা)। অধ্যাপক, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ
ডঃ আবু তাহের বাবু	ঃ	এম. এফ. এ. (বরোদা); সাবেক পি-এইচ.ডি. ফেলো, আই.বি.এস; সহকারী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
জনাব এম. ফয়জার রহমান	ঃ	পি-এইচ.ডি. ফেলো, আই.বি.এস; সহযোগী অধ্যাপক, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ডঃ সুলতানা মোসতাফা খানম	ঃ	সহযোগী অধ্যাপক, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
জনাব মোঃ ছাদেকুল আরেফিন	ঃ	এম. ফিল, আই.বি.এস; পি-এইচ. ডি. ফেলো, আই.বি.এস. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
বেগম ইসরাত জাহান রূপা	ঃ	এম.ফিল, আই.বি.এস; পি-এইচ.ডি. ফেলো আই.বি.এস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
জনাব এ.এইচ.এম.মোস্তাফিজুর রহমান	ঃ	সহযোগী অধ্যাপক, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ডঃ ঝরণা নাথ	ঃ	প্রফেসর, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ডঃ এম. জয়নুল আবেদীন	ঃ	সাবেক পি-এইচ.ডি. ফেলো, আই.বি.এস; অর্থনীতির সহযোগী অধ্যাপক, আই.বি.এস

ইতিহাসে মুদ্রার উপাদানঃ প্রসঙ্গ প্রাচীন বঙ্গদেশ

(একটি আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা)

প্রণব কুমার ভট্টাচার্য

প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন শাখায় নানাবিধ গবেষণা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। গতানুগতিক চিন্তা ধারার গণ্ডি পেরিয়ে নুতন করে আর্থ-সামাজিক ব্যাখ্যার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, কারণ এর দ্বারাই ইতিহাসের রহস্য উদ্ভাবন সম্ভব।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় - তার উপাদান। বর্তমান প্রবন্ধে প্রাচীন ইতিহাসের অন্যতম বিশিষ্ট উপাদান অর্থাৎ ইতিহাসে মুদ্রার উপাদানঃ প্রসঙ্গ প্রাচীন বঙ্গদেশ (একটি আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা) এই শীর্ষক বিষয়ে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

বিষয়টি খুব ব্যাপক – আমি আলোচনাটি কয়েকটি স্তরে বিন্যাস করেছি – প্রথমে মুদ্রার গুরুত্ব বিষয়ে মানুষের আগ্রহ ও চেতনাবোধ। এরপর ভারতবর্ষের ইতিহাস-রচনায় এর প্রয়োগ, পরিশেষে মূল্যবান ধাতুর আদান-প্রদান সম্ভাব্য আকর ও মূল্যমান এবং বঙ্গভূমিতে মুদ্রার প্রচলন ছিল কি ছিল না – এর ভৌগোলিক সীমারেখা – প্রকৃতি সংক্রান্ত কয়েকটি জটিল বিষয়ের সম্যক পর্যালোচনা ও কিছু সমাধানের প্রতি ইঙ্গিত।

মুদ্রাবিজ্ঞান, যাকে ইংরাজীতে বলা হয় Numismatics, মূলতঃ ইতিহাস, শিল্পকলা এবং অর্থনীতির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ঐতিহাসিক ব্যাবেলনের মতে মুদ্রাবিজ্ঞানের সূচনা হয়েছিল অষ্টাদশ শতকে, উনবিংশ শতক ইহা কৈশোরে পদার্পণ করে এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই ইহার যৌবনপ্রাপ্তি ঘটে। "..... it was infantile until the eighteenth century .... it was adolescent through much of the nineteenth century, and adult only from the late nineteenth century onwards."[১]

ঐতিহাসিকদের মতে আনুমানিক ছয়শত খৃষ্টপূর্বাব্দে পশ্চিম এশিয়া মাইনরে মুদ্রার জন্ম হয়। তারও আগে থেকে অবশ্য ওজন করে ধাতুর খণ্ড প্রস্তুত করার রীতি প্রাচীন জগতে অজানা ছিল না – বিশেষ করে পেশাদারী সৈনিকদের ব্যয়ভার বহন করবার তাগিদে। তবে বিভিন্ন যুগে প্রচলিত মুদ্রার তালিকা প্রস্তুত করার উপযোগিতা প্রথম অনুভূত হয় রেনাসাঁসের সময় থেকে। কাজটি খুব সহজ ছিল না, তথাপি সপ্তদশ শতকে অ্যাণ্ড্রোমোরেল যত্ন করে ২৫ হাজার মুদ্রার কথা লিপিবদ্ধ

করেন। এরপর অষ্টাদশ শতকে টি. ই. সিওনেট। তিনি ১০/১২ হাজার গ্রীক মুদ্রার তালিকা প্রস্তুত করার উদ্দেশ্য নিয়ে ২০ হাজারের বেশী তালিকাভুক্ত করেন। পরে অবশ্য এই তালিকা বেড়ে ৫০ হাজারের বেশী হয়ে যায়। এইভাবে মুদ্রার তালিকা প্রস্তুত করার কাজে কোন সময়ই সম্পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত পণ্ডিত জন এভেলিন মুদ্রাকে 'মেডেল' আখ্যায় ভূষিত এবং বেশ কবিত্ব করে বলেছিলেন যে ইহা প্রাচীন যুগের সবচেয়ে স্থায়ী এবং কালজয়ীমুখর ঐতিহাসিক উপাদান।

"The most lasting and (give me leave to call them vocal monuments of Antiquity, ... they seems to have broken and worn out the very teeth of time, that devours and tears in pieces all things....."[২]

স্মরণ করা যায় যে দ্বাদশ শতকে ব্যবহৃত ল্যাটিন শব্দ 'মেডাল্লা' (Medalla or Medalia) এবং ইটালি ভাষায় 'মেডাগ্লিয়া' (Medaglia) বলতে 'অর্দ্ধডেনিয়া' অথবা 'ওবোল' এবং পরে 'গ্রোসো' মুদ্রা বোঝাত। পরে এই মুদ্রাগুলি অপ্রচলিত হয়ে যায়। পঞ্চদশ শতকে 'মেডাগ্লিয়া' বলতে পূর্বযুগের মুদ্রাকে বোঝাত, অর্থাৎ যাহা মুদ্রার মতন দেখতে হলেও প্রকৃতপক্ষে মুদ্রা নয়।

প্রাক্-রেনাসাঁসের যুগ থেকেই এই সকল অপ্রচলিত গ্রীক-রোমান মুদ্রার প্রতি ইউরোপীয়গণের আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পেত্রার্ক, যিনি 'প্রথম আধুনিক মানুষ' হিসাবে চিহ্নিত, কতিপয় স্বর্ণ ও রৌপ্য রোমান মুদ্রা চতুর্থ-চার্লস্‌কে প্রদান করে বলেছিলেন, "রাজন, আপনার পূর্বসুরী এই মুদ্রাসকল প্রস্তুত করেছিলেন, এক্ষণে এঁরা আপনার অনুসরণযোগ্য।"[৩] ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই স্বয়ং একজন প্রখ্যাত মুদ্রা সঞ্চয়কারী ছিলেন – ভার্সাই নগরীতে তাঁর সঞ্চিত মুদ্রা এখনও রক্ষিত আছে।

অষ্টাদশ থেকে প্রকাশিত হল জোসেফ এডিসনের বিখ্যাত *Dialogues upon the usefulness of Ancient Medals*(1769)। তিনি মুদ্রার গঠন বৈচিত্র্যের সাথে শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির সৌন্দর্য্যানুভূতির সমমর্মিতা খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন এবং সবচেয়ে মজার কথা কবি Pope এই গ্রন্থটির মুখবন্ধে মুদ্রার ঐতিহাসিক মূল্যবোধ স্থায়ী ও অকাট্য প্রমাণের কথা জানিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন, তার কিছু অংশ আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছিঃ

"Ambition sigh'd, she found it vain to trust
The faithless column and the crumbling bust....
Convine'd, she now contracts har vast design;
And all per triumphs shrink into a coin.....
The metal, faithful to its charge of fame,
Thro, climes and ages bears each form and name
In one short view, subjected to our eye,
Gods, emp'rors, heroes, sages, beauties lie."

উনবিংশ শতক পর্যন্ত মুদ্রাতত্ত্বের আলোচনার স্তর ছিল এর সৌন্দর্য্য ও গঠনশৈলী বিষয়ক অথবা দেব-দেবী অবয়বের নিখুঁত বিবরণ বা ধর্মনৈতিক মূল্যবোধ প্রসারের মধ্যে সীমিত। কিন্তু এই শতকেই শেষভাগ থেকে শুরু হল মুদ্রাতত্ত্বে বৈজ্ঞানিকসুলভ আলোচনা। বলা হল যে একজন প্রকৃতপক্ষে গবেষক ও ঐতিহাসিকের পক্ষেই মুদ্রা সংগ্রাহকের ভূমিকা পালন করা সম্ভব। ইতিমধ্যে প্রকাশিত হলো সমসেনের সুবিখ্যাত *History of Roman coinage* (1860) ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে গ্রীক, রোমান ও ব্রিটিশ মুদ্রার সুবিশাল তালিকা প্রস্তুত করার কাজ শুরু হল ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জোন্‌স ((Jones) মুদ্রার উপযোগিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বল্‌লেনঃ

"Numismatics is a science in its own right. Coins deserve study both from the technical and artistic point of view and must be classified topographically and chronologically..."

অধ্যাপক জোন্‌সের বক্তব্য মেনে নিয়েও বলা যায় যে মুদ্রাতত্ত্ব একটি নিরপেক্ষ বিষয় নয়। ইহা ইতিহাসের আনুষঙ্গিক বস্তুবিশেষ। কারণ কেবলমাত্র এক ঐতিহাসিক অথবা প্রত্নতত্ত্ববিশেষজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেই মুদ্রাতত্ত্ব বিষয়ক যথাযথ আলোচনা করা সম্ভব। তিনি মুদ্রার প্রমাণের সাহায্যে আলোচনার বিভিন্ন সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে পারেন। এই সমস্যাগুলির মধ্যে আছে - দেশের অর্থনৈতিক শাসনব্যবস্থা বা দেশের অর্থনৈতিক মান, গণনার এককের মাধ্যম এবং আরও আছে মুদ্রার প্রকারভেদ, শিল্প বিবর্তনের ইতিহাস এবং প্রত্নবস্তুনিচয়ের যথার্থ সময় নির্ধারণ।

ভারতবর্ষে মুদ্রার ব্যবহারের ইতিহাস সুপ্রাচীন। একটা কথা আছে, *অর্থম্ অনর্থম্ চিন্তয় নিত্যম্* - অবশ্য, ভারতে 'অর্থ'কে 'অনর্থ' বলে কোন সময়ই ভাবা হতো না, বরং এর উপযোগিতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করা হতো। এই কথাই যেন পরিস্কারভাবে প্রকাশিত হয়েছে অপর একটি উক্তির মাধ্যমে *ধর্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যা।* কিন্তু অতীতে মুদ্রা নিয়ে তালিকা প্রস্তুত ও তাদের নিয়ে আলোচনা করার কথা আমাদের বিশেষ জানা নেই। তবে প্রাচীন মধ্যযুগে লিপিমালায় জমির উৎপাদন মূল্য, পরিমাপ এবং শষ্য ও দ্রব্যমানের নির্দেশ পাওয়া যায় দ্বাদশ শতকের লেখক সর্বানন্দের 'টীকাসর্বস্বে'। ত্রয়োদশ শতকে দিল্লীর টাঁকশালের অধিকর্তা ঠাক্কুর ফেরুর 'দ্রব্যপরীক্ষা' এবং 'গণিতসার' পুস্তকদ্বয়ে পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক কালের প্রচলিত মুদ্রা ও মুদ্রামানের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।

বিভিন্ন যুগের মুদ্রা সংগ্রহ করা এবং তা নিয়ে গবেষণাধর্মী আলোচনা শুরু হয় একেবারে উনবিংশ শতকে। বিশেষ করে জেমস্ প্রিন্সেপ কর্তৃক ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মীলিপি আবিস্কার মুদ্রার উপাদানের প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে তোলে।

কোন কোন ইউরোপীয় গবেষক মনে করতেন যে ইন্দোগ্রীকগণের মুদ্রার অনুকরণে ভারতীয় মুদ্রার উৎপত্তি হয়েছিল। ক্যানিংহাম Q. Curtius-এর বক্তব্য উদ্ধৃতি দিয়ে এই মতটি ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন করেন। Q. Curtius বলেছেন যে আলেকজান্ডার তক্ষশীলায় আগমন করার পর অম্ভিরাজ তাঁকে ৮০টি প্রহত রৌপ্যমুদ্রা (Signati argenti Lxxxxtalenta) প্রদান করেছিলেন। এই মুদ্রাগুলি নিঃসন্দেহে এই সময়ে প্রচলিত Punch marked মুদ্রাকেই ইঙ্গিত করেন। সম্প্রতি British Museum থেকে প্রকাশিত Money from Courie shells to credit cards গ্রন্থে জো ক্রীব (Joe Cribb) মহাশয় মনে করেন যে ভারতীয় মুদ্রা পারস্য সাম্রাজ্যের মাধ্যমে গ্রীকমুদ্রার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। যা হোক, Punch-marked মুদ্রা প্রথমে রৌপ্য নির্মিত, পরে অবশ্য এই ধরনের তাম্রমুদ্রার প্রচলন হয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থে শত শত Punch-marked রৌপ্য এবং তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। ধাতুর মুদ্রার প্রচলন নিঃসন্দেহে উন্নতমানের সভ্যতার ইঙ্গিত প্রদান করে। মনে করা যায় যে এই সকল মুদ্রার প্রচলন প্রধানতঃ স্থিতিশীল মৌর্য্য সাম্রাজ্য গঠনের সুফল এবং পূর্ববর্তী যুগের দ্রব্য বিনিময় (barter) পদ্ধতি এই মুদ্রা প্রচলনের ফলে আংশিক প্রভাবিত হয়েছিল।

মহাস্থানগড়ে (অধুনা বাংলাদেশের বগুড়া জেলার) প্রাপ্ত বাংলার প্রাচীনতম শিলালিপিতে (খৃ. পূ. তৃতীয় শতক) দুই ধরনের মুদ্রার উল্লেখ দেখা যায়। একটি হচ্ছে 'গণ্ডক' এবং অপরটি 'কাকনিকা'। এই মুদ্রাগুলির আকৃতি ও মান আমাদের অনুমানসাপেক্ষ।
প্রাচীন সাহিত্যে এবং পরবর্তী লিপিমালায় সাধারণতঃ যে মুদ্রার কথা বলা হয়েছে তার নাম 'কার্ষাপণ'। 'কার্ষাপণ' নামটি এসেছে 'কর্ষ' থেকে যার ওজন 'এক কর্ষ' বা ৮০ রতি বা ১৪৬.৪ শস্যকণা (grains)। 'কার্সাপণ' স্বর্ণ নির্মিত হলে বলা হত 'সুবর্ণ' বা 'নিষ্ক' এবং রৌপ্য নির্মিত হলে 'পুরাম' বা 'বরণ' এবং তাম্রনির্মিত হলে সাধারণত 'পণ' নামে অভিহিত হত। এই 'কার্ষাপণ'ই ছিল। প্রাক-মৌর্য্যযুগ থেকে প্রচলিত Punch-marked বা প্রহত মুদ্রা। (Punch-marked মুদ্রাকে 'প্রহতমুদ্রা' বলা যায়। 'ছেনিকাটা' অর্থ রেখেছেন সুকুমার সেন।)

অর্থশাস্ত্রের ৩৩ অধ্যায়ে বলা হয়েছে তাম্রমুদ্রা (বা তাম্ররূপ) মূল্যানুযায়ী চারিভাগে বিভক্ত, যথা- মাষক, অর্দ্ধমাষক, পাদমাষক (কাকনী) এবং অষ্টভাগ-মাষ (অর্দ্ধ-কাকনী) মহাযান লিপির 'কাকনিকা' সম্ভবতঃ কৌটিল্যের 'পাদমাষ' বা 'কাকনী'র নামান্তর। মাষক এবং তাম্রপণ ৮০ রতির সমান ওজন বিশিষ্ট। পুনরায়, ওড়িষ্যা ও বাংলাদেশের অর্থমানের তালিকায় (monetary table) -এ কড়ি(cuprea moneta) - এর যোগাযোগ অতি প্রাচীন। এই তালিকা অনুযায়ীঃ
৪ কুড়ি - ১ গণ্ডা
২০ গণ্ডা - ১ পণ
১৬ পণ - ১ কাহন বা কাহাপন (পালি) বা কার্ষাপণ (সংস্কৃত)।

মহাযান লিপির 'গণ্ডক' সম্ভবতঃ ৪ (চার) কুড়ির মূল্যমানের সমান। প্রসঙ্গক্রমে দীনেশচন্দ্র সরকার কলিঙ্গদেশে ব্যবহৃত 'গণ্ড-মাড়' মুদ্রাকে 'কার্ষাপণের' সমতুল্য মনে করেন।[৫] ভারতবর্ষে কুড়ি মূল্যমান এক কাহন বা 'কার্ষাপণে'র সহিত বাঁধা ছিল। অর্থাৎ এক 'কার্ষাপণ' এর মূল্য ১২৮০ কড়ি।

ভারতের কুষাণ নৃপতিগণ মুদ্রার জগতে এক নূতন চিন্তাধারা আনয়ন করেন। মুদ্রায় লিপি বা প্রতিকৃর্তি অঙ্কন করার নীতি ইন্দোগ্রীকগণ সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন ঠিকই, কিন্তু ভারতীয় ধ্যান-ধারণার কথা কুষাণগণের মুদ্রায় প্রথম লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি স্থান থেকে কিছু কিছু কুষাণ যুগের স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে আছে মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, বগুড়া প্রভৃতি অঞ্চল। প্রথম শতকে বাংলার দক্ষিণ উপকূলে বৈদেশিক বাণিজ্য চলত রাজধানী gange-এর সহিত এবং এতদঞ্চলে caltis নামে প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রার কথা *The Periplus of Erythrean Sea* থেকে জানতে পারি। caltis এই (B. K. Barua, *Cultural History of Kamrupa)* কথাটির মধ্যে কামরুপের প্রাচীন কনিতা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উল্লেখ নিহিত আছে মনে করলেও এই মুদ্রার সম্বন্ধে আমাদের তথ্য ও জ্ঞান খুবই সীমিত।

পরবর্তীকালে মগধে গুপ্তসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ভারতের মুদ্রাজগতে এক নবযুগের সূচনা করে। উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশের ন্যায় বাংলাদেশের পুণ্ড্রবর্দ্ধন থেকে দক্ষিণে সমতট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে গুপ্ত সাম্রাজ্য এবং শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের সাধারণ বেচা-কেনার জন্য কড়ির প্রচলন অব্যাহত থাকলেও, বৃহত্তর লেনদেনের জন্য গুপ্ত স্বর্ণমুদ্রা 'দীনার' (যাহা রোমান Denarius থেকে উদ্ভূত) এবং 'রূপক' মুদ্রার প্রচলন বিস্তার লাভ করে। তৈগ্রাম লিপি (১২৮ গুপ্ত সংবৎ – ৪৪৮ খৃষ্টাব্দ) থেকে জানা যায় যে ৩ কূল্যবাপ এবং ২ দ্রোণবাস জমি ক্রয় করতে লেগেছিল ৬ দীনার ৮ রূপ্যক এবং প্রতি কূল্যবাপ জমির মূল্য ২ দীনার। পাহাড়পুর লিপি থেকে জানা যায় যে ৮ দ্রোণ – ১ কুল্যবাপ এবং এ থেকে অনুমান করা সহজ যে ১৬ রূপ্যক ১ দীনারের সমতুল্য (R. B. Basak, *Ep. Ind.*, xxi, 78 ft) গুপ্ত যুগের শেষভাগে দীনার এবং রূপ্যকের বিনিময় মূল্য কমে হয় ১ ঃ ৪।[৬] সুতরাং সুবর্ণ মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটেছিল। মজার কথা প্লিনী প্রথম শতকে ভারতের বন্দরগুলিতে পুঞ্জীভূত রোমান মুদ্রা ডেনারিয়াস দেখে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। তখন রোমের সহিত বাণিজ্যের Balance of trade ছিল ভারতের পক্ষে। পঞ্চম শতকের শেষভাগে রোম সাম্রাজ্য ভাঙতে শুরু করে, তারই প্রতিক্রিয়া বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনুভূত হয়। মূল্যবান ধাতুর মুদ্রার সম্যক্ আমদানী বন্ধ হয়ে যাবার ফলেই সম্ভবতঃ অবমূল্যায়ন ঘটে থাকবে। এই প্রসঙ্গে সহজভাবে এসে পড়ে এই মূল্যবান ধাতুর উৎস কী ছিল।

ধাতুর উৎসঃ

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভিত্তিতে বলা হয়েছে পশ্চিম এশিয়ায় গ্রীক নগরীতে প্রথম মুদ্রার সূত্রপাত ঘটে আনুপাতিক খৃ.-পু. ষষ্ঠ শতাব্দীতে। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে ভারতীয় মুদ্রার প্রথম

আবির্ভাব হওয়া উচিত ছিল উত্তর পশ্চিম ভারতে। কিন্তু ভারতের প্রাচীনতম Punch marked মুদ্রার আসল প্রাপ্তিস্থান ছিল মগধ এবং পূর্ব-উত্তর প্রদেশ। সুতরাং প্রশ্ন Punch marked মুদ্রার জন্য যে রৌপ্য প্রয়োজন হত, তা আসত কোথা থেকে। বর্তমান বিহারে রৌপ্য খনি না থাকলেও, অষ্টাদশ শতকের বিবরণ থেকে মুঙ্গের জেলার খড়গপুর পাহাড়ের রৌপ্যখনির অবস্থানের প্রতি R. S. Sharma আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[৭]

কুষাণ রাজাদের কোন রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া যায় না - এর কারণ সম্ভবতঃ খড়গপুর পাহাড় কুষাণরাজ্যের বাহিরে অবস্থিত ছিল। গ্রীকেরা কিছু স্বর্ণমুদ্রা চালু করলেও কুষাণদিগের ন্যায় ব্যাপক স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেনি। কুষাণদের স্বর্ণের উৎস কী ছিল? কুষাণ-অধিকৃত মধ্য এশিয়াতে স্বর্ণখনির কথা পুরাতত্ত্বের প্রমাণ থেকে জানা যায়। এ ছাড়াও কুষাণ স্বর্ণের সম্ভাব্য উৎস ছিল ভারতবর্ষ, রোম এবং ককেসাস অঞ্চল। আলেকজাণ্ডারের সময়ে সিন্ধু অঞ্চলে স্বর্ণখনির কথা স্ট্র্যাবোর বিবরণ থেকে জানা যায়, কারণ কোলার স্বর্ণখনি কুষাণ রাজ্যের বাহিরে ছিল, তবে ডালভুম (Dhalbhum) অঞ্চলের স্বর্ণখনি থেকে তারা কিছু স্বর্ণ সংগ্রহ করে থাকবে। এ ছাড়া রোমের সাথে Silk route - এর মাধ্যমে যে ব্যবসা চলত, তা থেকেও প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা কুষাণ রাজ্যে আমদানী হোত। রোমানরা অষ্টম শতক পর্যন্ত আফ্রিকা এবং ককেসাস অঞ্চল থেকে স্বর্ণসংগ্রহ করত। কিন্তু অষ্টম শতকেই এই সকল অঞ্চল মুসলমান কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার ফলে রোমে স্বর্ণ আমদানী বন্ধ হয়ে যায়। এর ফল হয় সুদূরপ্রসারী। ইউরোপের পশ্চিম অঞ্চলের ন্যায় উত্তর ভারতে ও স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন প্রায় বন্ধ হয়ে আসে।

এতদসত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য যে সপ্তম শতকে বাংলাদেশে মুদ্রায় স্বর্ণের ব্যবহার কিছুটা সংযত হলেও বন্ধ হয়ে যায় নি। ভারতে রায়চুরের স্বর্ণখনি ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে যায় এবং কোলার খনিতে কাজ চলতে থাকে রেডিও-কার্বণ গণনানুসারে আনুমানিক ৭০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কাজ চলেছিল। তবে দক্ষিণ-ভারতে মন্দির এবং অলঙ্কার প্রভৃতি কাজে এই সময় সোনার প্রয়োজন ব্যাপকতর হতে আরম্ভ করে। পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্যের সহিত ভারতে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্তিমিত হয়ে আসে। কিন্তু দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সহিত ব্যবসায়িক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক অক্ষুন্ন থাকে। এই প্রসঙ্গে আমরা মালয় উপদ্বীপে প্রাপ্ত রক্ত-মৃত্তিকা মহাবিহারের (মুর্শিদাবাদ জেলা) অধিবাসী মহাপাবিক বুধগুপ্তের বিখ্যাত লিপি প্রভৃতির কথা স্মরণ করি। R. S. Sharma চৈনিক লেখক Tan change - এর প্রবন্ধ উল্লেখ করে বলেছেন যে কেবলমাত্র রোমান সাম্রাজ্য নয়, ভারতে স্বর্ণ রপ্তানীকারক অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে ছিল দক্ষিণ চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ। তাই দেখি গুপ্ত সংস্কৃতি ধারা অক্ষুন্ন রেখে বাংলাদেশের কতিপয় নৃপতি[৮] স্বর্ণমুদ্রা চালু রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। তবে এই শতকে সকলের চেয়ে অধিকতর প্রভাবশালী নৃপতি ছিলেন শশাঙ্ক। উত্তর এবং পূর্ব-ভারতে তিনি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন এবং হর্ষবর্দ্ধনের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে

আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। শশাঙ্কের রাজ্যসীমা দক্ষিণভাগে মেদিনীপুর ছাড়িয়ে উড়িষ্যার উত্তরাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। এযাবৎকাল শশাঙ্কের কেবলমাত্র স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছিল। সম্প্রতি দক্ষিণবঙ্গে তাঁর স্বর্ণমুদ্রার সহিত কতিপয় রৌপ্যমুদ্রার আবিষ্কার মুদ্রার জগতে একটি নতুন চিন্তার উদ্রেক করে।[৯] মনে হয় গুপ্তোত্তর যুগে খড়গপুরের রৌপ্যখনির সরবরাহ বন্ধ হয়ে আসার ফলে উত্তর ভারতে রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন কমে আসতে থাকে।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ত্রয়োদশ শতকের ঐতিহাসিক জুজানী লিখেছিলেন যে মুসলমান বিজয়ের পূর্বে বাংলাদেশে রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন ছিল না। কিন্তু সপ্তমশতকে সম্প্রতি প্রাপ্ত শশাঙ্কের রৌপ্যমুদ্রা এবং সপ্তম শতক হইতে একাদশ শতক পর্যন্ত সময়সীমার দক্ষিণপূর্ববঙ্গের লালমৈ উপত্যকা ও ময়নামতিতে প্রাপ্ত প্রায় তিনশত রৌপ্যমুদ্রা নিকটবর্তী কোন রৌপ্যখনির অবস্থিতির ইঙ্গিত প্রদান করে। হিউয়েন সাঙ ও তাঁর সময়ে ব্যবসায়ের জন্য স্বর্ণ, রৌপ্যমুদ্রা, মুক্তা এবং কড়ির ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন।

এদিকে ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম অঞ্চলে কোন ধাতুর খনির বিবরণ জানা যায় না। সুতরাং এই ধাতুর উৎস দক্ষিণ চীন, বার্মা, পেগু এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মার্কোপোলো[১০] চৌ-জু-কুআ,[১১] প্রভৃতিদের বিবরণ থেকে এই অঞ্চলের মূল্যবান ধাতুর খনির কথা জানা যায়। গুপ্তোত্তর যুগ থেকে দক্ষিণ পূর্ব-বঙ্গের সহিত দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার সম্পর্ক প্রসার লাভ করে। এই সময় এই অঞ্চলে গুপ্তনৃপতিদের Archer type মুদ্রার অনুকরণে এক বিচিত্র মুদ্রা পাওয়া যায়, যার অপর পার্শ্বে থাকে অষ্টভূজা দেবীমূর্ত্তি। পণ্ডিতবর্গ এই মুদ্রাগুলি খড়্গ, দেব অথবা রাত নৃপতিদের বলিয়া অভিহিত করেছেন। খুব সম্ভবতঃ শশাঙ্কও এই ধরনের মুদ্রার প্রবর্তন করেছিলেন। সম্প্রতি শশাঙ্কের মুদ্রার যে ভাণ্ডারটি পশ্চিম-দক্ষিণবঙ্গে পাওয়া গেছে, তার মধ্যে একটি গুপ্ত অনুকৃতি স্বর্ণমুদ্রা (sp. gr. 14. 86) আছে যার মান, ওজন ও গড়ন শশাঙ্কের স্বর্ণমুদ্রার অনুরূপ। মুদ্রার একদিকে 'শ' লেখা শব্দটি সম্ভবতঃ শশাঙ্ককেই ইঙ্গিত করে।[১২] এছাড়া Bull and Trigliph type স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাগুলির সহিত আরাকানী মুদ্রার সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। এই মুদ্রাগুলি আরাকান চন্দ্রবংশ সম্ভূত হরিকেলের চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণ কর্তৃক উৎকীর্ণ হয়েছিল।[১৩]

এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলায় পাল-সেন নৃপতিদের দীর্ঘ-রাজত্বকালে কোন মুদ্রার আবিষ্কৃত না হওয়াকে পণ্ডিতগণ একটি বিস্ময়কর ঘটনা বলে অভিহিত করেছেন। সর্বপ্রথম নীহাররঞ্জন রায় 'বাঙ্গালীর ইতিহাসে' এই যুগে শিল্পোৎপাদনের অবনতির সাথে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সঙ্কোচনই মুদ্রার অনুপস্থিতির কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন এবং সেই সঙ্গে জমির উপর ক্রমবর্দ্ধমান চাপের উল্লেখের কথা তিনি বলেছেন। পরবর্তীকালে R. S. Sharma প্রমুখ পণ্ডিতগণ এই জাতীয়

সামাজিক পরিস্থিতি গুপ্তোত্তর যুগে ভারতে সামন্ততান্ত্রিক প্রথার (Indian Feudalism) উন্মেষের প্রকৃষ্ট নির্দশন বলে মনে করেন।

এই ধরনের মতবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের মতে এই ধরনের সামাজিক পরিস্থিতির সম্যক মূল্যায়নের অপেক্ষায় আছে। আলোচনার বিষয়টি সরলীকরণ করে এইভাবে বলা যায় যে পাল-সেন যুগে বর্হিবাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবার ফলে স্বর্ণ-রৌপ্য আমদানী বন্ধ হয়ে যায় এবং উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ধাতুর অভাব দেখা দেওয়ার ফলে পাল-সেন নৃপতিবৃন্দের পক্ষে ধাতুর মুদ্রা প্রস্তুত করা সম্ভব ছিল না।

বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। তাই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে কিছু তথ্যের পুনর্মূল্যায়ন আবশ্যক।

বাংলাদেশের অধিবাসীদের সমুদ্রের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণের কথা ঈশান বর্মণের হরাহ লিপির *গৌড়ান্ সমুদ্রাশ্রয়ান্* উক্তির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। পাল সম্রাট ধর্মপালের খালিমপুর লিপিতে পাই *ভাগীরথী-পথ প্রবর্ত্তমানা- নানাবিধ - নৌবাটক-সম্পাদিত সেতুবন্ধ* - ইত্যাদি। *নৌবাটক* বা *নৌবাট* অর্থাৎ বিস্তীর্ণ রণতরী বা নৌবলের কথা পরবর্তী পাল নৃপতিদের লিপি[১৪] থেকে পাওয়া গেছে। দেবপালের মুঙ্গের লিপি পালরাজার সহিত যবভূমিপাল তথা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার রাজ্যগুলির সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্কের ইঙ্গিত বহন করে। কৈবর্ত-কৃষক বিদ্রোহ দমন করার জন্য রামপালের ব্যাপক রণতরীর সাহায্য নেবার কথা *রামচরিতে* বর্ণিত হয়েছে। সেনরাজ বিজয়সেনের ভিন্নদেশ আক্রমণের উদ্দেশ্যে সুবিখ্যাত রণতরীর কথা উমাপতিধরের *পাশ্চাত্য-চক্র-জয়কেলিষু যস্য যাবৎ গঙ্গা গঙ্গা প্রবাহম অনুধাবতি নৌবিতানে* বর্ণনার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই নৌবহর বা নৌশক্তির মাধ্যমে বা সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিনিময়ের ফলে বাংলার সাথে ব্যবসায়-বাণিজ্যের কোন সম্পর্ক গড়ে উঠে নাই - একথা ভাবা যায় না।

বস্ত্র শিল্প বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য। নবম শতকে রুমী বা বাংলার বস্ত্রশিল্পের সপ্রশংস উক্তি আরব বণিক সুলেইমনের লেখা থেকে পাই। তিনি বলেছেন যে এই বস্ত্র এত সূক্ষ্ম যে এর তৈরী পোষাক সহজেই একটি অঙ্গুরীয়কের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করান যায়।[১৫] ত্রয়োদশ শতকে কার্পাসজাত বস্ত্র বাংলাদেশ থেকে রপ্তানী হবার কথা মার্কোপোলো উল্লেখ করেছেন।[১৬] মার্কোপোলো এদেশ থেকে চিনি রপ্তানীর কথাও বলেছেন। পঞ্চদশ শতকে ও বাংলার বস্ত্রশিল্পের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন চৈনিক পরিব্রাজক মা হুয়ান। (*JRAS*, 1895, 531)। এছাড়াও ছিল উচ্চমানের মৃৎ শিল্পজাত-দ্রব্য। রাজশাহী জেলার পাহাড়পুর খননকার্য্যের ফলে আবিস্কৃত অষ্টম-নবম শতাব্দীর ব্যবহৃত এই সকল দ্রব্যের সাথে সম্প্রতি লালমৈ-ময়নামতিতে আবিস্কৃত (অধুনা, বাংলাদেশ রাষ্ট্র) অঞ্চলে এখনও বহুকাল ধরে বসবাসকারী 'পটুয়া' বা মৃৎ শিল্পে অঙ্কন পারদর্শী শিল্পীদের সন্ধান মেলে।[১৭] লালমৈ এবং ময়নামতিতে খননকার্যের ফলে যে সকল দ্রব্যের নিদর্শন

পাওয়া গেছে তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে রপ্তানী দ্রব্যগুলির মধ্যে ছিল কার্পাস দ্রব্য চিনি। সম্ভবতঃ কামরূপ থেকে আনীত (অগুরু কাষ্ঠ) এবং মৃৎশিল্প সামগ্রী।

পূর্বেই বলা হয়েছে দক্ষিণ পূর্ব-বাংলার সহিত আরব বণিকদেরও বহুদিন ধরে ব্যবসায় বাণিজ্য চলছিল। ময়নামতিতে প্রাপ্ত শেষ আব্বাসিদ খলিফা মুস্তাসিম বিল্লা (১২৪২-৮৮) এর সুবর্ণ মোহর এবং বেশ কিছু সংখ্যায় আব্বাসীয় রৌপ্যমুদ্রার সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।[১৮] আরব ছাড়াও বাংলার উৎপন্ন দ্রব্যাদি রপ্তানী হতো দক্ষিণ চীন, পেগু এবং দক্ষিণ পূর্ব - এশিয়ার দেশ সমূহে।

সুলেইমান এবং ইবন খুরদাদ্‌বি 'রমি বা 'রুমি' দেশ থেকে সূক্ষ্ম ও সাধারণ সূতী বস্ত্র ও ঔষধি গাছ বা সুগন্ধিকাঠ (aloe wood) রপ্তানীর কথা বলেছেন।[১৯] তরফদার 'রুমি'কে চট্টগ্রাম-আরাকান বলে মনে করেছেন। ইলিয়টের মতে ইহা পাল রাজ্যকেই বলা হয়েছে। ইলিয়টের বক্তব্য যথার্থ বলে মনে হয়, কারণ আলমাসুদি রুমি'র রাজার যুদ্ধের যে বিশাল সরঞ্জামের ও সৈন্য সমাবেশের বিবরণ দিয়েছেন, তাহা নিঃসন্দেহে পালরাজ দেবপালের সম্বন্ধে প্রযোজ্য।[২০]

তরফদার হরিকেল-সমতট-বঙ্গ অঞ্চলে একটি স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু এই অঞ্চলের বৃহদাংশে শশাঙ্ক এবং পরবর্তী পাল-সেন রাজ্যের কোন কোন সময় চন্দ্ররাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করেন ভঙ্গাল বা বঙ্গাল দেশে এবং ফলে বঙ্গাল ছিল পালদের অন্যতম পিতৃরাজ্য। শশাঙ্কের পর পাল সাম্রাজ্য সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে বিস্তার লাভ করে। বরেন্দ্রীতে পাল আধিপত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও ধর্মপালকে ভোজের প্রশস্তিতে *বঙ্গপতি* বলে সম্বোধন করা হয়েছে।[২১] পরবর্তীকালে পাল সাম্রাজ্যের সাময়িক দুর্বলতার সুযোগে কিছু স্থানীয় শক্তির উদয় হয়। একাদশ শতকে চোললিপিতে বাংলাদেশে পালরাজ মহীপাল ছাড়াও আর তিনজন রাজার নাম বলা হয়েছে। এদের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ বা বঙ্গালদেশের নৃপতি গোবিন্দচন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। গোবিন্দচন্দ্র হরিকেলের চন্দ্রবংশীয় নৃপতি ছিলেন। চন্দ্রবংশীয়দের উৎখাত করে পুর্ববঙ্গে সাময়িকভাবে বর্মন আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলেও কিছুদিনের মধ্যে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ সেন রাজ্যান্তর্গত হয়। উত্তরবঙ্গের বিজয়পুর, লক্ষণাবতী, রামাবতী প্রভৃতি নগরীর সহিত পাল্লা দিয়ে দক্ষিণবঙ্গের বিক্রমপুর সেনরাজাদের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রাম (সম্ভবত আরবদের 'সমন্দার') প্রভৃতি বন্দরগুলির সহিত ধলেশ্বরী নদীর উপর অবস্থিত রাজধানী (জয়স্কন্দবার) বিক্রমপুরের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। চন্দ্র-বর্মণ-সেন লিপিমালায় একথা সমর্থিত হয়েছে। সমতটে অবস্থিত পট্টিকেরা নগরীর কথা লড়ইচন্দ্রের ময়নামতী লিপিতে বর্ণিত হয়েছে। একাদশ শতকেই সমতট সেনরাজ্যান্তর্ভূক্ত হয়। বিজয়সেনের ব্যারাকপুর তাম্রলিপিতে সমতটে জমির মাপের জন্য ব্যবহৃত 'সমতটীয় নল'র কথা বর্ণিত হয়েছে। ত্রয়োদশ শতকে সমতট 'দেব' রাজাদের অধীনে আসে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে রোমান সাম্রাজ্যের অবনতির সাথে অষ্টম শতকে বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আব্বাসীয় রাজ্য আল্ মনসুরের নেতৃত্বে। সেই সময় থেকে আরব ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়েছিল ভারতে এবং দক্ষিণ-পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে। একাদশ শতকে আরব বাণিজ্য কেন্দ্র পারস্য উপসাগর থেকে লোহিত উপসাগরে স্থানান্তরিত হয় ফতিমিদগণের নেতৃত্বে। এরপর ক্রুসেডযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও ভারতে মশলা বাণিজ্যের উত্তরোত্তর প্রসারলাভ এবং বাংলা, বিশেষত চট্টগ্রাম (বা সমান্দার) বন্দরের সহিত আরব বণিককূলের বাণিজ্যিক সম্পর্ক এই সময় থেকে আরও ঘনিষ্ঠ হতে থাকে।

উল্লেখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি কথা খুব নিশ্চিত করে বলা যায় যে পাল-সেন যুগে বর্হিবাণিজ্য কখনই বন্ধ হয়ে যায়নি - বরং অষ্টম শতকের গোড়ার দিকে তাম্রলিপ্ত বন্দরের পতনের পর দক্ষিণপূর্ব বঙ্গের মারফত বিভিন্ন বন্দর পথে এই বাণিজ্য একদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি এবং অপরদিকে আরব বণিকদের সহিত ক্রমাগত বৃদ্ধি লাভ করেছিল। তরফদার মনে করেন যে হরিকেল, সমতট ও বঙ্গ নিয়ে গঠিত স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলটির সহিত জল ও স্থল পথে অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক গড়ে উঠে। কিন্তু আমাদের মতে দক্ষিণপূর্ব বঙ্গে ব্যবসায় ও বাণিজ্যের যে প্রসার ও উন্নতি সপ্তম শতক থেকে লক্ষ্য করা যায় তাহা মূলতঃ প্রতিষ্ঠিত এবং শক্তিশালী রাজ্যের আনুকূল্য ছাড়া কখনই সম্ভব ছিল না। মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কের পর পাল-সেন নৃপতিগণ এই বিষয়ে যত্নবান ছিলেন। আমরা লক্ষ্য করেছি যে শশাঙ্কের সময় থেকে বা তার কিছু পূর্ব থেকেই, এই অঞ্চলে ব্যবসার প্রয়োজনে স্বর্ণমুদ্রা, বিশেষ করে তথাকথিত গুপ্ত অনুকরণে প্রস্তুত স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত হয়েছিল।

দক্ষিণ পূর্ববঙ্গে শশাঙ্কের পর যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা হয় তাদের মধ্যে ছিল ভদ্রবংশ, খড়্গ বংশ, সামন্ত লোকনাথ, রাও বংশ, শান্তিদেবের বংশ, কান্তিদেব, পুরুষোত্তমের বংশ, হরিকাল রণবঙ্কমল্লের বংশ শ্রীহট্টের ভাস্করের বংশ, খরবান নবগীর্বাণের বংশ এবং এ ছাড়াও চন্দ্র বংশ ও বর্মারাজবংশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খড়্গবংশ, পালবংশ প্রতিষ্ঠার পূর্বে বর্দ্ধমান-ভূভাগ থেকে সমতট পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, কিন্তু এই বংশের সময়কাল ছিল খুব সীমিত। পাল এবং তৎপর সেন রাজ্য স্থাপিত হবার সাথে দক্ষিণ পূর্ববঙ্গে চন্দ্র এবং পরে বর্মরাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এই সকল নৃপতিগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করলে ও পাল নৃপতিদের প্রতি অনুগত ছিলেন। দীনেশচন্দ্র সরকার লিপিমালার সহায়তায় এই মত সমর্থন করেছেন।[২১(ক)]

সুতরাং দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের তাম্রলিপ্ত বন্দরের অবনতির পর সুদীর্ঘ চারিশত বছর ধরে দক্ষিণ-পূর্ব-বঙ্গের বন্দরগুলিতে যে ধরনের বিদেশী ব্যবসায় বাণিজ্য চলত, তার জন্য পাল-সেন রাজ্যের বণিককূলেরই প্রধান ভূমিকা ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। এ প্রসঙ্গে

উল্লেখযোগ্য Hudud Alam (10, 7) এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে সুগন্ধি কাঠের (Aloe-wood) ব্যবসায় সমন্দর (Samandar) বন্দর (চট্টগ্রাম অঞ্চল প্রাচীন হরিকেলের অন্তর্ভূক্ত ছিল) থেকে রপ্তানী হত। এই লাভজনক ব্যবসায় কামরূপ ও দহম রাজ্যের নৃপতিগণ বিশেষ করে দহমের নৃপতি ধর্মপাল বিশেষভাবে পরিচালনা করিতেন।[২২] সুতরাং এই জাতীয় রপ্তানীমূলক ব্যবসায় বাণিজ্যের যে ধরনের রসদ দ্রব্য সামগ্রীর প্রয়োজন হতো তাহা কেবলমাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না, পক্ষান্তরে, আমদানীর দ্রব্যসমূহ কেবলমাত্র ঐ অঞ্চলের মধ্যে সীমিত থাকত – একথাও বিশ্বাসযোগ্য নয়।

বলা বাহুল্য, ব্যবসায়ের জন্য স্বর্ণ–রৌপ্য মুদ্রা বিদেশী বণিককূলের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল। গুপ্ত অনুকৃতি মুদ্রাসমূহ বিদেশী বণিকগণের কাছে সহজেই গ্রহণযোগ্য থাকার জন্য কয়েক শতাব্দী ধরে এই মুদ্রা প্রচলিত ছিল। বণিকেরা কখনও কখনও স্বীয় অঞ্চলাধিপতির নাম ক্ষোধিত করত। পূর্বেও লক্ষ্য করেছি যে চন্দ্র বংশীয় নৃপতিগণের রাজ্যে আরাকান মুদ্রার অনুকরণে Bull এবং Triglyph নমুনাযুক্ত রৌপ্যমুদ্রা আবিস্কৃত হয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন যে আরাকান ছিল চন্দ্রবংশীদের আদি বাসস্থান।

সেন রাজ্য প্রতিষ্ঠা হবার·পর বিদেশী ব্যবসা–বাণিজ্য যথেষ্ট প্রসার লাভ করে। বিজয় সেনের দেওপাড়া লিপিতে নৃপতির বিভব ও ঐশ্বর্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে – মূল্যবান পাথরের দ্বারা নির্মিত পুষ্প, কণ্ঠহার, কুণ্ডল, সুবর্ণ নির্মিত বলয় রাজদুহিতাদের দাসীরা পরিধান করত। অন্যত্র দেখি, বিজয়সেনের দরবারে সমাগত ব্রাহ্মন–পণ্ডিতদের যে ধন সম্পদ প্রদান করা হত, তাদের মধ্যে আছে মুক্তা ও মরকত খণ্ড, রৌপ্য (রুপ্যানি বা রৌপ্যমুদ্রা), নানাবিধ রত্ন ও সুবর্ণ (মুদ্রা)।

বল্লালচরিতের রচনাকাল নিয়ে কিছু মতভেদ থাকলেও এর উত্তর ও পূর্ব খণ্ড সম্ভবতঃ বল্লালসেনের শিক্ষক গোপালভট্টের রচনা। মগধ বিজয়ের কথা বল্লালসেনের সনোঘর (Bhagalpur) মুর্ত্তি লিপি থেকে সমর্থিত হয়। বল্লাল চরিতে এ প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে যে বল্লালসেন ওদন্তপুর বা মগধের জনৈক বিত্তশালী বণিক বল্লভানন্দের নিকট এক কোটি (সুবর্ণ) নিষ্ক ধার করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি অপর একটি যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করার উদ্দেশ্যে দেড় কোটি 'নিষ্ক' দাবী করেন। বল্লভানন্দ অবশ্য হরিকেশ রাজ্যের রাজস্বের বিনিময়ে এই মুদ্রা দিতে রাজী হন। কিন্তু বল্লাল সেন ইহাতে ক্রুদ্ধ হয়ে বণিকদের সামাজিক মান শুদ্রের সমতুল্য বলিয়া ঘোষণা করেন। উল্লেখযোগ্য, এই সময় চাষী কৈবর্ত্তদের 'জলচল' পর্যায়ে উন্নীত করা হয়।[২৩]

ত্রয়োদশ শতকে ভাস্করাচার্য্য রচিত *লীলাবতীতে* বলা হয়েছে যে ১ নিষ্ক – ১৬ দ্রম্মের সমান এবং এক সুবর্ণ (নিষ্ক) এর ওজন – ১ কার্ষ (বা ১৪৬.৪ গ্রেনের) সমান। বর্হিবাণিজ্যে ব্যবহারের জন্য বণিকেরা নির্দিষ্ট ওজনের (সম্ভবতঃ ৫.৫ গ্রাম থেকে ৬ গ্রাম পর্যন্ত)[২৪] মুদ্রা প্রস্তুত করত।

প্রয়োজনবোধে রাজাকে এই মুদ্রা কর দিতে বাধ্য থাকত। কোন কোন সময় বণিকেরা সুবর্ণমুদ্রার বিনিময়ে রাজ্যের অঞ্চলবিশেষের রাজস্ব ভোগ করত।

তবকাৎ-ই-*নাসিরি* গ্রন্থে মীনহাজ সম্রাট লক্ষ্মণ সেনের স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত পাত্রের কথা উল্লেখ করেছেন।

আসলে স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রার প্রয়োজন হত বর্হিবাণিজ্যের ক্ষেত্রে, ব্যয়ভার নির্বাহের প্রয়োজনে এবং কখনও কখনও ব্রাহ্মণকে দান করার তাগিদে। আমরা এ প্রসঙ্গে সমসাময়িক শিলিমপুর প্রশস্তিতে (*Ep. Ind.* XIII. 283ff) যজ্ঞ সম্পাদন করার জন্য বিদ্বান ব্রাহ্মণকে নয়শত সুবর্ণমুদ্রা দান করার কথা স্মরণ করি। এই সকল নির্দিষ্ট মান বা ওজনের মুদ্রা প্রস্তুত করার দায়িত্ব অর্পিত হত বণিককূলের ওপর। প্রখ্যাত মুদ্রাতত্ত্ববিদ C.H.V. Sutherland - এর উক্তিটি এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেনঃ

"In antiquity neither trade nor economics was organised or controlled governmentally in the sense to which we are now accustomed. Trade was a matter for traders, and not for governments; and though governments formed their policies on the assumption that trade was necessary if men were not to starve, and though they took care to control the content and value of their coinages, nothing like an integrated view of economic policy ever seems to have existed;....."[২৫]

বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রয়োজনে স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রার ব্যবহার এবং স্বীয় রাজ্যে কড়ি ব্যাপক প্রচলনের ফলে পাল-সেন নৃপতিদের বিনিময় মুদ্রার কোন অসুবিধায় পড়তে হয়নি। এই কড়ির মূল্য বাঁধা থাকত প্রচলিত রৌপ্যমুদ্রা, দ্রম্ম, পুরাণ বা কার্ষাপণের সাথে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে ধর্মপালের বৌদ্ধগয়া লিপিতে বর্ণিত 'দ্রম্ম', রাজ্যপালের ভাতুরিয়া লিপিতে উল্লেখিত 'পুরাণ' এবং গোবিন্দপালের গয়া লিপিতে গৃহীত 'কার্ষাপণ' একই মানের রৌপ্যমুদ্রা। গয়া লিপিতে বলা হয়েছে যে সেন লিপি-সমুহে আরও পরিস্কার করে বলা হল যে জমির রাজস্ব হিসাবে যে রৌপ্যমুদ্রা ধরা হয়, তাদের জন্য সমতুল্য কড়ি প্রদান করাই রীতি। বিজয়সেনের ব্যারাকপুর তাম্রপট থেকে জানা যায় যে প্রদত্ত জমির আয় ছিল ২০০ কপর্দক-পুরাণ। লক্ষণসেনের আনুলিয়া তাম্রপটে প্রদত্ত জমির বাৎসরিক আয় ধরা হয়েছে ১০০ কপর্দক-পুরাণ (*সংবৎসরেণ কপর্দক-পুরাণ শতৈকোৎপত্তিক*)। লক্ষণসেনের তর্পনদিঘি-তাম্রপটে লিখিত জমির বাৎসরিক আয় ১৫০ কপর্দক পুরাণ।

এস্থলে স্মরণীয় যে নেপালে ব্যবহৃত মুদ্রার নাম ছিল 'পণ-পুরাণ' এর অর্থ প্রচলিত রৌপ্যমুদ্রার মানের সমতুল্য নির্দিষ্ট-পরিমাণ তাম্রমুদ্রা। যেমন, পাল-সেন রাজ্যে প্রচলিত রৌপ্যমুদ্রার সমতুল্য পরিমাণ কড়ি। আসলে নেপালে প্রচুর তাম্রখনির থাকার জন্য তাম্র সংগ্রহ করিতে কোন অসুবিধা ছিল না[২৬] আমরা পূর্বে দেখেছি যে এক পুরাণ বা কার্ষাপণের সমতুল্য নির্দিষ্ট পরিমাণ কড়ির সংখ্যা ১২৮০টি। *রাজতরঙ্গিনী* থেকে জানতে পারি যে কাশ্মীরে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ব্যবসায় বাণিজ্যে কড়ি বিশেষ ভূমিকা ছিল। বাংলায় মধ্যযুগে সম্ভবতঃ 'বোড়ী' (বা বুড়ি-এর প্রচলন ছিল। চার কড়িতে ১ গণ্ডা, ৫ গণ্ডায় ১ বুড়ি (বা বোড়ী) এবং ৪ বুড়ি ('বোড়ী'তে) ছিল ১ পণ। সুকুমার সেন মহাশয় (*বঙ্গভূমিকায়*) একটি চর্যাগানের উল্লেখ করে 'বুড়ি'র প্রয়োগ দেখিয়েছেনঃ "কড়ি ন লেই, বোড়ী ন লেই সুছড়ে পর করেই" অর্থাৎ নাবিক কড়িও নেয় না, বুড়িও নেয় না, ভালভাবে পার করে দেয়।

ইতিহাসের আদিম যুগ থেকে কড়ি ব্যবহার হয়ে আসছে পৃথিবীর বিভিন্ন সুপ্রাচীন দেশ সমূহে। কড়ির বৈজ্ঞানিক নাম Cuprea Moneta থেকে অনুমিত হয় যে এর ব্যবহার ছিল money couries বা কড়ি সম্পত্তি বা অর্থ হিসাবে। চীন দেশের কড়ির ব্যবহারের কথা খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠদশ শতাব্দী থেকে[২৭] ভারতেও কড়ির ব্যবহার ছিল অতি প্রাচীনকাল থেকে। ক্রয়-বিক্রয়-এর মান হিসাবে কড়ির ব্যবহারের কথা প্রথম জানতে পারি পঞ্চম শতকে ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকে। হিয়েন সাঙ্ সপ্তম শতকে কড়ির ব্যাপক ব্যবহারের কথা বলেছেন। এর পর থেকে উনবিংশ শতক পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে কড়ি মুদ্রার একক (unit) হিসাবে প্রচরিত ছিল। *তবাকৎ-ই-নাসিরী*, *আইন-ই আকবরী* অথবা পুরুষোত্তমদেবের *ত্রিকান্ডকোষ*, ভাস্করাচার্যের *লীলাবতী* প্রভৃতি গ্রন্থে কড়ি মূল্যমান ধার্য করা হয়েছে। এই মূল্যমান কড়ি আমদানী ও চাহিদার নিয়ম অনুসারে কখনও বেড়েছে কখনও বা কমেছে। অথবা পূর্বেই দেখেছি যে প্রাচীন মধ্যযুগে এক কার্ষাপণ বা রূপ্যক যার ওজন ছিল ৩২ রতি, তার বাজারদর ছিল ১২৮০ কড়ি। আকবরী রৌপ্যমুদ্রার ওজন ছিল ১০০ রতি যার বাজার দর ৩২০০ কড়ি ছিল, অর্থাৎ ওজনের দিক দিয়ে বিচার করলে কড়ির মানের হেরফের হয়নি।[২৮]

অষ্টাদশ শতকে কড়ির অবমূল্যায়ন ঘটতে থাকে। এম. সি. দে.[২৯] দেখিয়েছেন ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে ১ টাকায় ২৪০০ কড়ি পাওয়া যেত, ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ২৫৬০ কড়ি এবং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে এসে দাঁড়ায় ৬৫০০ কড়ি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ষষ্টদশ, সপ্তদশ শতাব্দীতে ক্রীতদাস বেচাকেনার জন্য কড়ির প্রচলন এত জনপ্রিয় হয়ে উঠে যে দাস কেনার প্রয়োজনে প্রচুর কড়ি ইংল্যাণ্ডে আমদানী করা হয়েছিল। (Hobson-Jobson, p.270)। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত আফ্রিকাতে নিগ্রো ক্রীতদাস কড়ির মাধ্যমে ক্রয় করা হত। স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রার ন্যায় কড়ি রপ্তানী করে প্রভূত লাভবান হতেন।

মালদ্বীপ থেকে ১ টাকায় ৯ হাজার থেকে ১০ হাজার কড়ি কিনে বাংলায় ১ টাকায় ২৫০০ থেকে ৩২০০ কড়ি বিক্রয় করতেন।[৩০] উনবিংশ শতাব্দী থেকে কড়ি অবমূল্যায়ন দ্রুত গতিতে ঘটতে আরম্ভ করে। কিছুকাল পরে বিট্রিশ ভারতে রাজস্ব হিসাবে কড়ি গ্রহণ বন্ধ হয়ে যাবার ফলে কড়ি ধীরে ধীরে অপ্রচলিত হয়ে যায়।

পরিশেষে, যে কথা আমাদের মনে বার বার রেখাপাত করে তা হ'ল পূর্ব ভারতে বিশেষ করে বাংলাদেশে চতুবর্ণের পরিবর্তে দ্বিবর্ণের নতুন যে আর্থ-সামাজিক পুনর্বিন্যাস ঘটে তাতে সামন্ততান্ত্রিক প্রথাকে আরও দৃঢ়ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বৈদেশিক ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসারের অনিবার্য ফলস্বরূপ দেশে প্রভূত অর্থাগম হলেও সাধারণ মানুষের জীবনমানের বিশেষ কোন হেরফের হয়নি। কারণ, উদ্বৃত্ত সম্পদের সাহায্যে পুঁজিপতিদের পক্ষে নতুন কোন কর্মে বিনিয়োগ করা সম্ভব ছিল না। সামন্তপ্রভু, বা নৃপতি-বর্গ বা অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিগত প্রয়োজন, ব্রাহ্মণ-বিদায় প্রাসাদ বা মন্দির নির্মাণ অথবা যুদ্ধের ব্যয়ভার নির্বাহে উদ্বৃত্ত অর্থ নিয়োজিত হত, অবশিষ্ট অর্থ ব্যয় হত বিদেশী বণিকদের আমদানী দ্রব্যের বিনিয়োগে। ফলে সমাজে যথার্থ কোন মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠতে পারেনি এবং গ্রামগুলিতে স্বনির্ভর কৃষিভিত্তিক জীবনধারা একই খাতে প্রবাহিত হত – বৈদেশিক ব্যবসায় বাণিজ্যের বিশেষ কোন সুফল গ্রামগুলির ভোগ করতে পারত না।

তথ্য নির্দেশিকা

১। E. Babelon, *Traite des monnaies grecques at romaines* I,Paris, 1901, Cols 67 ft.

২। John Evelyn, *Numismata*, London, 1697, pp. 1-2.

৩। Babelon, cols, 83 ff. ৪। Babelon, 118.

৫। *Studies in Indian Coins*, p. 64.

৬। R. C. Majumdar, *History of Bengal*, I 665 ft.

৭। R. S. Sharma, *Perspectives in social and Economic History of East India*, Delhi, 1983, pp. 184 ft.

৮। এই নৃপতিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেনঃ সমাচার দেব (also cf. Ghugrahati plate) শশাঙ্ক, জয়নাগ (also cf. Vappaghoshavata charter from Karnasuvarna) দেববর্মণ (সম্ভবতঃ দেবখড়্গ), সুধন্যাদিত্য (কেহ কেহ ইহার নাম বসুবর্মণ পড়েছেন। cf. B. N. Mukherjee in *Numismatic studies*, vol. 2. New Delhi, 1992, p. 31. রাজভট, বালভট্ট, জীবধারণরাত, বঙ্গালমৃগাঙ্ক আনন্দবেদ, পৃথুবী(রে) প্রভৃতি। cf. M. H. Rashid, 'The Mainamati gold coins' in *Bangladesh Lalitkala*, No. 1 1975; F. A. Khan, *Mainamati*, Karachi, 1663. সম্প্রতি প্রকাশিত B. N. Mukherjee, *Media of Exchange in Early Mediaval North India*, Harman Publishing House, 1992 পুস্তকে উল্লেখিত নৃপতিবর্গের মুদ্রা সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন।

৯। P. K. Bhattacharyya in *J. R. A. S.* No. 2 1974, 153 ff.
কেহ কেহ অসতর্কভাবে এই মুদ্রাকে জাল মুদ্রা বলে মনে করেন। কিন্তু রৌপ্যমুদ্রা তার ধাতুগত মান (বা intrismic value) অক্ষুন্ন থাকলে তাকে জাল বলে অভিহিত করা আমাদের বিচারে এক ধরণের গোঁড়ামী বা প্রচলিত বিশ্বাসকে ধরে রাখার প্রবণতা ছাড়া কিছু নয়। মনে রাখা দরকার এ যুগে ধাতুর মুদ্রা করার দায়িত্ব সাধারণভাবে বণিকদের উপর ন্যস্ত থাকত।

১০। *The Travels of Marco Polo*, tr, R. Latham, London, 1959.

১১। *The Chinese and Arab Trade in 12th & 13th centuries*, Taipei, 1964 and M. A. F. Meilink-Roelofsz, *Asian Trade and European influence in the Indonesian Archipelago Between 1500 and about 1630*, The Hague, 1962.

১২। P. K. Bhattacharyya in *J. N. S.*, XLIII, 1981, 606 ff.
অধ্যাপক ভট্টাচার্য মনে করেছিলেন 'শ' সম্ভবত 'শ্রী' এর পরিবর্তে লেখা হয়েছে ভুল করে।

১৩। M. H. Rashid "The Origin and Early kingdoms of the Chansas of Rohitagiri' in *Bangladesh Historical studies*, II..
সম্প্রতি B. N. Mukherjee প্রণীত *Media of Exchange in Early Medieval North India*, Harman Publication House, Delhi, 1992 প্রকাশিত পুস্তকে হরিকেল মুদ্রার কয়েকটি উচ্চমানের ছবি এবং তৎসম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছেন।

১৪। ভাগলপুর লিপি (নারাণপালদেব). See A. K. Maitreya, Gaudalekhamle, Rajshahi, 1319, pp. 55 ff.

১৫। Elliot and Dowson, *History of India as told by its Historians*, vol. I, p. 361.

১৬। Yule, H., *The Book of Ser Marco Polo*, vol. II, p. 175.

১৭। See the Article of M. R. Tarafdar in *The Indian Historical Review*, Vol. IV. 1978, pp. 274 ff.

১৮। M. H. Rashid, The Mainamati *Gold Coins*, *Bangladesh Lalitkala*, i. No. 1.

১৯। Elliot and Dowson, *op. cit.*, vol I. pp. 5. 14, 361.

২০। S. H. Hodivala, *Studies in Indian Muslim History*, p. 4.

২১। *নির্জিত্য বঙ্গপতিম্* of the Gowalior Inscription of king Bhoja I.
২১(ক)। D. C. Sircar, *পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত*, কলিকাতা, ১৯৮২, পৃঃ ১০৯ f.

২২। See V. Minorsky, Hudud - al - Alam, *The Regions of the world - A Perston Geography, 372 A. H. - 982 A. D.*, London, 1937, pp. 66, 72, 80, 87 and also pp. 236-37.
B. N. Mukherjee উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা চক্রে উক্ত বিষয়ের আলোক পাত করেছেন (তাঁর প্রবন্ধের নাম Coins and commerce in Early and Early-Medieval Bengal, pp. 1-70).

২৩। নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৫৪৮-৯। Also cf. Bhasker Chatterjee in *Journal of the Numismatio society of india*, Vol. L, 1988, p. 109.

২৪। এক চতুর্থ শতমান ৮০ রতি- ১৬৪.৪ গ্রেন এবং এক অষ্টম শতমান (বা শান) ৪০ রতি ৭৩.২ গ্রেণ, See D.C. Sircan, *Studies in Indian Coins*, p. 55.
এই জাতীয় মুদ্রাগুলির সাধারণতঃ ৭৫ গ্রেণ থেকে ৯২.৫ গ্রেণ ওজনের পাওয়া যায়।
নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে গুপ্ত-অনুকৃতি মুদ্রার ওজন ছিল ৫০ রতি, বা অর্দ্ধ-সুবর্ণ মান অর্থাৎ ১ রতি - ১.৯ গ্রেন হিসাবে ৯৫ গ্রেন। যদি এর মধ্যে খাদের পরিমাণ বেশী থাকত তবে রৌপ্যমুদ্রার সহিত আনুপাতিক হার হত ১৪৮ বা ১ ঃ ৯। (*JASB* NS, 1923, p. 61) । প্রসঙ্গক্রমে, সুলতান বংশ দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হবার পর যে রৌপ্যমুদ্রা চালু হয়েছিলেন, তার মূল উৎস ছিল বাংলার রৌপ্যমুদ্রা এবং এই সময় স্বর্ণের সহিত রৌপ্যের আনুপাতিক হার ছিল ১ ঃ ১০।
(Simon Digby in *Cambridge Economic History of India*, vol I. pp. 94-5

২৫। *Ancient Numismatics: A Brief Introduction*, New York, 1958, p. 55.

২৬। অষ্টাদশ - উনবিংশ সালে নেপালের তাম্রখনিতে যে ধরনের কাজ চলত তার কথা P. K. Bhattacharyya - এর An unpublished Document of Nepal and its Bearing on the coinage of Sikkim শীর্ষক যে প্রবন্ধটি Berlin Museum এর G. Bhattacharyya - এর সম্পাদিত Deyadharma, pp. 133 ff. পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

২৭। Joe Cribb, *Money from Courie shells to Credit Card*, The British Museum, 1986, pp. 16ff.

২৮। Thomas Bowery as mentioned by B. S. Mallick in *Indian Historical Review*, 1981, Vol. VII. p. 136.

২৯। *The Orissa Historical Research Journal*, April, 1952, No. 1. p. 8.

৩০। D. C. Sircar, *Jour Ane Ind.* H. C. V., x, 1976-7, 28 ff.

প্রাচীন বাংলার নগর সভ্যতার বিকাশ ও রূপরেখা

মোঃ গোলাম মরতুজা

সারসংক্ষেপ

সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে নগরায়ণ প্রক্রিয়া দ্রুতগতিতে তরান্বিত হচ্ছে। নগরের পরিধি ও সংখ্যা বাড়ছে–সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনেই। বর্তমান কালের নগরায়ণ ও এ থেকে উদ্ভূত সমস্যাদি নিয়ে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে গবেষণা চলছে। কিন্তু এ অঞ্চলের অতীত নগরসভ্যতা ও তার প্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনা এবং মৌলিক গবেষণা হয়নি বললেই চলে। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সাহিত্য আলোচনা ও গবেষণায় প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে নগর সভ্যতা আলোচিত হয়েছে। মূলতঃ প্রাচীন বাংলায় নগর সভ্যতা সামগ্রিকভাবে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। এ প্রবন্ধে আলোচনার সুবিধার্থে গুপ্তবংশের রাজত্ব হতে বাংলায় মুসলমানদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত সময়কে প্রাচীন যুগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রবন্ধে আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে প্রাচীন বাংলার নগরের শ্রেণী বিন্যাস, অবস্থান, নগর পত্তনের কার্যকরণ, আয়তন, ব্যবসা–বাণিজ্য, শিক্ষা–দীক্ষা, নগরবাসীদের প্রকারভেদ/শ্রেণী–বিন্যাস ও অবস্থান, নাগরিক সুযোগ–সুবিধাদি, নগর প্রশাসন ও প্রশাসন পরিচালনা, নগরবাসীর জীবনধারা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, ইমারত/বাসগৃহ নির্মাণ শৈলী, নগর–গ্রামের পারস্পরিক যোগসূত্র ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। প্রাচীন বাংলার নগর সভ্যতার বিকাশ ও রূপরেখা সম্বন্ধে উচ্চতর গবেষণা ও প্রাসঙ্গিক কিছু প্রস্তাবনাও রাখা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, আজকের নগরায়নের ধারা প্রাচীন যুগ হতে ভিন্নতর। সময় বিবেচনা বাদ দিলে এটা ঠিক যে, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ ও উন্নয়নে অর্থাৎ সভ্যতায় নগরের ভূমিকার ধারা/প্রক্রিয়া বস্তুতঃ একই। সুতরাং প্রাচীন বাংলার নগর সভ্যতার বিকাশ ও রূপরেখা বিষয়ক আলোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী।

ভূমিকা

একথা সত্য যে, বাংলাদেশ ও বাঙালী সভ্যতার রূপ গ্রাম ভিত্তিক। ২৫০০ থেকে ৩০০০ বছর আগে সৃষ্ট মোহেন–জো–দারো ও হরপ্পা নগর সভ্যতার মতো অনুরূপ কোন নগর সভ্যতা এ অঞ্চলে অষ্ট্রিক–দ্রাবিড় সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছিল কি না–এ সম্পর্কে সন্দেহ আছে। সে সময় বাংলাদেশে কৃষি আর গ্রামীণ সভ্যতারই প্রাধান্য ছিল। তা সত্ত্বেও দ্রাবিড় ভাষাভাষী লোকদের সহায়তায় পরবর্তীতে বাংলার নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল–তার প্রমাণ বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গবেষণা

থেকে পাওয়া যায়। প্রাচীন লিপিমালা ও সমসাময়িক সাহিত্যেও নগর সভ্যতার বিবরণ আছে। প্রাচীন বাংলার নগরগুলি একাধিক প্রয়োজনে যেমনঃ ধর্মীয়/তীর্থস্থান, সামরিক, রাষ্ট্র পরিচালনা/প্রশাসনিক, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। এটা বলাই বাহুল্য যে, সে সময়ে নগরের অবস্থান, আয়তন, গুরুত্ব সম্পদ ইত্যাদি বর্তমান যুগের মতো ছিল না।

প্রাচীন বাংলায় জনপদ সমূহ নগর বা গ্রাম সমূহকে বিন্যাস করা ছিল। এ সম্পর্কে কৌটিলীর অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে,

> "আটশত গ্রাম মধ্য নামক (পরবর্তী সময়ে নিগমাপরণামধেয় স্থান) নগর, বা মহাগ্রাম বিশেষ, চারিশত গ্রাম মধ্যে দ্রোনমুখ নামক উপনগর বিশেষ, দুইশত গ্রাম মধ্যে কার্ব্বটিক (পাঠান্তরে খার্ব্বটিক) নামক ক্ষুদ্র নগর বিশেষ এবং দশখানি সেই প্রকার গ্রাম সংগৃহীত বা একত্রিত করিয়া সংগ্রহণ নামক (পরবর্তী সময়ে মহাসঙ্গাপর পর্যায়) বড় গ্রাম বিশেষ স্থাপন করিবেন।"[১]

এ থেকে এটাই জানা গেল যে, প্রাচীন বাংলায় গ্রাম সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র জনপদ এবং এরপর পর্যায়ক্রমে বড় জনপদ হচ্ছে সংগ্রহণ, 'কার্ব্বাটিক', দ্রোনমুখ এবং স্থানীয় (সর্বাপেক্ষা বড় নগর)। প্রাচীনকালে বাংলার প্রত্যেকটি বড় বড় পুর ও নগর প্রাচীর ও পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত ছিল।

বিভিন্ন উৎস বিশেষতঃ প্রাচীন বাংলার ইতিহাস সর্ম্পকীয় বই ও পত্র-পত্রিকা হতে প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর ভিত্তি করেই আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করা হয়েছে। শুরুতেই বলে নেয়া শ্রেয়ঃ যে, প্রাচীন বাংলার নগর সভ্যতার ইতিহাস এসব বই ও পত্র-পত্রিকায় নেই বললেই চলে আর যা আছে তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। নিজের পেশাগত অভিজ্ঞতা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণের সঙ্গে আলোচনা হতে প্রাপ্ত তথ্যাদিও এ প্রবন্ধ রচনায় বিশেষভাবে সহায়তা করেছে।

এ প্রবন্ধে প্রাচীন বাংলার নগর সভ্যতা গড়ে উঠার সম্ভাব্য সহায়ক কারণসমূহ, নগরের অবস্থান, নগরে বসবাসকারীদের শ্রেণীবিন্যাস, নগরের সুযোগ-সুবিধাদি, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, নগর ও গ্রামের পারস্পরিক যোগসূত্র, ইমারত/বাসগৃহ নির্মাণ শৈলী ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। শেষে, 'প্রাচীন বাংলার ইতিহাস' সম্পর্কে গবেষণার লক্ষ্যে কিছু প্রস্তাবনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রবন্ধে গুপ্তপূর্ব গুপ্ত বংশের কাল হতে সেন বংশের রাজত্বকালের নগর সভ্যতার বিষয়াদি স্থান পেয়েছে।

ভৌগোলিক অবস্থান

প্রাচীন বাংলার ভৌগলিক সীমানা বর্তমান বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এর বিস্তৃতি ছিল ব্যাপক। উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সমতল ভূমি, পূর্বে

গারো ও লুসাই পর্বত, পশ্চিমে রাজমহল পর্বতমালা ও তৎসংলগ্ন অনুচ্চ মালভূমি ছিল প্রাচীন বাংলার সীমানা।[২] এই ভৌগলিক অবস্থানের ফলে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণে যেন স্বয়ং প্রকৃতিই এ অঞ্চলটিকে বহিরাক্রমন হতে রক্ষা করত।

পশ্চিম, উত্তর এবং পূর্বের পাহাড়িয়া এলাকার কিছু অংশ বাদ দিলে সমগ্র বাংলার প্রায় সবটাই ভূ-তাত্ত্বিক দিক হতে একটি নবসৃষ্ট ভূমি -যা গংগা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদী বিধৌত একটি উর্বর অঞ্চল। এসব নদ-নদী এবং তাদের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা যুগে যুগে পলিমাটি বহন করে সমতল ভূমিকে শুধুমাত্র শস্য-শ্যামলা করেনি বরং তাদের গতি পরিবর্তনের সাথে সাথে সমগ্র জাতীয় জীবনে এনেছে বিরাট বিবর্তন। এসব বিবর্তনের ফলে বহু বর্ধিষ্ণু ব্যবসা কেন্দ্র, নগর ও বন্দরের হয়েছে উত্থান-পতন।[৩] কৌশীনদের পরিবর্তনের ফলে বন্যা-প্লাবনে প্রাচীন গৌড় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাম্রলিপ্তি ও সপ্ত গ্রাম বন্দরের উত্থান-পতনের মূলে রয়েছে নদীর গতিপথ পরিবর্তন। কীর্তিনাশা গংগা/পদ্মা নদী যে কত জনপদ ও শস্য বিলীন করেছে তার হিসেব নেই। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ভ্যান ডেন ব্রোক বিরচিত মানচিত্রের সঙ্গে বাংলার বর্তমান নদ-নদীগুলোর অবস্থান তুলনা করলেই 'নদী বিপ্লবের' বা গতিপথ পরিবর্তনের একটা সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যাবে।[৪]

রাজমহল পবর্তমালার সানুদেশেই বাংলায় গঙ্গার প্রবেশ দ্বার। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বেও এখনকার বর্তমান ধারা থেকে কিঞ্চিৎ উত্তরে ও পূর্বে গঙ্গা প্রবাহিত হত। বর্তমান গতিপথে এসে উপনীত হতে দক্ষিণে ও পশ্চিমে গঙ্গা একাধিকবার গতিপথ পরিবর্তন করেছে। প্রাচীন গৌড়ের প্রায় পঁচিশ মাইল দক্ষিণে গঙ্গা দ্বিধা বিভক্ত হয়েছেঃ (ক) দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে ভাগীরথী নামে এবং (খ) দক্ষিণ পূর্বে প্রবাহিত হয়েছে কখনও গঙ্গা কখনও পদ্মা নামে। হুগলীর কাছাকাছি ত্রিবেনী তার তিনটি শাখায় বিভক্ত ছিলঃ (ক) স্বরস্বতী, (খ) যমুনা এবং (গ) ভাগীরথী। কোনটিরই প্রাচীন গতিধারা আজ আর নেই। কালের বিবর্তনে পদ্মারও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। একদা ব্রহ্মপুত্র বা লৌহিত্য নদ-গাড়ো পাহাড়ের পাশ দিয়ে এসে ময়মনসিংহ জেলার মধুপুর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ঢাকা জেলার পূর্বদিকে সুবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁ অঞ্চলে ধলেশ্বরীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। যুগে যুগে ব্রহ্মপুত্র তার গতিধারা পরিবর্তন করে যমুনা নামে প্রবাহিত হয়ে গোয়ালন্দের কাছে এসে পদ্মায় মিশেছে। পুরানো ব্রহ্মপুত্রের আরেকটি শাখা প্রবাহ নির্গত হয়েছে শীতলক্ষ্যা নদী নামে যা দক্ষিণে নারায়নগঞ্জের নিকটে ধলেশ্বরীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। শীতলক্ষ্যা নদীর প্রবাহ বর্তমানে ক্ষীণ হলেও উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায়ও এ নদী ছিল প্রশস্ত এবং গতি ছিল অত্যন্ত তীব্র। খাসিয়া-জৈন্তিয়া শৈলমালা হতে মেঘনার উদ্ভব। কিন্তু উত্তর প্রবাহে সুরমা নামেই খ্যাত এবং এ নামটি বেশ প্রাচীন। সুরমা বর্তমান সিলেট জেলার ভিতর দিয়ে নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলার পূর্বসীমা স্পর্শ করে ভৈরববাজারের কাছে পুরানো ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিলিত হয়েছে। এ নদীর গতিপথের উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয়নি। মেঘনার নিম্ন-প্রবাহের দুই তীরে সমৃদ্ধ জনপদের পরিচয় চর্তুদশ শতকে ইবনে বতুতার বিবরণেই পাওয়া যায়।[৫] উত্তরবঙ্গের নদ-নদীর মধ্যে করোতোয়াই প্রধান। এ নদীর ইতিহাস সুপ্রাচীন। পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী প্রাচীন পুণ্ড্রনগর (বর্তমানে

মহাস্থানগড়, বগুড়া শহরের অদূরে) এই করোতোয়ার তীরেই অবস্থিত। সপ্তম শতকে যুয়ান-চোয়াঙ পুণ্ড্রবর্ধন হতে কামরুপ যাবার পথে এই করোতোয়ার নদী অতিক্রম করেছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর রাম চরিতে কবিপ্রশস্তিতে বলা হয়েছে- বরেন্দ্রী দেশ গঙ্গা ও করোতোয়ার মধ্যবর্তী দেশ। বরেন্দ্রীর অন্তর্ভুক্ত গ্রাম ও নগরগুলির অবস্থিতি বিশ্লেষণ করলে সন্দেহ থাকে না যে, সপ্তম শতকে বরেন্দ্রীর পূর্ব দিক ঘিরে পুণ্ড্রবর্ধনের পূর্ব-সীমা দিয়ে করোতোয়া প্রবাহিত হতো।[৬]

উপরে বর্ণিত প্রধান ও প্রশাখা নদ-নদী বাহিত পলিমাটি এবং সাগরগর্ভ থেকে তাড়িত বালুকারাশির সমন্বয়েই গড়ে উঠেছিল বাংলা, নির্মিত হয়েছে বাংলার আকৃতি-প্রকৃতি। এখনও এর আকৃতি-প্রকৃতির পরিবর্তন হচ্ছে। এসব নদীর উপস্থিতিই বাংলাকে করেছে সুজলা সুফলা। প্রধান নদ-নদীগুলোর তীরে অবস্থিত প্রাচীন গৌড়, তাম্রলিপ্তি ও সপ্তগ্রামের কথা বাদ দিলেও নদ-নদীকে কেন্দ্র করে বহু প্রাচীন শহর-বন্দর গড়ে উঠেছিল যেমন- করোতোয়ার তীরে প্রাচীন নগরী পুণ্ড্রবর্ধন, মেঘনা তীরে সুবর্ণগ্রাম, রামপাল, বিক্রমপুর ইত্যাদি। প্রাচীন বাংলা গৌড়, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ, বঙ্গাল, পুণ্ড্র, বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী, রাঢ়, তাম্রলিপ্তি, বারক, কঙ্গগ্রাম, কজঙ্গল, দণ্ডভুক্তি, খাড়ি, নাব্য ইত্যাদি জনপদে বিভক্ত ছিল। এসব জনপদের ভৌগোলিক সীমারেখা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ছিল। ভাগীরথীকে সীমারেখা ধরলে পশ্চিমে অবস্থিত ছিল কজঙ্গল, রাঢ়, কঙ্গগ্রাম, বর্ধমান, কর্বট, সুহ্ম, তাম্রলিপ্তি ও দণ্ডভূক্তি। আর পূর্ব উত্তরে ছিল পুণ্ড্র, গৌড় ও বরেন্দ্র। মধ্যভাগে ও দক্ষিণে হরিকেল, সমতট, বঙ্গাল, খাড়ি ও নাব্য। এসব জনপদগুলিকে কেন্দ্র করে প্রাচীন যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র ও শহর গড়ে উঠেছিল।[৭]

ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে বিশেষতঃ নদ-নদী দ্বারা বিধৌত পলি মাটিতে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও তার বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যেই প্রাচীন বাংলার নদী তীরে বিভিন্ন ব্যবসাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে এসব জনপদ জনসাধারণের সমাগমে ক্রমে ক্রমে নগরে পরিবর্তিত হয়।

নগর সভ্যতা প্রক্রিয়ায় সহায়ক কারণসমূহ

শুরুতেই এটা বলে রাখা ভাল যে, প্রাচীন যুগে নগরায়নের প্রক্রিয়া বা গতি বর্তমান কালের মতো এতোটা দ্রুত ছিল না। অধিক সংখ্যক লোকও এক জায়গায় দ্রুত গতিতে একত্রিত হতো না। ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্র পরিচালনা, সামরিক, শিক্ষা-দীক্ষা চর্চা ইত্যাদি কারণেই কোন জলপথ বা স্থলপথকে কেন্দ্র করে নগর গড়ে উঠত। নিম্নে প্রাচীন বাংলার নগর পত্তন প্রক্রিয়ার সহায়ক কারণসমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

(ক) সম্পদের প্রাচুর্যতা

প্রাচীন বাংলা কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি সাধন করে প্রচুর ধনোৎপাদন করেছিল। বাংলাদেশ নদীমাতৃক, এর ভূমি নীচু এবং বৃষ্টিপাত কৃষির পক্ষে অনুকুল। বাংলার ভূমির উর্বরতা

সম্বন্ধে চীন পরিব্রাজক যুয়ান-চোয়াঙ বিশদ বিবরণ দিয়েছেন।[৮] প্রাচীন গ্রন্থ সাদুক্তিকর্ণমৃতে বাংলায় প্রচুর ধান ও আখ উৎপাদনের কথা উল্লেখ আছে। বাঁশ আর বড় গাছ হতেও প্রচুর অর্থোপার্জন হতো। চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ছিল লবণ। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে বরেন্দ্র ভূমিতে এলাচ চাষের কথা উল্লেখ আছে। এসব মসলা পশ্চিম এশিয়া, মিশর এবং পূর্ব ও দক্ষিণ ইউরোপে রপ্তানি হতো বলে পেরিপ্লাস ও টলেমীর ইণ্ডিকা গ্রন্থেই প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজশেখর তাঁর কাব্য মীমাংসা গ্রন্থে পূর্বদেশে ১৬টি জনপদের কথা উল্লেখ করেছেন এবং এই ১৬টি জনপদে উৎপাদিত দ্রব্যের একটি তালিকাও দিয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-লবনী, গ্রন্থিপর্ণক, অগুর, দ্রাক্ষা ও কস্তরিকা। এই ১৬টি জনপদের চারিটি যথা-পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্তি, সুক্ষ্ম ও ব্রহ্মোত্তর বাংলাদেশের সীমানায় অবস্থিত ছিল। পেরিপ্লাস গ্রন্থে বাংলার উন্নতমানের মুক্তার বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রেষ্ঠ কার্পাসও এ অঞ্চলে উৎপন্ন হতো। বঙ্গ ও পুণ্ড্রে প্রাচীন কালে চার প্রকার বস্ত্র শিল্প ছিল যথা- দুকুল, পত্রোর্ণ, ক্ষৌম ও কার্পাসিক। প্রাচীন বাংলার এ সম্পদের কথা গ্রীক ঐতিহাসিকেরাও উল্লেখ করেছেন। এসব বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি হতো। ত্রয়োদশ শতকের দিকে মার্কোপলো বলেছিলেন যে, বাংলায় প্রচুর কার্পাস উৎপন্ন হতো এবং কার্পাসের ব্যবসা ছিল সমৃদ্ধ। হস্তিদন্ত শিল্প, দুমুখো তলোয়ার, বিভিন্ন কারুশিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রাচীন বাংলা উন্নত ছিল। নৌ-শিল্প বা পোত নির্মাণ শিল্পেও বাংলা বিখ্যাত ছিল। নদীমাতৃক দেশে ছোট-বড় নৌকা, সমুদ্রগামী পোত ইত্যাদি নির্মাণ সংক্রান্ত একটা শিল্প ও বাণিজ্য প্রাচীন বাংলায় ছিল। চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপ অঞ্চল এ শিল্পের জন্য খ্যাতি অর্জন করে। ক্রীটদ্বীপ ও ভূ-মধ্যসাগরীয় অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রাচীন বাংলার বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল।[৯] কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের ফলে এ দেশে প্রচুর অর্থ সম্পদের সমাগম হয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, বন্টনকেন্দ্র, যোগাযোগ, নিরাপত্তা ইত্যাদির জন্য হাট-বাজার-ঘাট গড়ে উঠেছিল যা পরবর্তীতে নগরে রূপ নিয়েছিল। নগর নির্মাণ বা পত্তনে অর্থের প্রাচুর্যতাও ছিল।

(খ) যাতায়াত ব্যবস্থা

নদী-মাতৃক এদেশে স্থলপথ অপেক্ষা জলপথেই যাতায়াত ও বাণিজ্য ব্যাপকতর ছিল। প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বণিকরা বারানসী বা চম্পা হতে জাহাজে করে গংগা, ভাগীরথী পথে তাম্রলিপ্তি আসত এবং সেখান থেকে বঙ্গোপসাগর ধরে সিংহল অথবা ব্রহ্মদেশে যেত।[১০] মেগস্থিনিসের বিবরণীতেও তাম্রলিপ্তি থেকে ভাগীরথী-গঙ্গা নদী পথে তৎকালীন রাজধানী পাটলীপুত্র পর্যন্ত জাহাজে আসা-যাওয়া করার উল্লেখ পাওয়া যায়। যুয়ান-চোয়াঙের বিবরণীতে দেখা যায় যে, কামরূপ হতে কর্ণসুবর্ণ পর্যন্ত নদীপথ ছিল। তাম্রলিপ্তি ও চট্টগ্রাম ছিল প্রধান সামুদ্রিক বন্দর। এসব বন্দরের সঙ্গে সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, চীন, ব্রহ্মদেশ, আরব, মালয়েশিয়া

ইত্যাদি দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। একথা পেরিপ্লাস গ্রন্থ ও ইৎসিঙের বিবরণীতে উল্লেখ আছে।

প্রাচীন বাংলার বাণিজ্যিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্থলপথও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে, যুয়ান-চোয়াঙের বিবরণীতেও প্রাপ্ত বিভিন্ন শিলালিপিতে প্রাচীন বাংলার সুদীর্ঘ জনপথের কথা বর্ণিত আছে। পুণ্ড্রবর্ধন হতে পাটলীপুত্র, তাম্রলিপ্তি হতে বন্দুগরা, চম্পা (বর্তমান ভাগলপুর) হতে কজঙ্গল (উত্তর রাঢ়) হয়ে পুণ্ড্রবর্ধন; কামরূপ হতে সমতট (ত্রিপুরা, ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, ২৪ পরগনা), কর্ণসুবর্ণ হতে ওড্র, কলিঙ ইত্যাদির সঙ্গে স্থলপথে যোগাযোগ ছিল। পূর্ব ত্রিপুরা হতে ব্রহ্মদেশ ও চট্টগ্রাম হতে আরাকান পর্যন্ত স্থল পথে সংযুক্ত ছিল। আজকের রেলপথ মূলতঃ এসব স্থলপথ ধরেই নির্মিত হয়েছে। এসব স্থলপথগুলি শুধুমাত্র বাণিজ্যিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই অবদান রাখেনি বরং জনপদ সৃষ্টি ও উন্নয়নেও বিশেষ অবদান রেখেছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে দেখা যায় যে, আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রধান প্রধান নগরীতে নগরায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হচ্ছে। অনুরুপভাবে প্রাচীন বাংলারও জল ও স্থলপথের যোগাযোগ স্থাপনের ফলে বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র ও নগরের সৃষ্টি হয়েছিল।

(গ) শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বিহার স্থাপন

প্রাচীন বাংলার উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে এবং পরে ক্রমশঃ পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে সংস্কৃতি ও শিক্ষা-দীক্ষা চর্চার এক গৌরবোজ্জ্বল ধারা প্রবাহিত হয়েছিল। উয়াং চুয়াঙ ও অন্যান্য চৈনিক পরিব্রাজকেরা বলে গেছেন যে, সপ্তম শতকে বাংলার বিভিন্ন স্থানে ৭০টি বৌদ্ধ বিহার স্থাপিত হয়েছিল। বৌদ্ধ বিহারগুলি যে কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্র অনুশীলনের কেন্দ্র ছিল তা নয়; সেখানে ব্যাকরণ, শব্দতত্ত্ব, ন্যায়তত্ত্ব, দর্শন, চিকিৎসা, বেদ, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, ছন্দজ্ঞান, যোগ, জ্যোতিষ প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান দান ও জ্ঞানের চর্চা করা হতো। বস্তুতঃ পাল ও বিশেষ করে সেনযুগকে বাঙলা ও সংস্কৃত ভাষা চর্চার স্বর্ণযুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। প্রাচীন বাংলার জগদ্দল, সোমপুরী, পাণ্ডুভূমি, ত্রৈকুটক, বিক্রমপুরী, দেবীকোট, সুন্নগর, চুন্নহরি, পণ্ডিত, পট্টিকেরক বিহার ও অন্যান্য স্থান উপরোক্ত বিষয়ে জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষার কেন্দ্র ছিল।[১১] পণ্ডিতগণ এসব বিহারে বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ রচনা করতেন। এসব শিক্ষা কেন্দ্রগুলিকে নগররূপে আখ্যায়িত করা না গেলও এখানে নগরের মতো সুযোগ-সুবিধা ছিল যাকে কেন্দ্র করে প্রচুর লোকের সমাগম ঘটত।

(ঘ) অন্যান্য কারণ সমূহঃ

প্রাচীন বাংলার নগরগুলি অন্যান্য যে কারণে গড়ে উঠেছিল তার প্রমাণ আর, সি, মজুমদার রচিত History of Bengal গ্রন্থে পাওয়া যায়।

তিনি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

> "The factors which contributed to the growth of these towns were various. It is possible, for instance, to trace the growth of Pundravardhana to three principal causes: first, it was a place of pilgrimage; secondly, it was the seat of a court or the capital of province; and finally, it was advantageously situated along the trade-route of north Bengal.... It is not impossible that a few towns might have been primarily brought into being by administrative or political reasons; but contemporary evidence proves that they were often emporiums of trade besides being political centres. Further, an analysis of the sites and positions occupied by the ancient towns of Bengal shows that they were of a geographical character that they could be utilized as 'nodes' or 'centres of routes' by land or by water."[১২]

উপরোল্লিখিত আলোচনা হতে এটা স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে, প্রাচীন বাংলায় তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন কারণে নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

প্রাচীন প্রধান প্রধান নগরগুলির অবস্থান

পাণ্ডুরাজার ঢিবিঃ ঐতিহাসিকগণ মনে করেন বাংলাদেশের নগর সভ্যতার প্রাচীনতম নিদর্শন হচ্ছে তাম্র-প্রস্তর যুগের পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলায় আবিস্কৃত পাণ্ডুরাজার ঢিবি। বর্ধমান জেলার অজয় কুনুর ও কোপাই নদীর উপত্যকায় অবস্থিত খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় দেড় হাজার বছর আগে প্রাচীন বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এ নগরটি সমৃদ্ধশালী ছিল। এ নগরীতে ইট ও পাথর দিয়ে গৃহ নির্মাণ করে লোকজন বসবাস করত। পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে ষ্টাটাইট পাথরের একটি গোলাকার সীল পাওয়া গেছে। এ প্রাপ্ত সীলটি ভূ-মধ্যসাগরীয় এলাকায় অবস্থিত ক্রীট দ্বীপের যা প্রায় খৃষ্টপূর্ব সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে নির্মিত। সুতরাং এ হতে প্রমাণিত হয় যে, খৃষ্টপূর্ব সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বের ক্রীট-দ্বীপের সভ্যতার সহিত বাংলার নগর সভ্যতার যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। পাণ্ডুরাজার ঢিবি একটি সুরক্ষিত নগরী ছিল।[১৩]

তমলুক বা তাম্রলিপ্তিঃ বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গের মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত রুপনারায়ণ নদীর তীরে অবস্থিত প্রাচীন বাংলার তাম্রলিপ্তি বাণিজ্য সমৃদ্ধ বন্দর হিসাবে সুপরিচিত ছিল। মহাভারত, টলেমী রচিত প্রভৃতি গ্রন্থে এবং ফাহিয়ান, যুয়ান-চোয়াঙ প্রমুখের ভ্রমণ বিবরণীতে এ সমৃদ্ধশালী বন্দরের কথা উল্লেখ আছে। পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, চীন, সিংহল, বার্মা ও ইউরোপের নানা দেশের সাথে এই বন্দরের মাধ্যমে বাংলার বর্হিবাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। অষ্টম দশক পর্যন্ত এ বন্দরের সুখ্যাতি ছিল। নদী ভরাট জনিত কারণে এ বন্দরের গুরুত্ব ধীরে ধীরে বিলুপ্তি ঘটে। তমলুক বা তাম্রলিপ্তি বন্দরের সহিত স্থলপথে বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের যোগাযোগও ছিল। এই বন্দরটি সমসাময়িককালের একটি বিখ্যাত শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চা কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল।[১৪] বর্তমানে এ নগরের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই নেই।

শুশুনিয়াঃ পশ্চিম বঙ্গের বাঁকুড়া জেলার দমোদর নদীর তীরে এ নগরের অবস্থান ছিল। মহারাজ চন্দ্রবর্মার লিপিতে এ নগরের উল্লেখ আছে। এ নগরের কিছু কিছু স্মৃতি এখনও বিদ্যমান।

বর্ধমানঃ এ টি ওঃ একটি প্রাচীন নগর। জৈন কল্পসূত্র, সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে, বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে এ নগরের কথা উল্লেখ আছে।

কর্ণসুবর্ণঃ প্রাচীন বাংলার আরেকটি সুপ্রসিদ্ধ নগর কর্ণসুবর্ণ। সপ্তম শতকে গৌড়রাজ্য শশাঙ্কের রাজধানী ছিল। শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র হিসেবে এ নগরের খ্যাতি ছিল। পশ্চিম বাংলার মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে এ নগরের অবস্থান।

ত্রিবেনীঃ ত্রিবেনী একটি তীর্থ এবং বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। যমুনা-স্বরস্বতী-ভাগীরথী ও তিনটি নদীর সঙ্গমস্থলে এ নগরের অবস্থান ছিল।

নবদ্বীপঃ নবদ্বীপ বা নদীয়া সেনরাজাদের রাজধানী ছিল- এ তথ্য মিনহাজ উদ্দীন এবং কুলজী গ্রন্থমালা দ্বারা সমর্থিত। কথিত আছে যে বল্লবসেন বৃদ্ধবয়সে নবদ্বীপে বাস করতেন।

পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধনঃ উত্তর বাংলার বগুড়া জেলায় করোতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত এ সুপ্রাচীন নগর ইতিহাস বিখ্যাত। দিব্যাবদান, রাজতরঙ্গিনী, বৃহৎকথামঞ্জরী, রামচরিত প্রভৃতি গ্রন্থে ও লিপিমালায় পুণ্ড্র নগরের উল্লেখ আছে। মৌর্যরাজত্ব কাল হতে ত্রয়োদশ শতকে হিন্দু আমল পর্যন্ত পুণ্ড্র নগর ধর্ম, শিল্প, তীর্থ, বাণিজ্য, সংস্কৃতি ও প্রশাসনের কেন্দ্র হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এ নগরের ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে।

ধ্বংসস্তুপ হতে প্রাপ্ত ১৯৩১ সালে আবিস্কৃত একটি শিলালিপি থেকে জানা যায়, সমৃদ্ধশালী পুণ্ড্র নগরের রাজকীয় শস্যভাণ্ডার থেকে শস্য এবং খাজাঞ্চিখানা থেকে ঋণস্বরূপ দেয়ার জন্য আদিষ্ট হন। প্রাপ্ত শিলালিপিটি ছিল প্রাকৃত ভাষায় এবং ইংরেজী অনুবাদ নিম্নরূপঃ

"To Gobardhana of the Samvamgiyas was granted by order. (Or to the Samvamgiyas was given by order Sesamum and mustard seeds). The Sumatra will cause it to be carried out from the prosperous city of Pundranaraga. (And likewise) will cause paddy to be granted to the Samvamgiyas. In order to tide over the outbreak of distress caused by flood (or fire, or superhuman agency) and insect, (lit, parrots) in the city, this granary and treasury will have to be replenished with paddy and Gandaka coins"[১৫]

সুতরাং এটা স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয় যে, তখন পুণ্ড্রনগর একটি সমৃদ্ধশালী নগর হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। এ নগরের পরিধি ছিল ৬ মাইল। মূল নগরটির দৈর্ঘ উত্তর-দক্ষিণে আনুমানিক ৫,০০০ ফুট এবং প্রস্থে ৪,২০০ ফুট। ছোট ছোট নগরোপকণ্ঠ দ্বারা নগরটি পরিবেষ্টিত ছিল। নগরটি মাটি থেকে ১৫ ফুট উঁচু, পরিখা ও দেওয়াল দ্বারা বেষ্টিত ছিল। নগরের অভ্যন্তরে রাজকীয় প্রাসাদ, মন্দির, হাট, সভাগৃহ, ইত্যাদির সুপরিকল্পিত বিন্যাস ছিল।

বানগড় বা কোটীবর্ষ বা দেবীকোটঃ পঞ্চম শতক হতে পাল আগমনের শেষ পর্যন্ত বানগড় বা কোটীবর্ষ নগর তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত ছিল। দিনাজপুর জেলার বানগড় ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি নিয়ে ছিল এ নগরের বিস্তৃতি। পরবর্তী সময়ে বিশেষতঃ এদেশে মুসলমান শাসনের শুরুতেই এ নগরীর নাম দেবীকোট করা হয়। এখানে একটি নগরকেন্দ্রীক প্রশাসনিক আউটপোস্ট ও স্থাপন করা হয়েছিল।[১৬] ধ্বংসাবশেষ হতে অনুমান করা যায় যে নগরটির দৈর্ঘ ছিল ১,৮০০ ফুট এবং প্রস্থে ১,৫০০ ফুট। পরিখা ও প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত নগরটি পুনর্ভবা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল। প্রধান নগরদ্বার, নগরের উপকণ্ঠ, রাজপ্রাসাদ, সেতু ইত্যাদিও এ নগরে ছিল। নগরটির ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে।

পঞ্চনগরীঃ বিদ্বজ্জনের মতে দিনাজপুর জেলাস্থ বেলওয়া (ঘোড়াঘাট থানা), হরিনাথপুর, চরকাই (নবাবগঞ্জ থানা), দেবীপুর (হাকিমপুর থানা) ও ফুলবাড়ী স্থানেই টলেমী কথিত পেন্টাপোলিশ এবং পাল আমলের 'তাম্রশাসন পট্ট' উল্লিখিত পঞ্চনগরীর অবস্থান ছিল। এসব অঞ্চল যে একদা সমৃদ্ধশালী প্রাচীন সংস্কৃতি ও পুরাকীর্তির কেন্দ্র ছিল এতে সন্দেহ নেই।[১৭]

লক্ষণাবতী বা গৌড়/লখনৌতিঃ রাজমহল হতে ২৫ মাইল ভাটিতে গঙ্গা-মহানন্দার সংগমস্থলে লক্ষণাবতী নগরের অবস্থান ছিল। সেন আমলের নরপতি লক্ষ্মনসেন এ নগরের প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেন। পরবর্তীকালে গঙ্গা ও মহানন্দার গতিধারা পরিবর্তনের কারণেই এ নগরটি পরিত্যাক্ত হয়। এ নগরের ধ্বংসাবশেষ আজও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। পূর্বে 'রামাবতী' বা লক্ষণাবতী নামে পরিচিত গৌড় নগরী সম্ভবতঃ পাল ও সেন বংশীয় রাজাদের অন্যতম রাজধানী ছিল।[১৮] পানিনির সূত্রে এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গৌড়ের স্বর্ণযুগের কথা উল্লেখ আছে। বাৎস্যায়নের কামসূত্র গৌড়ের নাগরিকদের বিলাসব্যসনের পরিচয় পাওয়া যায়।

দেওপাড়াঃ রাজশাহী শহর হতে ৭ মাইল পশ্চিমে পদ্মার তীরে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানায় দেওপাড়া বা দেবপাড়া নগরটির অবস্থান ছিল। নগরটি উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৭/৮ মাইল বিস্তৃত ছিল। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন এখানে সেখানে পাওয়া যায়।

কোটলীপাড়াঃ

ফরিদপুর জেলার কোটলীপাড়ায় গুপ্ত আমলের একটি দূর্গের অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এটি একটি শাসনকেন্দ্র হিসেবেও পরিচিতি ছিল।

দেব পর্বত নগরী, শালবন বিহার ও ময়নামতি এলাকাঃ সম্ভবতঃ দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের সমতট অঞ্চলে সপ্তম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে দেব পর্বত ছিল একটি উল্লেখযোগ্য সংরক্ষিত নগর এবং কুমিল্লার ময়নামতি পাহাড়েই দেব পর্বতের অবস্থান। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার দেব রাজাদের তাম্রলিপিতে দেব পর্বতের সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, শ্রীধারণ রাটের কৈলান তাম্রলিপিতে বর্ণিত আছেঃ

"অথমত্তমাতঙ্গশত-সুখ - বিগাহ্যমান-বিবিধ-তীর্থয়া-মৌভির পরিমিতা ভিরুপরচিতকুলয়া-পরিকৃতা-দভিমত-নিম্ন-গ্যামিন্যা-ক্ষরোদয়া-সর্ব্বতোভদ্রকা-দেব-পর্ব্বতাৎ"।

(দেব পর্বত ক্ষীরোদা নদী দ্বারা পরিখার মত বেষ্টিত এবং এর পানিতে হাতীরা মনের সুখে খেলতো ও দুইকূল নৌসম্ভারে সজ্জিত ছিল)।

ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে দেব পর্বত কুমিল্লা জেলার ময়নামতি পাহাড়ের কোথাও অবস্থিত এবং তাঁরা ক্ষীরোদা নদীকে বর্তমান ক্ষীর বা ক্ষীরনাই নদী বলে সনাক্ত করেন। কুমিল্লা শহরের কিছু পশ্চিমে গোমতী নদীর শাখা ক্ষীরনাই এখন শুকিয়ে যাওয়া অবস্থায় বিদ্যমান। এই নদী এককালে ময়নামতি লালমাই পাহাড়কে ঘিরে প্রবাহিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। বিশেষ করে ময়নামতি পাহাড়ের দক্ষিণ অংশ এই নদী দ্বারা বেষ্টিত ছিল।[১৯] দেব রাজবংশের দু'টি তাম্রলিপি ময়নামতি এলাকা হতে আবিস্কৃত হওয়ায় এই অনুমান আরোও জোরদার হয়েছে।

ময়নামতি-লালমাই পাহাড়ে বিরাট বৌদ্ধ বিহার এই অঞ্চলের প্রাচীনত্ব ও খ্যাতির প্রমাণ বহন করে। দেবপর্বত নগরীর ছায়াই এই বিহার প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল এবং বিহারের ধ্বংসাবশেষ এ সাক্ষ্যই বহন করে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক শাহানারা হোসেন তাঁর এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন,

"The inscriptions discovered so far connect the Mainamati site with the Devas, the Chandras and the Pattikera kingdom. And at last three cities of Devaparvata, Rohitagiri and Pattikera and the famous Pattikera Vihara of Pala Period seem to have been situated on the Mainamati-Lalamai region"[২০]

উল্লেখিত উদ্ধৃতি হতে বুঝা যায় ময়নামতি ও লালমাই অঞ্চলে দেব পর্বত, রোহিতগিরি ও পট্টেকেরা নামে তিনটি নগরের অবস্থান ছিল।

প্রাচীন বাংলার সমতট অঞ্চলে মেঘনা নদীর অববাহিকায় দেব ও চন্দ্র বংশীয় আমলে এসব শহরের গোড়া পত্তন হয়েছিল। এ নগর সভ্যতার প্রতিষ্ঠাকাল ছিল পঞ্চম শতক হতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত।[২১] যদিও এ নগরটি সমসাময়িক সমতটের রাজধানী ছিল না কিন্তু সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবে এর সুখ্যাতি ছিল। ৫০টিরও বেশী এলাকা জুড়ে এ নগরের ধ্বংসাবশেষ বিস্তৃত।[২২] এখানে গড়ে উঠে বিহার, মন্দির, স্তুপ, প্রাসাদ ইত্যাদি। মূল বিহারটির বৈশিষ্ট্য হলো এটির একটি প্রধান দ্বার ছিল। বিহারটির দৈর্ঘ্য ৫৫০ ফুট ও প্রস্থ ৫০০ ফুট এবং ১৬½ ফুট পুরো প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। বিহারটিতে ১১৫টি কুঠরী এবং প্রত্যেক কুঠরীতে কুলুঙ্গিও ৮½ ফুট চওড়া একটি টানা বারিন্দা ছিল। এর কেন্দ্রস্থলে একটি ক্রুশাকার মন্দির আছে। মন্দিরের প্রতি বাহু দৈর্ঘ্যে ১৭০ ফুট। মন্দিরটি ছিল বহুতল বিশিষ্ট এবং বেশ উঁচু। মন্দিরের প্রবেশের জন্য উত্তর দিকে প্রশস্ত সিঁড়ির ব্যবস্থা ছিল। মন্দিরের বাইরের দেওয়ালের উপর অলংকৃত ইট ব্যবহার করা হয়েছে। এসব অলংকৃত ইটে প্রাচীন বাংলার সমাজ জীবন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি প্রামাণ্য চিত্র মেলে। ময়নামতি নামের নগরটি যে ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল তা Morrison এর উক্তি হতেই বুঝা যায়।

> "However, it is suggestive that the presence of these large scale property transfers is coincident with existence of the most extensive brick-built remains in Delta. (Over fifty sites were located during my recent archeological survey of the eleven mile long Lalmai-

Mainamati Hills). Such an extensive series of occupation sites, some of which are known to have dated from the fifth to the thirteenth centuries, indicates a concentration of population whose food needs would have been met by the surplus production of the local agriculturists..... This would clearly indicate a different orientation towards donations of property and perhaps a different attitude towards religious institutions."[২৩]

বিক্রমপুরঃ বিক্রমপুর বাংলার একটি সুপ্রাচীন নগর। এটি মুন্সীগঞ্জ জেলা শহরের অদূরে প্রায় ১৫ মাইল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। সেন আমলে বিক্রমপুর শুধুমাত্র শাসন কেন্দ্র হিসেবেই গুরুত্ব অর্জন করেনি বরং সামরিক প্রয়োজনে এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। চারিদিকে নদ-নদী দ্বারা বিধৌত বিক্রমপুর নবম/দশক শতক হতে একটি বাণিজ্যিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বড় কেন্দ্র ছিল। পূর্ব-পশ্চিমে আড়াআড়িভাবে উচু প্রাচীর দ্বারা নগরটি বেষ্টিত ছিল। এ বিক্রমপুরেই অতীস দীপঙ্কর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বিক্রমপুরে কিছু স্মৃতি এখনও বিদ্যমান আছে।

সুবর্ণগ্রামঃ সুবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁ ছিল পূর্ব-বাংলার রাজধানী। কথিত আছে যে, হিন্দু রাজারাও তাঁদের রাজধানী সুবর্ণগ্রামে স্থানান্তরিত করেছিলেন। শীতলক্ষ্যা ও মেঘনার সংগমস্থলে সুবর্ণগ্রামের অবস্থান সামরিক দিক দিয়ে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেনরাজাদের শাসনামলে সুবর্ণগ্রাম নামের স্থানটি বিদ্যমান ছিল।[২৪]

সোমপুর বা পাহাড়পুরঃ নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর বা সোমপুর নগরটি ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবেই গড়ে উঠেছিল। পাল রাজাদের আমলে এর গোড়াপত্তন হয়। এখানে একটি চর্তুকোন বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দৈর্ঘ্যে ৯২২ ফুট এবং প্রস্থে ৯১৯ ফুট। এর চতুর্দিকে ভিক্ষুদের জন্য ১৭৭টি কক্ষ বিস্তৃত প্রবেশ পথ ছিল। বিহারের মাঝখানে একটি সুউচ্চ মন্দির আছে। শালবন বিহারের মতোই সোমপুর বিহারের কটুরী, কটুরীর সামনে ৮ থেকে ৯ প্রশস্থ টানা বারিন্দা, প্রত্যেক কুটিরের জন্য আলাদা দরজা ইত্যাদি ছিল। মন্দিরের গায়ে হাজার হাজার টেরাকোটা ও প্রস্তরফলক আছে। এগুলিতে বৌদ্ধ ও হিন্দু (ব্রাহ্মণ্য) ধর্মের চিত্র সমূহ অঙ্কিত আছে।

সীতাকোটঃ দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ থানায় সীতাকোট নগরের অবস্থান ছিল। এটিও ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার একটি কেন্দ্র ছিল।

বড়কামতাঃ কুমিল্লা শহরের ১২ মাইল পশ্চিমে বড়কামতা (প্রাচীন কর্মাণ্ড) ছিল সমতটের রাজধানী। হিয়েন সিন-এর বিবরণীতে জানা যায় এখানে অনেক বৌদ্ধ রাজা এবং ভিক্ষু-

ভিক্ষুণীর আগমন হতো। তিনি নিজে এখানে একটি অশোকস্তম্ভ দেখতে পান। মোটকথা এটি একটি নগর ভিত্তিক ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্র ছিল।

নগরবাসীদের বিবরণ/শ্রেণী-বিন্যাস

প্রাচীন বাংলার নগরসমূহের উন্নয়ন কার্যক্রম ও নাগরিক সুযোগ-সুবিধাদির কারণে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক নগরে বসবাস করতেন। রাজা, রাজকর্মচারী ও সামরিক কর্মচারীরা নগরে থাকতেন। নগরবাসীদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের জন্য ব্রাহ্মণ, আচার্য ও পুরোহিতগণ এবং তীর্থ ও শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনার জন্য ধর্ম ও শিক্ষাগুরুরা নগরে বসবাস করতেন। এছাড়া নগরে ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য শ্রেষ্ঠ, সার্থবাহ ও কুলিক শ্রেণীর লোকও ছিলেন। বিভিন্ন শিল্প ও অন্যান্য কাজে নিয়োজিত থাকতেন কর্মকার, কুসংস্কার, শংখকার, মালাকার, ভক্ষণ, সূত্রধর, শৌন্ডিক, ইত্যাদি শ্রেণীর লোকজন। বিভিন্ন ধরনের সেবা কাজের জন্য রজক, নাপিত, ধোপা প্রভৃতি শ্রেণীর লোকজনও নগরে বসবাস করতেন। সমাজ শ্রমিক ভুক্ত যেমনঃ ডোম, চণ্ডাল, ডোলবাহী, চর্মকার, মাংসচ্ছেদ ইত্যাদি পেশার লোকজন নগরের একটু বাইরে বাস করতেন। তবে তারাও নগরবাসী হিসেবেই পরিগণিত হতেন। রাজ-রাজারা প্রাসাদে বিশেষতঃ নদীর তীরে আলাদা জায়গায় থাকতেন। রাজা ও রাজকর্মচারী, শ্রেষ্ঠীশিল্পী, বণিক, বিত্তবাণ ও ব্রাহ্মণগণই ছিল যথার্থ নগরবাসী। মোট কথা, শ্রেণীভেদে নগরবাসীদের বসবাস করার জায়গা আলাদা ছিল। এতে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, তখনকার দিনেও নগর নির্মাণ পরিকল্পনা ছিল।[২৫] নগরবাসীরা ছিল বেশীর ভাগই ধনী ও সমৃদ্ধশালী।

নাগরিক সুযোগ-সুবিধাদি

চলাচলের জন্য নগরে রাস্তা-ঘাট নির্মাণ করা ছাড়াও নগরবাসীদের সুবিধার্থে মন্দির, স্তুপ, বিহার, উদ্যান, পুকুর, ক্রীড়াস্থান ইত্যাদি নির্মাণ করা হতো। নগরের তীর্থস্থানে ঘাট, পানি সরবরাহের জন্য জলাধার ও নালা, জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য হাট-বাজার, নদীর উপর পুল/সেতু ইত্যাদি নির্মাণ করা হতো। এসব জনহিতকর কাজকর্ম রাজকোষের আয় হতেই মিটানো হতো। নগরে আগমনকারী অতিথিদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল।

নগরে বসবাসরত বিভিন্ন পেশাজীবী যেমনঃ সংখ্যা গণনা পারদর্শী, হস্তিচালনার দায়িত্বে পুরুষ, চিকিৎসক, দূরদেশে সংবাদ বহনকারী, অশ্ববিদ্যায় অভিজ্ঞ ইত্যাদি- এ জাতীয় পেশাজীবী লোকদিগকে বিভিন্ন কর প্রদানে রহিত করে নগরে বসবাসযোগী জমি প্রদান করা হতো। কিন্তু এ জমি গ্রহণকারীগণ জমি বিক্রয় বা বন্ধক রাখতে পারিতেন না।[২৬]

কৌটিল্যের মতে প্রাচীন বাংলার নগরে পাঁচ ধরনের ছোট, বড় ও প্রশস্ত রাস্তা ছিল। 'রাজপথ' সবচেয়ে বড় রাস্তা, 'দেবপথ' মন্দিরে যাওয়া-আসা ও ধর্মীয় শোভাযাত্রা সংক্রান্ত, 'মহাপথ' সাধারণ মানুষের কাজে, 'ব্রাথা' চক্রযুক্ত গাড়ী ও রথ চলাচলের জন্য এবং 'চারিয়া' পায়ে হাঁটার রাস্তা- এভাবে বিভক্ত ছিল। বিভিন্ন পেশাজীবী বা গোত্রভূক্ত শ্রেণীসমূহকে পৃথক করার কাজে রাস্তাসমূহকে ব্যবহৃত করা হতো। মূলতঃ রাস্তা দ্বারা পাড়া বা পাড়া/ব্লক সৃষ্টি করা হতো নগরে।[২৭]

নগর প্রশাসনিক ব্যবস্থা

নগরের বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধানের লক্ষ্যে তখনকার দিনেও পেশাভিত্তিক দায়িত্ব বন্টনের ব্যবস্থা ছিল। কৌটিলীর অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত আছে,

"সমহর্তা যেমন কার্য সম্বন্ধে চিন্তা, নাগরিকও (নগরের কার্য নিযুক্ত মহাজাত্র পুরুষও) তেমন নগরের কার্য সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন (অর্থাৎ গোপ ও স্থানিকের সহায়তায় সর্ব প্রকার কার্যভার গ্রহণ করিবেন।) (নাগরিকের অধীনস্থ) গোপ নাম অধিকারী পুরুষ (উত্তম) দশটি কূলের (মাধ্যম) বিংশটি কূলের ও (অম) চল্লিশ কূলের চিন্তাভার গ্রহণ করিবেন। তিনি (গোপ) সেই কুলের বিদ্যমান স্ত্রীলোক ও পুরুষদিগকে জাতি, গোত্রনাম ও কর্ম (ব্যবসায়) সহ তাহাদিগের সংখ্যা, আয় ও ব্যয় জানিয়া রাখিবেন অর্থাৎ এইসব বিষয়ে হিসাব লিপিবদ্ধ রাখিবেন। এই প্রকার স্থানিক-নামক অধিকারী পুরুষ দূর্গ ও নগরের চতুর্ভাগের চিন্তাভার গ্রহণ করিবেন (অর্থাৎ চারিটি বিভাগ ও ওয়ার্ডে নগরকে বিভক্ত করিয়া নাগরিক ইহার প্রত্যেকটিতে একজন স্থানিক নিযুক্ত করিবেন।"[২৮]

বিভিন্ন শিলালিপিতে এ তথ্য পাওয়া গেছে যে, প্রাচীন বাংলার প্রশাসনিক স্তর-বিন্যাস মোটামুটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল যথাঃ ভুক্তি, মণ্ডলা, বিষয়, নগর ও গ্রাম। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে নগরেও একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক নগরের জন্য একজন নগর শ্রেষ্ঠ বা শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁকে প্রশাসনিক কাজে সহায়তা করতেন বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী ও পেশাভুক্ত লোকেরা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, হট্টপতি, শৌলিকক, তরিক ইত্যাদি রাজকর্মচারীরা হাট-বাজার, বাণিজ্যশুল্ক, পারঘাট-খেয়াঘাটের কর আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তোরণ কর ও জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থাও সে আমলে ছিল। অষ্টম শতকের পূর্ববর্তী লিপিগুলিতে উল্লেখ আছে যে, প্রাচীন বাংলায় তিন প্রকারের ভূমি ছিল যথা-বাস্তু, ক্ষেত্র ও খিলক্ষেত্র। বাড়ীঘর নির্মাণ ও বসতযোগ্য জমিকে বাস্তুভূমি, কৃষি কাজের উপযোগী জমিকে ক্ষেত্রভূমি এবং কয়েক বছর ফেলে রাখা জমিকে খিলক্ষেত্র বলা হতো। সুতরাং দেখা যায় যে, তখন জনপদ তথা বসতবাড়ী নির্মাণের জন্য পৃথকভাবে জমি নির্ধারিত ছিল।

নগরে ইমারত/ বাসগৃহ নির্মাণ শৈলী

বাংলাদেশ পাথরের দেশ নয় সুতরাং এখানে ইমারত নির্মাণে পাথরের ব্যবহারও ছিল না। নগরের প্রাসাদ, মন্দির, বিহার স্তুপ, ঘরবাড়ি ইত্যাদি পোড়া ইট দিয়েই নির্মাণ করা হতো। এগুলির ছাদ সমান্তরাল হতো। ইটগুলি গাঁথা হতো মাটি দিয়ে। পরে চুন-সুরকি ব্যবহার করা হয়েছিল। ফলে প্রতিকূল আবহাওয়ায় এসব ইমারতের স্থায়িত্বকাল ছিল খুব অল্প। রাজা, রাজকর্মচারী এবং সমাজের সমৃদ্ধ শ্রেণীর লোকেরা ইমারতের দরজা, জানালা, খিলান, সিঁড়ি এবং মেঝেতে কিছু কিছু পাথরের ব্যবহার করতেন। তিব্বতী লামাতারানাথের গ্রন্থে 'ধীমান' ও 'বীটপাল' নামের দুইজন খ্যাতনামা স্থাপত্য শিল্পীর উল্লেখ পাওয়া যায়। বিজয় সেনের দেওপাড়া তাম্রশাসনে "বারেন্দ্রক শিল্পী গোষ্ঠী চূড়ামনি বানক শুলপানির" উল্লেখ আছে।[২৯] তাছাড়া সোমপুর, শালবনবিহার, সীতাকোট, মহাস্থানগড়ে অবস্থিত মন্দির, বিহার, স্তুপ ও ইমারতের ধ্বংসাবশেষে সে সময়ে স্থাপত্য শিল্পে ও এর নির্মাণ শৈলীর দক্ষতার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়।

নগর ও গ্রামের পারস্পরিক যোগসূত্র

মূলতঃ প্রাচীন বাংলার অর্থনীতি ছিল গ্রাম ভিত্তিক। প্রাচীন বাংলার নগর ও গ্রামগুলি একে অপরের সম্পূরক হিসেবে কাজ করত। গ্রামে কৃষি ছিল প্রধান কাজ। কৃষিকাজ হতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি এবং অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত লোকজন তাদের উৎপন্ন সামগ্রীসমূহ বিক্রয়ের জন্য নগরে আসতো। তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদি নগরের বিপনী হতে কিনত। গ্রামীণ সমাজে বসবাসরত বিভিন্ন পেশাজীবীগণ শুধুমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে নগরে আসত। অনেকেই আবার নগরের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হয়ে নগরবাসীতে রূপান্তরিত হয়েছিল।

এছাড়া নগরে বসন্তকালে মহা চতুদর্শী তিথিতে সঙ্গমোৎসব হতো। এই উৎসব স্ত্রী-পুরুষ নৃত্যগীত বাদ্যে মেতে উঠত। বসন্তোৎসব বা হোলি, যবচতুর্বী, ঝুলন, কুসুমোৎসব, সংক্রান্ত ইত্যাদি উৎসব ও সেকালের অন্যান্য বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে নানা প্রকার ক্রীড়ার প্রচলন ছিল। এসব নাগরিক জীবনের আদর্শ গ্রামকে প্রভাবিত করেছিল। নাগরিক জীবনকে অনসুরণ করবে এমন আদেশ-উপদেশ প্রাচীন যুগে গ্রামের লোকদেরকে দেয়া হতো।[৩০]

কিছু পরিচিন্তন ও প্রস্তাবনা

সংশ্লিষ্ট আলোচনা হতে দেখা যায় যে, প্রাচীন বাংলা নগরে বিভিন্ন স্তর বিন্যাস ছিল। নগরসমূহকে রাজধানী, তীর্থস্থান, শিক্ষাকেন্দ্র, নগর উপকণ্ঠ, ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র ও বন্দর ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করা যায়। সে সময় নগরের আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে স্তর বিন্যাস করা হতো। নগরের প্রশাসনিক কাজেরও একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ছিল। নাগরিক সুযোগ-সুবিধাদি প্রদানে পরিকল্পনা ছিল এবং রাজকোষ হতে এ জন্য ব্যয়ভার বহন করা হতো। নগরের আয়ের জন্য কর ব্যবস্থারও প্রবর্তন করা হয়েছিল।

নগরসমূহের আভ্যন্তরীণ কাঠামোর প্রধান প্রধান বৈশিষ্টগুলো ছিল– চতুর্ভুজ আকারের দেওয়াল ও পরিখা দ্বারা বেষ্টিত সুরক্ষিত রাজপ্রাসাদ, নগরদ্বার, রাজকর্মচারী ও বিভিন্ন পেশাভুক্ত লোকদের জন্য পৃথক পৃথক আবাসস্থান, সেতু দ্বারা নগর ও রাস্তার যোগাযোগ স্থাপন ইত্যাদি।[৩১] নগরের এসবই আজ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যায় যে, প্রাচীন যুগে অর্থাৎ গুপ্তপূর্ব/গুপ্ত, পাল ও সেনযুগে বাংলার নগর সভ্যতা সম্পর্কে পৃথকভাবে কোন ইতিহাস রচিত হয়নি বললেই চলে। এ বিষয়ে বিস্তারিত কোন মৌলিক গবেষণাও করা হয়নি। 'প্রাচীন বাংলার নগর সভ্যতা' এমন শিরোণামে কোন ইতিহাস গ্রন্থ আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি। 'বাংলায় নগর সভ্যতার বিকার ও রূপরেখা' শিরোনামে নিম্নলিখিত পর্যায়ে বা ভাগে কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক গবেষণা কাজ হাতে নেয়ার জন্য আলোচ্য প্রবন্ধটি জোর সুপারিশ করছে।

(ক) আদিপর্ব (গুপ্ত পূর্ব, গুপ্ত, পাল ও সেন যুগ)
(খ) সুলতানী আমল
(গ) মোগল বা বাদশাহী আমল ও
(ঘ) ইংরাজ রাজপূর্ব

এ ব্যাপারে কারিগরী ও আর্থিক সাহায্য প্রাপ্তির জন্য সরকারী পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বাঙালীর নগর সভ্যতার ইতিহাস পৃথকভাবে জাতিকে উপহার দেয়া আমাদের সকলেরই একটি কর্তব্য।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাক্রমে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে নগর পরিকল্পনা বিষয়ে ডিগ্রী প্রদান করা হয়। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে বাংলার নগর সভ্যতা/ ইতিহাস সম্পর্কীয় বিস্তারিত কোন কিছুই এসব ডিগ্রীর পাঠ্যক্রমে নেই। রাজশাহী, ঢাকা ও জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ভূগোল বিভাগের 'নগর পরিকল্পনা' বিষয়ে পড়ানো হয়। কিন্তু সেখানেও প্রাচীন বাংলার নগর ইতিহাস সম্পর্কে পাঠ্যক্রমে বিশদ কিছু নেই। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নগর পরিকল্পনা ও ভূগোল বিভাগের পাঠ্যক্রমে বাংলার নগর ইতিহাস বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত করার জন্যও বর্তমান প্রবন্ধটি জোর প্রস্তাব করছে। অতীতে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক, শিক্ষা, জ্ঞানচর্চা, ধর্মীয় ইত্যাদি প্রয়োজনেই বাংলায় একটি নগর কেন্দ্রীক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন কালের নগর সভ্যতার ইতিহাস বাঙালী জাতির কাছে ততটা স্পষ্টতর নয়। তাই বাঙালীর জাতিসত্তার একটি গৌরবোজ্জল স্বরূপ উন্মোচিত হউক "প্রাচীন বাংলার নগর ইতিহাস" গবেষণার উদ্যোগের ও প্রয়াসের মাধ্যমেই।

তথ্য নির্দেশ

১. রাধা গোবিন্দ বসাক, অনুবাদিত, *কৌটিলীর অর্থশাস্ত্র*, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স লিঃ, ১৯৭৭ পৃ. ৬১।

২. নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য, *বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস*, শান্তিনিকেতন, ১৩৬০, পৃ. ৪।

৩. ঐ, পৃ. ৫।

৪. নীহারঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, কলিকাতা, লেখক সমবায় সমিতি, ১৩৮২, পৃ. ৪০।

৫. ঐ. পৃ. ৪৭।

৬. ঐ পৃ. ৪৮।

৭. ডঃ অতুল সুর, *বাঙালার সামাজিক ইতিহাস*, কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৭৬, পৃ. ৬৫।

৮. নীহারঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২।

৯. অতুল সুর, ২৫।

১০. নীহারঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২।

১১. অতুল সুর, পৃ. ৬৩-৬৫ ও আবদুল করিম, *বাঙালা ও বাঙালী*, বাঙালীর আত্মপরিচয় সফর আলী আকন্দ কর্তৃক সম্পাদিত, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯১, পৃ. ৭৫।

১২. Majumdar, R. C. (ed) *The History of Bengal*, Vol. 2, Hindu Period, Dhaka, The University of Dhaka, 1963, P. 644.

১৩. মুহম্মদ আব্দুর রহিম, আব্দুল মমিন চৌধুরী, এ. বি. মহিউদ্দীন মাহমুদ ও সিরাজুল ইসলাম, *'বাংলাদেশের ইতিহাস'*, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৭, পৃ. ৮-৯।

১৪. Husain, Shahanara, "The Terracotta Find Sports of Pre-Muslim Bengal," Published in *Journal of the Asiatic Society of Pakistan*, Dhaka, Asiatic Society of Pakistan, Vol. XV, No 2. August 1970, p. 135-136.

১৫. Mukerji, Ramaranjan and Kaity, Sachindra Kumar, *Corpus of Inscriptions*, Calcutta, Firma K. L. Mukhopadhyay, 1967, p. 39-40.

১৬. Chowdhury, Abdul Momin, *Dynastic History of Bengal*, Asiatic Society of Pakistan Publication, No. 21, Dhaka, The Asiatic Society of Pakistan, 1967, p. 260.

১৭. এ. কে. এম. জাকারিয়া, *বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ*, ঢাকা শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৪, পৃ. ৭৩-১০৭।

১৮. চৌধুরী শামছুর রহমান কর্তৃক অনুবাদিত ও সম্পাদিত, *গৌড় ও পাণ্ডুয়ার স্মৃতি*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃ. ১।

১৯. আব্দুল মোমিন চৌধুরী, দেবপর্ব্বত, আব্দুল হালীম ও আবু মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ কর্তৃক সম্পাদিত *ইতিহাস*, ঢাকা, ইতিহাস পরিষদ, তৃতীয় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ-চৈত্র, ১৩৭৬, পৃ. ২২০-২২৪। লেখক এসব তথ্য Indian Historical Quarterly, Vol. XXIII হতে পেয়েছেন।

২০. Husain, Shahanara, *Op, Cit*, P. 133.
২১. Chakrabarti, Dilip K. *Ancient Bengladesh - A Study of the Archeological Sources*, New Delhi, Oxford University Press, 1992, p. 124.
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০।
২৩. Morrison, Barrie, M. *Political Centres and Cultural Regions in Early Bengal*, Arizona, The University of Arizona Press, 1970, p. 153.
২৪. এ. কে. এম. জাকারিয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৪।
২৫. শফিকুল আসগর, *বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের ছেঁড়াপাতা*, দৈনিক জনকণ্ঠ,ঢাকা, ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪।
২৬. রাধা গোবিন্দ বসাক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪
২৭. Ray, Amita, *Villages, Towns and Secular Buildings in Ancient India*, Calcutta, Firma K. L. Mukhopadhyay, 1964, p. 52-53.
২৮. রাধা গোবিন্দ বসাক, পৃ. ২২২-২২৩
২৯. Mukherji, and Maity, Ibid, p. 258.
৩০. এস. এন. পণ্ড, *বাৎস্যায়নের কামসূত্র, কলিকাতা*, রাজেন্দ্র লাইব্রেরী, পৃ. ৫৮
৩১. Ramachandran, R. *Urbanization and Urban Systemsin India*, New Delhi, Oxford University Press, 1989, p. 40.

যশোহর জেলার নামকরণঃ একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকী

স্থানীয় ইতিহাস[১] চর্চার অন্যতম উপাদান হচ্ছে স্থানের নামকরণ। যে কোন স্থানের নামকরণের পেছনে অবশ্যই কোন কারণ অথবা ঘটনা সম্পৃক্ত রয়েছে। কিন্তু আমাদের ঐতিহ্যগত ইতিহাস বিমুখতা, ঐতিহাসিক তথ্যের উৎসসমূহ সংরক্ষণের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতিগত জ্ঞানের অভাব এবং সর্বোপরি স্থানের নামকরণের কারণসমূহ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের জন্য পৃথক কোন সরকারী অথবা বেসরকারী গবেষণা উদ্যোগ না থাকার দরুণ ক্রমাগতভাবে স্থানের নামকরণের কারণ ও ঘটনাসমূহ আমাদের স্মৃতিচ্যুত হচ্ছে। ইতিহাসের দৈর্ঘ্য যত বাড়ছে, আমাদের বিস্তৃতির মাত্রাও তত বাড়ছে। অথচ একটি স্থানের নামকরণের পেছনে ঐ স্থানের ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক গৌরবময় ঐতিহ্য অথবা সমসাময়িক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক বা স্থাপত্যগত কর্মকাণ্ডের প্রচ্ছন্ন হলেও প্রত্যক্ষ ছাপ থাকে। নামকরণের কারণ ও ঘটনা বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বিলুপ্ত হয়ে যায় সে স্থানের সেই গৌরবমণ্ডিত ইতিহাস ও ঐতিহ্য। তাই বিষয়টি গুরুত্বের সাথে অনুধাবনের অপেক্ষা রাখে। তাছাড়া প্রকৃত অনুসন্ধান ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা না থাকার কারণে পরবর্তীকালে স্থানের নামকরণ নিয়ে দেখা দেয় অনেক সন্দেহ ও সংশয়, সৃষ্টি হয় আদর্শিক অথবা ধর্মতাত্ত্বিক বুদ্ধিবৃত্তিক গোষ্ঠীগত ভয়াবহ কোন্দল।[২] তাই নামকরণের সঠিক কারণ ও ঘটনাসমূহের বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যা স্থানীয় ইতিহাস রচনার প্রধানতম উপাদান হিসেবে গৃহীত হবে এবং এ বিষয়টি ইতিহাসবেত্তাদের দায়িত্ব হিসেবে স্বীকৃত হবে–তাতে কোন সন্দেহ নেই। আলোচ্য প্রবন্ধে যশোহর জেলার নামকরণের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য অনুধাবনের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

এ প্রসংগে ইতিহাস গবেষণায় একটি স্বাভাবিক ও যৌক্তিক প্রশ্ন হলো– বাংলার অনেক জেলা বা স্থানের মধ্যে নামকরণের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য যশোহর জেলাকে কেন চয়ন করা হলো? অত্যন্ত সংগত এবং সাদাসিদে উত্তর হলো– যশোহর অঞ্চলের এমন একটি দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে যা প্রথমত এবং প্রধানতঃ যশোহর জেলার নামকরণের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে। এ প্রসংগে এখানে উল্লেখ্য যে সুলতানী আমলে খানজাহান আলী এ অঞ্চলে খলিফতাবাদ নামক একটি অর্দ্ধ স্বাধীন রাজ্য (defacto state) প্রতিষ্ঠা করে,[৩] মোগল শাসনের সূচনালগ্নে বিক্রমাদিত্য এখানে 'যশোর রাজ্য' প্রতিষ্ঠা করে,[৪] পরবর্তীকালে মোগলদের অত্যন্ত কৌশলগত

গুরুত্বপূর্ণ ফৌজদারী ছিল যশোহর,[৫] মুর্শীদকুলী খানের চাকলা ছিল যশোহর,[৬] অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৃটিশদের প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক জেলার মধ্যে যশোহর অন্যতম[৭] এবং বাংলায় বৃটিশ প্রশাসনের ক্রমবিকাশের ধারায় এ জেলায় প্রথম মহকুমার সৃষ্টি হয়।[৮] দ্বিতীয়তঃ বর্তমান প্রবন্ধকারের গবেষণার[৯] তথ্য সংগ্রহকালীণ সময়ে যশোহর ভ্রমনে যেয়ে বিভিন্ন স্থানে এবং শহরের বিভিন্ন সড়কে যশোহর নামের বানান স্বরূপ যশোহর, যশোর, যশর, জসর ইত্যাদি বানান পরিলক্ষিত হয়েছে। বানানের পার্থক্য নামকরণের সাথে সম্পৃক্ত। তাই বানানের এ সকল অসংগতি অথবা বিভ্রান্তি দূরীকরণের জন্য গবেষণার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছি। তৃতীয়তঃ যশোহর নামের উৎপত্তি এবং তার ঐতিহাসিক বিবর্তন অত্যন্ত বিতর্কিত ও কৌতুহল উদ্দিপক যা যে কোন গবেষকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে সক্ষম।

অত্যন্ত প্রাসংগিকভাবে উল্লেখ্য যে যশোহর জেলার নামকরণের বিষয়টি ইতিহাসে বহু আলোচিত হয়েছে। হরিশচন্দ্র তর্কালঙ্কার,[১০] আলেকজেন্ডার কনিংহাম,[১১] জেমস ওয়েষ্টল্যান্ড,[১২] ডাবলিও. ডাবলিও. হান্টার,[১৩] এল.এস.এস. ওমালী,[১৪] সতীশচন্দ্র মিত্র,[১৫] হীরালাল ভট্টাচার্য,[১৬] জি.এম.এ. লতিফুল বারী,[১৭] প্রমুখ যশোহরের ইতিহাস প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে নামকরণের বিষয়টার প্রতিও আলোকপাত করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ আলোচনা ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতিতে উত্তীর্ণ নয়। দ্বিতীয়তঃ লোক-কাহিনী ও প্রচলিত কল্পকাহিনীর উপর ভিত্তি করে প্রণীত এ সকল গ্রন্থ অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় ভাবাবেগ দ্বারা তাড়িত। তাই এ সকল আলোচনা প্রকৃত সত্য উদঘাটনের চাইতে জটিলতার সৃষ্টি করেছে অনেক বেশী। ফলে উপরোক্ত গ্রন্থকারদের ধারণাসমূহ ইতিহাস পরিক্রমায় পুনঃমূল্যায়নের দাবী রাখে।

যশোহর জেলার নামকরণ সম্পর্কে সর্ব প্রথম ব্যাখ্যা প্রদানকারী হলেন হরিশচন্দ্র তর্কালঙ্কার। তিনি তার ব্যাখ্যার পটভূমিতে লিখেছেন- বাংলার সর্বশেষ স্বাধীন সুলতান কাররানী বংশের দাউদ কাররানীর একজন প্রভাবশালী ও বিশ্বস্ত মন্ত্রী ছিলেন বিক্রমাদিত্য। দাউদ মোগল আধিপত্য অস্বীকার করে বিদ্রোহী হলে সম্ভাব্য মোগল আক্রমণ ও লুণ্ঠন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি কোষাগারের প্রায় সকল মূল্যবান সম্পদ নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের নির্দেশসহ তার বিশ্বস্ত মন্ত্রী বিক্রমাদিত্যের নিকট হস্তান্তর করেন। পরবর্তীকালে দাউদের পতন হলে বিক্রমাদিত্য সকল মূল্যবান সম্পদসহ সুন্দরবন এলাকায় পলায়ন করে এবং সেখানে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। তার প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের নাম ছিল- 'যশোহর রাজ্য'।[১৮] তর্কালঙ্কার আরও লিখেছেন- বাংলার দীর্ঘদিনের রাজধানী গৌড়ের যশ হরণ করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে এ নতুন রাজ্যের নামকরণ হয়েছিল "যশোহর রাজ্য"।[১৯] তর্কালঙ্কার তার এ চমৎকার ব্যাখ্যা ও বক্তব্যের উৎস সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করেননি। দ্বিতীয়তঃ তর্কালঙ্কার রাজা বিক্রমাদিত্যের অথবা তার পুত্র রাজা প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক ঐতিহাসিক ছিলেন না। তৃতীয়তঃ ওয়েষ্টল্যান্ড[২০], হান্টার[২১], কার্নিংহাম[২২], ওমালী[২৩], সতীশ চন্দ্র মিত্র[২৪] এবং লতিফুল বারী[২৫] প্রমুখ দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার

করেছেন যে বিক্রমাদিত্যের আগমনের বহু আগেই যশোহর নামক একটি স্থানের অস্তিত্ব ঐতিহাসিকভাবে বিরাজমান ছিল। চতুর্থতঃ উনিশ শতকের সূচনালগ্নে বৃটিশ পৃষ্ঠপোষকতায় এক শ্রেণীর হিন্দু লেখকগোষ্ঠী বিক্রমাদিত্য এবং তার পুত্র প্রতাপাদিত্যের মহিমা ও গরিমা জনসমক্ষে জাহির করার মানসে অনেক অনৈতিহাসিক কল্পকাহিনীর অবতারণার মাধ্যমে বহুগ্রন্থ রচনা করে ইতিহাসে বহু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন।[২৬] তাই আমরা তর্কালঙ্কারের উৎস বিহীন এ বক্তব্যকে ইতিহাস গবেষণার আলোকে ভিত্তিহীন, একান্ত ব্যক্তিগত এবং অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা বা কল্পকাহিনী বলে অভিহিত করতে পারি। উপরোক্ত মতের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ বক্তব্য রয়েছে ওয়েষ্টল্যাণ্ডের প্রতিবেদনেঃ..... "আমার নিকট ইহার এরূপ অর্থ (গৌড়ের যশ হরণ করার কারণে এ নগরীর নাম যশোহর হয়েছে) কিছুটা কষ্ট কল্পনা বলে মনে হয়।"[২৭]

যশোহর জেলার নামকরণ সম্পর্কিত দ্বিতীয় মতবাদের প্রবক্তা হলেন যশোহর জেলার প্রাক্তন কালেক্টর জেমস্ ওয়েষ্টল্যাণ্ড স্বয়ং। তিনি প্রথমে তর্কলঙ্কারের নাম উল্লেখ না করে প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে একটি জনপ্রিয় ইতিহাস পুস্তিকা হতে উপরে উল্লেখিত ঘটনা ও মতামত প্রকাশ করেন এবং তার সাথে ভিন্নমত পোষণ করে আপন ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এ প্রসংগে তিনি লিখেছেন– "আমি ইহার নামের উৎপত্তি সম্পর্কে নতুন অর্থ বা ব্যাখ্যা প্রদান করার ইচ্ছা করছি, আমি কোন স্থানে এ রূপ অর্থ দেখি নাই। যশোহর জেলার কানাইনগর নামক স্থানে রাজা সীতারাম রায়ের নির্মিত মন্দিরের প্রাচীরখোদিত লিপিতে তার স্থাপিত নগরের 'রুচিরা, রুচিহারা' এ বিশেষণ আছে। ইহার অর্থ সৌন্দর্যহরণকারী অর্থাৎ ইহার সাথে সুন্দর বস্তুসমূহের তুলনা করলে ইহার নিকট তাদের কোন সৌন্দর্য থাকে না। আমি যশোহরের অর্থ সম্বন্ধে ঐরূপ কিছু মনে করে থাকি, আমার বিবেচনায় ইহার অর্থ "সর্ব্বাপেক্ষা যশস্বী"।[২৮]

ওয়েষ্টল্যান্ডের এ ব্যাখ্যার সত্যতা প্রমাণের জন্য রাজা সীতারাম রায় প্রতিষ্ঠিত কানাইনগর মন্দির গাত্রের এক ফুট পরিসর বিশিষ্ট কষ্টি পাথরের গোলাকার প্রস্তরে উৎকীর্ণ শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"বাণ–দ্বন্দ্বাঙ্গচান্দ্রৈ ঃ পরিগনিত – শকে কৃষ্ণতোষাভিলাষঃ
শ্রীমদ্বিশ্বসখাসোদ্ভ বকুল কমলোদ্ভাসকো ভানুতুল্যঃ।
ভ্রাজচ্ছিল্পৌঘযুক্তং রুচিররুচি হরেকৃষ্ণগেহং বিচিত্রং
শ্রীসীতারামরায়ো যদুপতি নগরে ভক্তিমানুৎসর্সজ্ঞ"।।[২৯]

বাংলা হরফে লিখিত সংস্কৃত ভাষায় প্রণীত এ শ্লোকটি অনুবাদ করতে গিয়ে সতীশমিত্র লিখেছেন– "বাণ = ৫, দ্বন্দ্ব = ২, অঙ্গ = ৬, চন্দ্র=১, অঙ্কের বিপরীতক্রমে ১৬২৫ শক বা ১৭০৩ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। 'কৃষ্ণতোষাভিলাষঃ' সীতারামেরই বিশেষণ। এ স্থলে শ্রীকৃষ্ণের তুষ্টির জন্য অথবা গুরুদেব কৃষ্ণ বল্লভের তুষ্টির জন্য, এই উভয় অর্থই প্রচ্ছন্ন আছে। সীতারাম রায়ের পূর্ব পুরুষের

উপাধি ছিল 'বিশ্বাসখাস', সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনি জন্মলাভে সেই বংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। শ্লোকটির সরলার্থ এইঃ সূর্যের মত যিনি বিশ্বাস-খাস-কুল-কমলকে প্রস্ফুটিত করিয়াছিলেন, সেই ভক্তিমান শ্রীসীতারাম রায় স্বীয় গুরুদেব কৃষ্ণবল্লভের তুষ্টির নিমিত্ত ১৬২৫ শকে যদুপতি (কানাই) নগরে সমুজ্জ্বল-শিল্পরাজি সমন্বিত সুরুচিসম্পন্ন বিচিত্র হঁরেকৃষ্ণ মন্দির উৎসর্গ করেন।"[৩০]

সীতারাম রায়ের কানাইনগর মন্দিরগাত্রের শিলালিপির সর্ব প্রথম বিকৃত পাঠ আমাদের কাছে পৌঁছে ওয়েষ্টল্যাণ্ডের মাধ্যমে।[৩১] পরবর্তীকালে অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, নিখিল নাথ রায় এবং যদুনাথ সরকারসহ বহু ঐতিহাসিক ওয়েষ্টল্যান্ডকে অনুসরণ করে একই বিকৃত পাঠ গ্রহণ করে এবং ইতিহাসে বহু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। সতীশচন্দ্র মিত্রই সর্ব প্রথম ঐতিহাসিক যিনি শিলালিপি খানা পরিষ্কার করে তৈলাক্ত করে শুদ্ধ পাঠ উদ্ধার করে জনসমক্ষে প্রকাশ করেন।[৩২] উভয় পাঠ পাশাপাশি রেখে পাঠ করলে ওয়েষ্টল্যান্ডের ভুল সহজে ধরা পড়ে। তিনি 'রুচির রুচি হরে' শ্লোকের এ অংশকে যদুপতি নগরের বিশেষণ হিসাবে গ্রহণ করেন এবং 'বহু কষ্ট কল্পনা' করে 'রুচির রুচি হরে' অংশের অর্থ করেছেন 'সৌন্দর্যহরণকারী'। অথচ এটা সকলের জানা যে এ বিগ্রহের জন্য উৎসৃষ্ট গ্রামের নাম হরেকৃষ্ণপুর 'রুচির রুচি' শব্দটি 'হরেকৃষ্ণগেহং' পদের বিশেষণ। এখানে 'রুচি' শব্দ দ্বারা স্থাপত্যে কৌশল বা পদ্ধতির রুচির কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ মন্দিরটি রুচি সম্মত স্থাপত্যে নির্মিত।

উপরের আলোচনা হতে এটা সহজে প্রতীয়মান হয় যে ওয়েষ্টল্যান্ড দেশীয় ভাষা ও শব্দের সঠিক অর্থ অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়ে বিকৃত পাঠ উপস্থাপন করেছেন অথবা যশোহরের জেলা কালেক্টর হিসাবে পাঠ গ্রহণের জন্য এমন লোক প্রেরণ করেছিলেন যিনি সঠিকভাবে পাঠোদ্ধার করতে সক্ষম হননি। দ্বিতীয়তঃ যদি আমরা ধরে নেই যে ওয়েষ্টল্যাণ্ডের পাঠ সঠিক। তাহলে প্রশ্ন আসে যদুপতিনগর বা কানাইনগরের বিশেষণের মাঝে যশোহরের নামকরণের ব্যাখ্যা নিহীত থাকে কি করে? রাজা সীতারাম রায়ের আমলে নিশ্চয় যদুপতিনগর বা কানাইনগর এবং যশোহর সমার্থক ছিল না। তৃতীয়তঃ তিনি 'রুচির রুচি হরে' শব্দের অর্থ করেছেন 'সৌন্দর্য্যহরণকারী' এবং তার উপর ভিত্তি করে তিনি যশোহর নামের ব্যাখ্যা দিয়েছেন 'সর্ব্বাপেক্ষা যশস্বী'। সাধারণ বাঙ্গালী জানেন যে হরেকৃষ্ণ হিন্দু দেবতা বা বিগ্রহের নাম। হরে শব্দের অর্থ করেছেন হরণকারী এবং সেখানে খুঁজে পেয়েছেন যশোহর নামের অর্থ। অবশ্য তিনি নিজেই এ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন বলে দাবী করেছেন। তাই ঐতিহাসিক উৎস বিহীন অতিপাণ্ডিত্যপূর্ণ এ ব্যাখ্যা বিভ্রান্তিকর এবং বিকৃতপাঠের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি যেমন তর্কালঙ্কারের ব্যাখ্যাকে 'কিছু কষ্ট কল্পনা' বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন ঠিক তেমনি সতীশচন্দ্র মিত্রের সাথে আমরাও ওয়েষ্টল্যাণ্ডের ব্যাখ্যাকে 'বহু কষ্ট কল্পনা' বলে বাতিল করতে পারি।[৩৩]

এ বিষয়ে তৃতীয় আলোচক হলেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র নিজেই। তিনি তার প্রণীত যশোহর-খুলনার ইতিহাস, প্রথম খণ্ডে উপক্রমনিকায় 'নামের উৎপত্তি' শিরোণামে একটি উপভাগ লিখেছেন।[৩৪] কিন্তু সেখানে তিনি প্রকৃতপক্ষে নামের উৎপত্তি সম্পর্কে নিজস্ব কোন মতামত প্রদান করেননি। বরং কোন প্রকার সমালোচনা ছাড়াই তর্কালঙ্কার, ওয়েষ্টল্যাণ্ড ও কানিংহামের মতামতগুলো হুবহু বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয়ত, সে উপভাগে তিনি কয়েকটি বাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে যশোহরের প্রাচীনত্ব প্রমাণের প্রাণপণ প্রচেষ্টা করেছেন। তৃতীয়ত, তিনি 'যশোহর' শব্দের বাংলা বানানের একটি নতুন তথ্য প্রদান করেছেন এবং তা হলো - পূর্বে 'যশোহর শব্দের বা নামের বানান ছিল 'যশোর' যার তেমন কোন অর্থ ছিল না। বিক্রমাদিত্যের ভাই কবি বসন্তরায় 'যশোর' শব্দের বানান শুদ্ধ করে 'যশোহর' করে তাকে অর্থবহ করেছেন। তার মতে 'যশোহর' আধুনিক শব্দ এবং যশোর প্রাচীন শব্দ।[৩৫]

মিত্রের প্রদত্ত উপরে উল্লেখিত তথ্যসমূহের পর্যালোচনা অপরিহার্য। প্রথমতঃ মিত্র যশোহর নামের উৎপত্তি সম্পর্কে নিজস্ব মতামত প্রদানে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন অথবা বৃহত্তর যশোহর জেলার স্থায়ী বাসিন্দা এবং বি. এল. কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক যিনি সারা জীবন যশোহরের ইতিহাস গবেষণা করেছেন তিনি দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন এবং আমাদেরকে হতাশ করেছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি যে সকল বাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে যশোহরের প্রাচীনত্ব প্রমাণের অপরিসীম চেষ্টা করেছেন, উক্ত গ্রন্থসমূহ মুসলমানদের বাংলা বিজয়ের পরে প্রণীত।[৩৬] তৃতীয়ত, যশোহরের বাংলা বানান সংক্রান্ত তার প্রদত্ত ব্যাখ্যা কোন স্বীকৃত ঐতিহাসিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং তা লোককাহিনী বা প্রবাদের উপর ভিত্তি করে প্রণীত-যা তিনি নিজে স্বীকার করেছেন।[৩৭]

যশোহর জেলার নামকরণ সম্পর্কিত চতুর্থ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ আলেকজেন্ডার কানিংহাম। তিনি লিখেছেন- 'যশোহর' শব্দটি আরবী ভাষার 'জসর' শব্দের রূপান্তরিত রূপ। আরবী 'জসর' শব্দের বাংলা অর্থ হলো-সেতু বা সাঁকো। সমগ্র যশোহর অঞ্চলে মুসলিম অভিযানের প্রাক্কালে অসংখ্য খাল-বিল-নদ-নদী থাকার কারণে যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য ঐ সকল নদ-নদীর উপর সেতু বা সাঁকোর প্রয়োজন ও ব্যবহার ছিল। অসংখ্য সাঁকো ও সেতুর ব্যবহার থাকার কারণে নবাগত মুসলমানেরা এতদঅঞ্চলকে 'জসর' বলে অভিহিত করে। সেই 'জসর' শব্দ পরিবর্তিত হয়ে জসর → যশর → যশোর → যশোহর হলো।[৩৮] যশোহর জেলার নামকরণ নিয়ে আরও অনেকে আলোচনা করেছেন। তাদের মধ্যে ডব্লিও. ডব্লিও. হান্টার, ওমেলী, হীরালাল ভট্টাচার্য, লতিফুল বারী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তবে তারা নতুন কোন মত বা ব্যাখ্যা প্রদান করেননি। বরং তারা তর্কালঙ্কার, ওয়েষ্টল্যান্ড এবং কানিংহামের মতামতগুলো উদ্ধৃত করে যশোহরের নামকরণ বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাই নিজস্ব মতামত না থাকার কারণে তাদের আলোচনা পুনঃ উপস্থাপন অপ্রয়োজনীয়।

উপরের আলোচনায় আমরা তিনটি ভিন্নধর্মী মতামত পেয়েছি। মতামতগুলোর প্রবক্তা হলেন– তর্কালঙ্কার, ওয়েষ্টল্যান্ড এবং কানিংহাম। তর্কালঙ্কার পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন; ঐতিহাসিক ছিলেন না। তিনি ইতিহাসও লিখেননি। রাজা প্রতাপাদিত্যের জীবন চরিত লিখতে গিয়ে তিনি যশোহরের নামকরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাই তার ব্যাখ্যা ইতিহাস ভিত্তিক না হয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ হয়েছে এবং গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। ওয়েষ্টল্যাণ্ডও ঐতিহাসিক ছিলেন না। তিনিও ইতিহাস রচনা করেননি। তিনি ছিলেন যশোহরের জেলা কালেক্টর এবং ম্যাজিষ্ট্রেট। কলিকাতা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তিনি যশোহর জেলার উপর একটি রিপোর্ট প্রণয়নকালে যশোহরের নামকরণের বিষয়ে একটি মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। যদিও তার প্রণীত রিপোর্টটি খুবই প্রশংসিত হয়েছে, তবুও নামকরণের ক্ষেত্রে তার ব্যাখ্যার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই বলে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। ভারতীয় প্রত্নতত্বের জনক হিসাবে স্বীকৃত ঐতিহাসিক আলেকজেণ্ডার কানিংহাম প্রদত্ত ব্যাখ্যা কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা বিচার–বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। কারণ একজন খ্যাতিমান ও স্বীকৃত প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং ঐতিহাসিক ভিত্তিহীন কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ কেউ তার বক্তব্য নিয়ে এ পর্যন্ত দ্বিমত পোষণ করেননি। তৃতীয়তঃ তর্কালঙ্কারের ব্যাখ্যাকে ওয়েষ্টল্যাণ্ড 'কিছু কষ্ট কল্পনা' এবং ওয়েষ্টল্যাণ্ডের ব্যাখ্যাকে সতীশচন্দ্র মিত্র 'বহু কষ্ট কল্পনা' বলে যেভাবে প্রত্যাখান করেছেন, কানিংহামের ব্যাখ্যাকে সেভাবে কেউ চ্যালেঞ্জ করেনি। তাই আমরা তার ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে যশোহরের ইতিহাস–ভূগোল পর্যালোচনা করে, প্রাচীন মানচিত্রসমূহ পরীক্ষা–নিরীক্ষা করে, মুসলমানদের নামকরণের ধরণ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি।

প্রথমতঃ যশোহরের প্রশাসনিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলার সুলতানী আমলে যশোহর কোন প্রশাসনিক একক ছিল না। হোসেনশাহী আমলে বাংলা ১৩টি আরশায় বিভক্ত ছিল, তখন যশোহর–খুলনা অঞ্চল আরশা খলিফতাবাদ ও ফতেহাবাদের মধ্যে অর্ন্তভূক্ত ছিল। মোগল শাসনের প্রথম দিকে তারা বাংলাকে ১৯টি সরকারে বিভক্ত করে। তখনও যশোহর নামে পৃথক কোন সরকার ছিল না। এ এলাকা তখন সরকার খলিফতাবাদ, মুহাম্মদাবাদ এবং ফতেহাবাদের মধ্যে ছিল। মোগল অনুগত বিক্রমাদিত্য 'যশোর–রাজ্য' প্রতিষ্ঠার পর তার পুত্র প্রতাপাদিত্য বিদ্রোহী হলে মোগলেরা সে রাজ্য দখল করে নেয়। তখন হতে অথবা তার কিছুদিন পর হতে এ এলাকায় একজন ফৌজদার ছিল। মুর্শিদকুলী খানের আমলে প্রশাসনিক পুনঃবিন্যাস হলে বাংলার তেরটি চাকলার মধ্যে একটি হলো যশোহর। প্রশাসনিক ইতিহাসে যশোহর খুব বেশী প্রাচীন নাম নয়, বরং মুসলমানদের আগমনের পরে এ নাম প্রকাশিত হয় এবং মোগল আমলেই প্রশাসনিক একক হিসেবে স্বীকৃতি পায়।[৩৯]

দ্বিতীয়তঃ রাজশাহীতে যেমন পাহাড়পুর, বগুড়াতে যেমন মহাস্থানগড়, কুমিল্লার ময়নামতিতে যেমন শালবন বিহারের মতো প্রাচীন প্রত্নতত্ত্বের সন্ধান ঐ সকল স্থানের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে,

যশোহর অঞ্চলে সেরকম কোন প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায়নি যা ঐ স্থানের প্রাচীনত্বকে প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে প্রমাণ করে।[৪০]

তৃতীয়তঃ ভৌগোলিক ও ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, যশোহর অঞ্চল খুব বেশী পুরাতন নয়।[৪১]

চতুর্থতঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রথম দিকে অংকিত মানচিত্রে যশোহর নামক কোন স্থানের কথা নেই। উদাহরণস্বরূপ- টলেমীর ম্যাপে যশোহর নামক কোন স্থানের অস্তিত্ব নেই।[৪২] শুধু তা নয় ১৬৫২ সনে N. Sauson কর্তৃক অংকিত বাঙ্গালার মানচিত্রে যশোহর নামের উল্লেখ নেই।[৪৩]

পঞ্চমতঃ বাংলার ইতিহাস প্রাচীন যুগের উপর আধুনিক কালে প্রণীত গ্রন্থসমূহে যশোহর নামটি নেই।[৪৪]

ষষ্ঠতঃ ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে মুসলমানেরা সাধারণতঃ তাদের ধর্মীয় ভাষা আরবীতেই ব্যক্তি এবং স্থানের নামকরণ করতো এবং এটাই তাদের ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। পরবর্তীকালে ভারতে কোন কোন ক্ষেত্রে আরবীর সাথে ফার্সীর ব্যবহারও হয়েছে। বাংলায় ইসলাম প্রচারে সূফী-দরবেশদের ভূমিকাই মূখ্য। ব্যক্তি এবং স্থানের নামকরণে তাঁরা সাধারণতঃ আরবীতেই করবে- এটাই স্বাভাবিক। তাই বাংলার মুসলমানদের নামকরণে আরবী ভাষার ব্যবহার একটি ঐতিহ্যগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরবীতে স্থানের নামকরণ কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, তবে সে ক্ষেত্রে স্থানের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য অথবা অন্য কোন প্রধান বৈশিষ্ট্য নামকরণকে প্রভাবিত করতে পারে এবং যশোহরের ক্ষেত্রেও তা হয়েছে।

উল্লেখিত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করে আমরা সহজে বলতে পারি যে যশোহর জেলার নামকরণ প্রাচীন নয়, বরং মধ্যযুগের। মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস হচ্ছে বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস। সারা বিশ্বে মুসলিম উম্মার সাধারণ ভাষা হলো আরবী। তাই যশোহর নামকরণ যে আরবী 'জসর' শব্দ হতে উৎপত্তি হয়েছে বলে কানিংহাম যে ধারণা করেছেন তা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। প্রকাশিত মতামতের মধ্যে কানিংহামের মতামত ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভূগোল, ভূতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, যুক্তি ইত্যাদির দৃষ্টিকোণ হতে অধিকতর গ্রহণযোগ্য। তাই আরবী 'জসর' শব্দ হতে আধুনিক যশোহর জেলার নামের উৎপত্তি হয়েছে বললে সম্ভবত ভুল হবে না।

তথ্য নির্দেশিকা

১। স্থানীয় ইতিহাসের সংজ্ঞার জন্য দেখুন, মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ ছিদ্দিকী, "বাংলাদেশে স্থানীয় ইতিহাসচর্চাঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা", *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, মাঘ-চৈত্র, ১৩৯৫, পৃ. ১১৮।

২। এ প্রসংগে ১৯৮৮-৮৯ সনে ঢাকা হতে প্রকাশিত *সাপ্তাহিক বিক্রম* পত্রিকায় মোমেনশাহী জেলার নামকরণ নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক হয়। একদলের যুক্তিতর্কে উক্ত জেলার নাম মোমেনশাহী এবং অন্যদলের মতে ময়মনসিংহ বা ময়মনসিং। এ বিতর্কে ধর্ম, আবেগ, যুক্তি, বুদ্ধি, আদর্শ সবই জড়িয়ে পড়ে।

৩। এ প্রসংগে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, M. A. Bari, Khalifatabad: *A Study of Its History and Monoments*, Unpublished M. Phil. Thesis, Department of Islamic History & Culture, University of Rajshahi, 1980.

৪। হরিশচন্দ্র তর্কালঙ্কার, *রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত*, (দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতাঃ ভার্নাকুলার লিটারারী সোসাইটি, ১৮৫৬) পৃ. ১৭।

৫। J. Westland, *A Report of the District of Jessore: Its antiquties, Its history and Its commerce*, (Second Edition, Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1874), p.38-41

৬। Abdul Karim, *Mursid Quli Khan and His Times*, (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1963), p.

৭। J. Westland, *Op. cit.*; p. 112.

৮। *Ibid*, p. 221.

৯। আমি ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজে গবেষক ছিলাম। আমার গবেষণার বিষয় ছিল *Socio-economic Development of A Bengal District: A Study of Jessore, 1883-1925*. - ফলে আমাকে যশোহরের বিভিন্ন স্থানে গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ভ্রমণ করতে হয়েছে।

১০। হরিশচন্দ্র তর্কালঙ্কার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭।

১১। Alexander Cuninghum, *Ancient Geography of India* (London: Trubner and Co. 1871), p. 502.

১২। J. Westland, *Op.cit.*; p. 23.

১৩। W. W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, vol. II (London; Trubner and Co., 1877), p. 202-203.

১৪। L. S. S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers.*, Jessore, (Calcutta Bengal Secretariate Press, 1912), p. 26 and p. 147.

১৫। সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর-খুলনার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড* (তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতাঃ শিবশঙ্কর মিত্র, ১৯৬৩), পৃষ্ঠা- ৭-৮

১৬। হীরালাল ভট্টাচার্য, *যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ১মখণ্ড* (কলিকাতাঃ গ্রন্থকার, ১৯১৪), পৃ.৫

১৭। G. M. A. Latiful Bari (ed.) *Bangladesh District Gazetteer's, Jessore* (Dacca : Government Press, 1979), p. I.

১৮। হরিশচন্দ্র তর্কালঙ্কার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭

১৯। ঐ

২০। J. Westland, *Op. cit.* p. 23

২১। W. W. Hunter, *Op. cit.*; 202

২২। Alexander Cunninghum, *Op. cit.*; 502

২৩। L. S. S. O'Malley, *Op.cit.*; p. 26

২৪। সতীশ চন্দ্র মিত্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮

২৫। G. M. A. Latiful Bari, Op. cit. P. I

২৬। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন – রাম রাম বসু, *প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস* (শ্রীরামপুরঃ মিশন প্রেস, ১৮০২); হরিশচন্দ্র তর্কালঙ্কার, *রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত*, (কলিকাতাঃ ভার্নাকুলার লিটারারী সোসাইটি, ১৮৫৬); শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী, *প্রতাপাদিত্যের জীবন চরিত;* (কলিকাতাঃ সংস্কৃত প্রেস ডিপজীটরী, ১৩০৩); শ্রী নিখিল নাথ রায় (সম্পাদিত) *প্রতাপাদিত্য*, (কলিকাতাঃ শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৩১৩) এবং এ ধরনের আরও বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রয়েছে।

২৭। Westland লিখেছেন, "To me this derivation seems somewhat strained". (J. Westland, op.; cit. p. 23)

২৮। "I am inclined to suggest another derivation, which, however, I have nowhere seen ascribed to the name. In the only ancient Hindu inscription which, so far as I know, now exists in the district (that on the tamples at Kanhaynagar, which will be describe in the next chapter) the Raja, Sitaram Ray, applies to his city the epithet ruchira, ruchi, hara, "depriving of beauty that which is beautiful" meaning simply that beautiful things compared with it no longer had any beauty. I think it possible, if not likely, that Yasohara has a similar meaning and application, and is intended merely to express the idea "Supremely glorious." *(Ibid).*

২৯। সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর-খুলনার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড*, (দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতাঃ শিবশঙ্কর মিত্র, ১৯৬৫) পৃ. ৫৭৯।

৩০। ঐ, পৃ. ৫৮০

৩১। J. Westland, *Op.cit.*; pp. 35-36.

৩২। সতীশচন্দ্র মিত্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৭৯

৩৩। ঐ

৩৪। ঐ, *পূর্বোক্ত*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬-৯

৩৫। ঐ. পৃ. ৮

৩৬। সতীশচন্দ্র মিত্র যশোহরের প্রাচীনত্ব প্রমাণের জন্য তিনটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থতিনটি হলো (ক) *দিগ্বিজয় প্রকাশ পুঁথি, (খ) তন্ত্রচূড়ামনি* এবং (গ) *ভবিষ্যপুরান।* দিগ্বিজয় প্রকাশ পুঁথি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন - *"দিগ্বিজয় প্রকাশ* এক বিরাট গ্রন্থ। *বিশ্বকোষ* সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বিখ্যাত লাইব্রেরীতে ইহার হস্তলিখিত পুঁথি রক্ষিত হইয়াছে। ইহা প্রতাপাদিত্যের আবির্ভাব সময়ে বা তাহার প্রাক্কালে কবিরাম নামক এক পণ্ডিত কর্তৃক লিখিত হয়।" (পৃ. ১৩৯) একথা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, দিগ্বিজয় প্রকাশ পুঁথি মোগল আমলে প্রণীত। সুতরাং তন্ত্রচূড়ামনি ও ভবিষ্যপুরান রচনার সঠিক তারিখ অনুসন্ধান করলে হয়তো এটাই প্রমাণিত হবে যে, তাও মুসলিম শাসনামলে প্রণীত।

৩৭। সতীশ চন্দ্র মিত্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯।

৩৮। Alexander Cunningham, *Op. cit;* p. 502.

৩৯। এ প্রসংগে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, Mohammed Mohibullah Siddiquee, *Socio-economic Development of A Bengal District: A Study of Jessore, 1883-1925* unpublish Ph. D. Thesis, Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi, 1889. pp. 19-33.

৪০। আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৪) পৃষ্টা ৩১২-২৪

৪১। এ প্রসংগে জানার জন্য দেখুন সৈয়দ মাযহারুল হক, "বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস ও খনিজ সম্পদ" *বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকা,* বৈশাখ-চৈত্র, ১৩৯৮, ৪৮-৪৯ খণ্ড পৃষ্ঠা-২৩ এবং Harun-or-Rashid, "The Geographical Background to the History and Archaeology of South East Bengal" *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Humn.)* vol. XXIV-VI, 1979-1981, pp. 159-178.

৪২। *Ptolemy's Map of India*, TAB-X.

৪৩। সতীশচন্দ্র মিত্র, *পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড*, পরিশিষ্ট- 'ক' পৃ. ৪৬৫

৪৪। উদাহরণস্বরূপ আমরা নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহের নাম উল্লেখ করতে পারি। R. C. Majumder (ed.) *History of Bengal, vol. I.* (Dacca: University of Dacca, 1948); নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস* (আদিপর্ব), (কলিকাতাঃ লেখক সমবায় সমিতি, ১৩৫৬); রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড,* (কলিকাতাঃ নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৭১)।

রঙ্গপুরে রাজা রামমোহন রায়ের মন্দির ও একটি বিতর্ক

মুহম্মদ মনিরুজ্জামান

মাহিগঞ্জ রঙ্গপুরের প্রাচীন রাজধানী। মুসলিম আমলে এ শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এক বর্ধিষ্ণু জনপদ। মোঘল শাসনামলে এ মাহিগঞ্জ গ্রামখানি একটি শহরের প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে পরিপূর্ণতা লাভ করে। এর পশ্চিম পার্শ্বে সংলগ্ন তামফাট আরেকটি গ্রাম যেখানে আজও মোঘল আমলের বহু প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়।[১] মাহিগঞ্জ দমদমা অবহেলিত বাদশাহী আমলের রাস্তাখানি আজও বহু ঐতিহাসিক অভিযান ও যুদ্ধ বিগ্রহের সাক্ষী। বখতিয়ার খিলিজীর প্রতিষ্ঠিত রঙ্গপুর শহরও গড়ে উঠেছিল মাহিগঞ্জ দমদমাকে কেন্দ্র করে যদিও অনেক ঐতিহাসিক এ অভিমতকে সত্য বলে গ্রহণ করেন না।[২] এ প্রাচীন রাস্তার তামফাট সংলগ্ন মীরগঞ্জ মৌজার উপর একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক মন্দির জীর্ণ দশায় দাঁড়িয়েছিল। ফলক না থাকায় বলা মুশকিল এর নির্মাণ কাল। সবাই জানে রাজা রামমোহন রায় রঙ্গপুরে জেলা কালেক্টরের দেওয়ান হয়ে যখন এখানে আসেন তখন নির্মাণ করেন এ মন্দিরখানি। এ তথ্য সত্যি হলে এ মন্দিরের বয়স দাঁড়ায় একশত আশি–পঁচাশি বছর এবং সেমতেই বিগত বছরগুলিতে এটি রাজা রামমোহন রায়ের মন্দির বলে ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করে আসছিল। এটি একটি শিব মন্দির। বছর দু–তিনেক আগে এ মন্দিরখানি পরিপূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।[৩] এর পার্শ্বে একটি ছোট আয়তনে কালিমন্দির ছিল যা বহুপূর্বেই ধ্বংস হয়েছে বলে জানা যায়। শিব মন্দিরখানি ইদানিংকালে ধ্বংস হয়ে গেলেও সুদীর্ঘকাল তার অস্তিত্ব এখানে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এখানকার বহু স্থানীয় কাগজপত্র, প্রকাশিত পত্র–পত্রিকায় (অখ্যাত) এ মন্দিরকে রামমোহন রায়ের মন্দির বলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি মাহিগঞ্জ তামফাট নিবাসী বহু জীবিত হিন্দু ও মুসলমান বয়স্ক মানুষের মুখে মুখে এ মন্দিরখানি রামমোহন রায়ের মন্দির হিসেবে পরিচিত। প্রকাশিত তথ্যের মাধ্যমে যতই অখ্যাত হোক এবং কিংবদন্তি যতই কাল্পনিক হোক ইতিহাসের উৎস হিসেবে এর গুরুত্ব কম নয়। উপরোক্ত তথ্য ও কিংবদন্তির উপর নির্ভর করে আগামী কোন একদিন হয়ত এ ধ্বংস প্রাপ্ত মন্দিরখানি রাজা রামমোহন রায়ের মন্দির বলে আবার ইতিহাসের পাতায় আসবে।[৪] আমরা এ প্রবন্ধের মাধ্যমে উক্ত মন্দির সহ রামমোহন রায়ের রঙ্গপুরের অবস্থান ও কর্মজীবনের কিছু বিতর্কিত তথ্যের উপর নতুন তথ্য সন্নিবেশিত করতে চাই।

উনবিংশ শতাব্দীর সুচনা কালে রামমোহনের আবির্ভাব বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিশেষভাবে ব্রাহ্মবাদের গোড়াপত্তন, সতীদাহ প্রথা নিবারন, হিন্দু বিধবা বিবাহ প্রচলন এবং ইংরেজী শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে তার অবদান অবর্ণনীয়। যদিও

'বেনিয়া জমিদার' হিসেবে তার প্রতিষ্ঠা লাভ[৫] এবং বৃটিশ শাসনের গোড়া সমর্থক হিসেবে নীল চাষের প্রতি সমর্থন[৬] প্রদান তার ভূমিকাকে বহুলভাবে সমালোচিত করেছে। তার বিপুল কর্মময় জীবনের মাত্র কয়েকটি বছর তিনি কাটিয়ে গেছেন রঙ্গপুরে (১৮০৯ – ১৮১৪)। রামমোহন রায়ের গ্রন্থকারেরা রঙ্গপুরে তার প্রবাস জীবন নিয়ে প্রায় শত বছর পরেও বিশেষ কোন ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেননি। ফলে এখানে তার অবস্থান, জন ডিগবী সাহেবের অধীনে তার কর্মপদ ও বাসস্থান সম্পর্কে সংশয় আজও সম্পূর্ণভাবে অপসারিত হয়নি।

রামমোহন রায় যখন রঙ্গপুরে আসেন তখন রঙ্গপুর শহরের হেড কোয়াটার মাহিগঞ্জ থেকে ৮ কিঃ মিঃ পশ্চিমে ধাপ নওয়াবগঞ্জ (বর্তমান রঙ্গপুর শহর) এলাকায় স্থানান্তরের এক প্রক্রিয়া চলছিল। এ প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৭৮৭ খৃঃ পর থেকে যখন এক ভয়াবহ বন্যায় তিস্তা নদীর গতি পরিবর্তনে মাহিগঞ্জ শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত ঘাঘট নদীর পূর্ব শাখা স্বাভাবিক স্রোতধারা হারিয়ে ক্ষীণকায়ায় রূপান্তরিত হয় এবং অপর দিকে ধাপের পাশ দিয়ে প্রবাহিত ঘাঘট এর পশ্চিম শাখা তেজিভাবে ধারন করে।[৭] নৌ–চলাচলের অসুবিধার দরুন মাহিগঞ্জের গুরুত্ব কমতে শুরু করে এবং জেলার প্রধান শহর হিসেবে তার গুরুত্ব হারাতে থাকে। ১৮০৯ সালে হ্যামিলটন বুকানন সাহেব যখন রঙ্গপুরে আসেন ভ্রমনে তখন মাহিগঞ্জ ছিল বিশ হাজার জনঅধ্যুষিত একটি শহর যদিও এর চাকচিক্য ও রাস্তাঘাট তত ভাল ছিল না এবং সার্বিক সৌন্দর্যে দিনাজপুর শহরের চেয়ে নিম্ন মানের ছিল।[৮] যাহোক এমতাবস্থায় কোম্পানীর অফিস ফ্যাক্টরীসহ আস্তে আস্তে সমগ্র স্থাপনা (estabalishment) ঘাঘটে'র পশ্চিম শাখা (ধাপের) কাছে স্থানান্তরিত হতে শুরু করে। ধারণা করা হয় রঙ্গপুর জেলা কালেক্টর ডি. এইচ, ম্যাকডাওয়ালের (১৭৮৬–১৭৮৯), সময় থেকে এ স্থানান্তরের কাজ শুরু হয়।[৯] কারণ পরবর্তী জেলা কালেক্টর মিঃ ল্যামসড্যান (১৭৮৯–৯৪) সাহেবকে তার ধাপ আবাসস্থল থেকে কার্য পরিচালনা করতে দেখা যায় এবং জেলার তিনটি আদালতের (যথা দেওয়ানী, ফৌজদারী ও নায়েব নাজিম আদালত) মধ্যে একটি ফৌজদারী কোর্ট ইতিমধ্যে ধাপের নূতন স্থানে কাজ শুরু করেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[১০] অবশ্য ধাপে সরকারী বসতি শুরু হলেও বেসরকারী বসতি শুরু হতে আরও বহুকাল লেগেছিল।

রামমোহন রায়ের রঙ্গপুর অবস্থান সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তির মূলে হচ্ছে ১৮০৯ সাল থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত তার কর্মজীবনের সঠিক তথ্য লিপিবিদ্ধ না হওয়ার কারণে। প্রকৃতপক্ষে কোন গ্রন্থই তার জীবনের উক্ত সময়টুকুর উপর সঠিক তথ্য আজও দিতে পারেনি। ১৭৭৪ খৃঃ জন্ম গ্রহণ করার পর সুদীর্ঘ ২৫ বছর কেটে যায় বিদ্যাচর্চা ও বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার কাজে।[১১] অতঃপর ১৮০১ সালে তিনি কলিকাতায় আসেন এবং দু'বছর সেখানে অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি কলিকাতায় অর্থউপার্জন ও নানা ধরণের মহাজনী ব্যবসা ও ইংরেজ কর্মচারীদের টাকা কর্জ দেয়ার বাণিজ্য করতেন।[১২] ১৮০১ সালে কলিকাতাতেই জন ডিগবীর সাথে তার পরিচয় ঘটে। জন ডিগবী ১৮০০ সালে কলিকাতায় আগমন করে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে দেশী ভাষায় তখন

শিক্ষানবিসি করছিলেন। ১৮০৩ সালে তিনি বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন।[১৩] এরপর তিনি ১৮০৩ মার্চ থেকে ১৮০৫ সাল পর্যন্ত ইংরেজ কালেক্টর উডফোর্ড সাহেবের সাথে ঢাকা জালালপুর (ফরিদপুর) ও মুর্শিদাবাদে চাকুরী করেন।[১৪] অতঃপর ১৮০৫ সাল থেকে ১৮০৯ সাল পর্যন্ত রামগড় ও ভাগলপুরে চাকুরী করেন, অধিকাংশের মতে দেওয়ান হিসেবে। অথচ ১৮০৯ সালের ১লা জানুয়ারী ভাগলপুর অবস্থানকালে পালকী থেকে নেমে সেখানকার কালেক্টর মিঃ ফ্রেডারিক হ্যামিলটনকে সেলাম না করার দায়ে তাকে অপমান ও বেত্রাঘাত করারও তথ্য পাওয়া যায়।[১৫] এরপর তিনি রঙ্গপুরে ডিগবী সাহেবের অধীনে ১৮০৯ – ১৪ পর্যন্ত দেওয়ান পদে বহাল ছিলেন বলে বহু গ্রন্থ অভিমত প্রকাশ করেছে। তৎকালিন সময়ে দেওয়ান পদে নিয়োগ লাভের জন্য স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির সুপারিশ কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল বলে অনুমান করা হয় এবং রামমোহনের দেওয়ান পদে নিয়োগ লাভের ব্যাপারে মির্জা মোহাম্মদ তকীর পুত্র মির্জা মোহাম্মদ আব্বাস আলী জামিনদারও হয়েছিলেন।[১৬] মির্জা মোঃ তকী রংপুরের অন্তগর্ত কুলাঘাটের (বর্তমান লালমনিরহাট জেলাধীন) জমিদার ছিলেন বলে জানা যায়।[১৭] এতদসত্বেও রামমোহন স্থায়ীভাবে দেওয়ান হিসেবে নিযুক্তি পেতে ব্যর্থ হন। ফোর্ট উইলিয়াম বাংলার বোর্ড অব রেভিনিউয়ের সচিবকে লেখা জন ডিগবীর নিম্নলিখিত তিনখানা পত্রও[১৮] রামমোহনের দেওয়ান পদে নিয়োগ লাভকে সমর্থন করে না।

১ম পত্র

"আপনার গত মাসের ২৩ (নভেম্বর) তারিখে পত্রের নির্দেশমত এই অফিসের দেওয়ান গোলামশা'র ..... পদে আমি রামমোহন রায়কে নিযুক্ত করিয়াছি। রামমোহন অতি সম্ভ্রান্ত বংশ জাত, বিশেষ সুশিক্ষিত এবং দেওয়ানের কার্য পরিচালনা করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তাহাকে বহুকাল ধরিয়া জানি সেই হেতু আমি মনে করি তিনি সাধুতা, যোগ্যতা ও পরিশ্রম সহকারে দেওয়ানের কার্য্য চালাইতে পারিবেন।....

জন্ ডিগবী রঙ্গপুর জেলা কালেক্টর
৫ই ডিসেম্বর, ১৮০৯।

২য় পত্র

"আমি যে লোকটির নাম প্রস্তাব করিয়াছি তাহার চরিত্র ও গুণাগুণ সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের কাজী–উল কুজাৎ, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ফার্সীর প্রধান মুনসী এবং সকল বিভাগের অপরাপর প্রধান কর্মচারীদের নিকট খোঁজ খবর লইবার জন্য বোর্ডকে অনুরোধ করিতেছি।"

জন ডিগবী, রঙ্গপুর জেলা কালেক্টর
৩১শে ডিসেম্বর, ১৮০৯।

জন ডিগবীর বহু অনুরোধ সত্বেও বাংলা সরকারের বোর্ড অব রেভিনিউয়ের অস্থায়ী সভাপতি ও প্রাক্তন সচিব মিঃ বি ক্রীপস রামমোহনের দেওয়ান পদে নিয়োগ দানকে নাকচ করে দিলে জন ডিগবী সাহেব নিম্নলিখিত পত্রখানা লিখেন।

৩য় পত্র

"বোর্ডের অবগতির জন্য আপনাকে জানাইতেছি যে, অদ্য আমি মুনশী হেদায়েত উল্লাহকে আপাততঃভাবে এ অফিসের অস্থায়ী দেওয়ানের পদে মনোনীত করিয়াছি।

জন ডিগবী, রঙ্গপুর জেলা কালেক্টর
২৮শে মার্চ, ১৮১১।

"বোর্ড হেদায়েত উল্লাহকে দেওয়ান পদে পাকা নিয়োগ দান করেন ১৯শে এপ্রিল, ১৮১১।[১৯] এরপর রামমোহনের রঙ্গপুরে ১৮১৪ সালের শেষাবধি পর্যন্ত অবস্থান নিয়েও মতবিরোধ রয়েছে। নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে তিনি ১৭৩৪ শকে (১৮১২ খৃঃ) রঙ্গপুরের চাকুরী ছেড়ে কলিকাতায় চলে যান।[২০] কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বলেছেন ১৮১৪ সালের শেষাবধি ডিগবী সাহেব রঙ্গপুর ত্যাগ করলে তিনিও রঙ্গপুর পরিত্যাগ করে কলিকাতায় নুতন জীবন শুরু করেন।[২১] অধিকাংশ লেখকই অবশ্য ব্রজেন্দ্রনাথের এ মতকে সমর্থন করেছেন। তবে কোচবিহারের ইতিহাস লেখক খান চৌধুরী আমানত উল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে ১৮১৩ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে জন ডিগবী সাহেব বৃটিশ পলিটিক্যাল অফিসার হিসেবে[২২] ভুটান রাজত্ব কোচবিহারের মধ্যে উদ্ভুত ভুটান দুয়ার[২৩] বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে যখন কোচবিহারে আসেন তখন রামমোহন রায় ডিগবীর দেওঁয়ান হিসেবে তার সাথে ছিলেন বলে কোচবিহারের উপর ১৮২৩ সালে লিখিত মুনশী জয়নাথ ঘোষের 'রাজ্যোপখ্যান' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।[২৪] রামমোহন রায় যে ১৮১৪ সালের শেষ পর্যন্ত জন ডিগবীর সাথে রঙ্গপুরে ছিলেন। রাজ্যোপখ্যানের বক্তব্যে তার সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তিনি আবার নুতনভাবে দেওয়ানী পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন। আসলে দেওয়ান পদে নিয়োগ সরকারীভাবে না পেলেও উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের কোন বিচ্ছেদ ঘটেনি। সরকারীভাবে দেওয়ানের নিযুক্তি না পাওয়া সত্বেও ডিগবীর সাথে অফিসিয়াল পদ মর্যাদার একটি ভিন্ন দেশ[২৫] ভ্রমন জন ডিগরীর সাথে তার সম্পর্কের গভীরতা প্রমাণিত হয়। আর উভয়ের মধ্যে এ ধরনের গভীর সম্পর্ক ও একান্ত মেলামেশাকে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে লেখক ও গবেষকরা রঙ্গপুরে তার অবস্থানকে নিয়ে কোন বিতর্কে যেতে চাননি।

আসলে রামমোহনের বিরাট ব্যক্তিত্ব এবং সমাজ সংস্কারক হিসেবে তার প্রতিষ্ঠা লাভ গবেষক ও লেখকদেরকে তার সম্পর্কে আসল সত্য লিখতে কিছুটা দ্বিধান্বিত করেছিল। উদাহরণ স্বরূপ আমরা খ্যাতনামা গবেষক সৈয়দ মর্তুজা আলীর অভিমতের কথা বলতে পারি যিনি ১৮০৯–১৪

সাল পর্যন্ত রামমোহনকে ডিগবীর (রংপুর) দেওয়ান বলে অভিহিত করেছেন।[২৬] সবচেয়ে মারাত্মক বিভ্রান্তকর মন্তব্য করেছেন বিশ্বকোষের প্রণেতা শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু, রামমোহনের রঙ্গপুরে দেওয়ান পদ লাভের ব্যাপারে। তিনি বলেছেন, 'রঙ্গপুরের কালেক্টর জন ডিগবী সাহেবের অধীনে তিনি কেরানী পদের প্রার্থী হন। সাহেব তাকে নিয়োগ দানের অঙ্গীকার করিলে তিনি সাহেবের সাথে এক চুক্তিনামা করেন, যখন তিনি কার্যের জন্য তাহার সম্মুখে আসিবেন তখন তাহাকে আসন দিতে হইবে এবং সামান্য আমলার ন্যায় তাহার প্রতি সে প্রকার হুকুমজারী করা হইবে না। পরে তাহার দক্ষতায় দেওয়ান পদ লাভ করেন।[২৭] তিনিও ভাগলপুর ও রামগড়ের জেলা দেওয়ান হিসেবে রামমোহনের কার্য পরিচালনার কথা বলেছেন।[২৮] রঙ্গপুরে ডিগবী সাহেবের দেওয়ান পদে অভিষিক্ত হবার ব্যাপারে আরও মারাত্মক মন্তব্য এসেছে ১৮৪২ সালে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকা থেকে। সেখানে বলা হয়েছে, রামমোহন রায় আর্থিক বিষয়ের নুন্যতাবশতঃ রাজকর্মের অন্বেষণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং রঙ্গপুরের কালেক্টর জন ডিগবী সাহেবের কর্মাগারে প্রবেশ পূর্বক অবিলম্বে তত্রস্থ দেওয়ানী পদ ধারন করিয়াছিলেন .....ডিগবী সাহেব এ প্রকার অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন যে রামমোহন হিন্দু কর্মচারীর রীত্যনুসারে কালেক্টরের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিবেন না এবং কোন আজ্ঞার দাস হইবেন না।[২৯] এ সম্পর্কে খ্যাতনামা গবেষক শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ১৩৩৬ সালের শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসী পত্রিকায় সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করে বলেছেন যে রামমোহন রায় চাকুরী উপলক্ষে রঙ্গপুরে অবস্থান করেছিলেন তবে কখনই দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না।[৩০]

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের এ অভিমত ইতিহাস সম্মত হলেও অনেক খ্যাতনামা গবেষক ও লেখক তা গ্রহণ করেননি। আসলে রামমোহন রায়ের চাকুরী জীবনের (১৮০৩–১৮০৯ ও ১৮০৯–১৮১৪) দশ বারটি বছর আমাদের কাছে আজও রহস্যময় রয়ে গেছে। ঢাকা, জালালপুর, মুর্শিদাবাদ, রামগড়, ভাগলপুর প্রায় সবখানেই তিনি চাকুরী করেছেন তবে সঠিক পদের বিবরণ পাওয়া যায় না। যদিও কোথাও কিছুটা পাওয়া যায় তাও ইতিহাস সম্মত নয়। যাহোক রঙ্গপুরে সুদীর্ঘ ৫ বছর ডিগবীর কথিত দেওয়ান হিসেবে তার অবস্থান এক রহস্যময় অজানা ইতিহাসের সন্ধান দেয়।

রামমোহন রায়ের আগমন বা বিদায় রঙ্গপুরের জনগণের নিকট আর দু' চারজন দেওয়ানের মতই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বের ছায়া রেখা যখন রঙ্গপুরের মানুষের মনে উঁকি দিল তখন প্রায় এক শতাব্দী শেষ হয়ে গেছে। শুরু হলো রঙ্গপুরের মাটিতে তার কর্মজীবনের ৫টি বছরকে খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা। তার এ স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের কর্মকর্তারা এগিয়ে এলেন। তার রঙ্গপুরস্থ বাসস্থান ঠিক স্থলে নির্ণয়ে ৬ সদস্য বিশিষ্ট 'রামমোহন স্মৃতি রক্ষা পরিষদ' গঠন করা হলো ১৩১৯ বঙ্গাব্দের প্রথম দিকে এবং উক্ত

স্থান নির্ণয় পূর্বক স্মৃতি ফলক স্থাপনের জন্য নগদ ১৬ টাকা চাঁদা হিসেবে আদায় হয় এবং[৩০] টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করা হয়।[৩১] উক্ত স্মৃতি রক্ষা পরিষদের সদস্যরা হলেনঃ

১। মিঃ কিরণ চন্দ্র দে, আই, সি, এস[৩২]
২। মিঃ অবনীচন্দ্র চট্টোপধ্যায়, বিএ[৩৩]
৩। অন্নদা প্রসাদ সেন[৩৪]
৪। নরেন্দ্র নিয়োগী[৩৫]
৫। ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী[৩৬]
৬। সৈয়দ আবুল ফাতাহ[৩৭]

স্মৃতি তহবিলে দানের তালিকা ও ব্যক্তিবর্গের নামঃ

১। শ্রীযুক্ত যাদব চন্দ্র দাস, তুষভাণ্ডার[৩৮]	- ১/০০
২। কামাখ্যা বন্দোপধ্যায়, গীতালদহ, কোচবিহার	- ১/০০
৩। বেনী মাধব মুখোপধ্যায়, জমিদার ভুতছাড়া	- ৫/০০
৪। জগদীশচন্দ্র মুস্তোফী	- ১/০০
৫। সর্বেশ্বর চক্রবর্তী, যদুলস্কর, কাকিনা	- ১/০০
৬। সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, উকিল নীলফামারী	- ২/০০
৭। কুমার জগদীন্দ্র দেব, রায়কত, জলপাইগুড়ি	- ১/০০
৮। কুজবিহারী হার, রঙ্গপুর	- ১/০০
৯। কুমুদনাথ চৌধুরী, কুঠিবাড়ী, বগুড়া	- ২/০০
১০। ব্রজেন্দ্রনাথ রায়	- ১/০০
	১৬/০০

প্রতিশ্রুতি দানের ব্যক্তিবর্গের তালিকাঃ

১। মিঃ কিরণ চন্দ্র দে, আই, সি এস	- ৫/০০
২। এ, এফ, এম আবদুল আলী[৩৯]	- ১৫/০০
৩। রায় শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জি বাহাদুর[৪০]	- ৫/০০
৪। শ্রমতি প্রমদা দেবী[৪১]	- ৫/০০
	৩০/০০

উক্ত স্মৃতি রক্ষা পরিষদ গঠনের পর রাজা রামমোহনের বাসস্থানের সঠিক স্থান নির্ণয় করা হয়। "মাহিগঞ্জে বৃক্ষলতা সমাচ্ছাদিত পিক কুহরিত একটি নির্জন স্থানে রামমোহনের প্রিয় নিকেতন বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছিল।[৪২] স্মৃতি পরিষদ গঠনের মাধ্যমে সঠিক বাসস্থান নির্ণয়ের স্থান অনুসন্ধান এবং তদস্থলে মর্মর ফলক স্থাপনের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হয় যে, সেখানে তিনি

এমন কিছু নির্মাণ করে যাননি যার মাধ্যমে তার বাসস্থানের সঠিক অবস্থান অতি সহজে খুঁজে পাওয়া যায়, মন্দির নির্মাণ তো দুরের কথা। রামমোহন রায়ের মন্দির বলে কথিত শিব মন্দিরখানি যে রাজা রামমোহনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয় এবং মর্মর ফলক স্থাপনের পর মন্দিরখানি প্রতিষ্ঠিত তা বলাই বাহুল্য। এ শতাব্দীর প্রথম দশকে জে, এ ভাস সাহেবের রচিত "রংপুর ডিষ্ট্রিক গেজেটিয়ারে" মাহিগঞ্জ তামফাট মীরগঞ্জ এলাকায় যে কয়টি মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায় সেখানে রামমোহনের মন্দিরের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। অবশ্য তামফাটে তার বাসস্থান ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪৩] মাহিগঞ্জ দমদমা রাস্তার মাঝে তৎকালিন সময়ে আরেকটি মন্দিরের (জগন্নাথ মন্দির) উল্লেখ পাওয়া যায় নির্মাতা হচ্ছেন রঙ্গলাল মহাশয় যিনি প্রায় রামমোহনের সমকালিন সময়ে রঙ্গপুরের জেলা কালেক্টরের নাজির ছিলেন।[৪৪] যাহোক আজ পর্যন্ত কোন রেকর্ড বা তথ্য রামমোহন রায়ের কোন মন্দিরের কথা উল্লেখ করেনি।

রামমোহন রঙ্গপুরে যখন অবস্থান করছিলেন সে সময়ের বহু আগেই তিনি হিন্দু সনাতন ধর্মে-ভাবধারার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ শুরু করেন। নিজ ধর্মের প্রতি এ মনোভাবের ফলে মাত্র ষোল বৎসর বয়সে পরম ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সাথে তার অর্ন্তঃদ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং তাদের সাথে অবস্থান বিচ্ছিন্ন করার অভিপ্রায়ে বৌদ্ধ ধর্মের সাহচর্য লাভে তিব্বত গমন করেন (১৭৯০-৯৩)।[৪৫] এমনকি ১৮০৩ সালে পিতা রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর আগে পিতা পুত্রের মধ্যে ধর্ম বিরোধ রামকান্তের মনোপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়য়।[৪৬] রঙ্গপুরে আগমনের বহু পূর্বেই পৌত্তলিক বিরোধী মনোভাব তার ধর্মীয় দর্শনকে আচ্ছাদিত করে ফেলে। অতএব রঙ্গপুরে অবলম্বনকালে তার দ্বারা কোন মন্দির নির্মাণ কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

এখানে উল্লেখ্য যে শতবর্ষ পূর্বে রামমোহন স্মৃতি রক্ষা পরিষদ গঠনের মাধ্যমে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের শ্রদ্ধাভাজন কর্মকর্তাবৃন্দ সে মহিষীর আবাসস্থলের নির্দিষ্ট ঠিকানা নির্ণয়ে যে স্মৃতি ফলক স্থাপন করেছিলেন তা মন্দির বিলুপ্তির বহুপূর্বেই হারিয়ে গেছে। ফলে মন্দিরখানিই এতদিন স্মৃতিরক্ষা ফলক হিসেবে ভূমিকা পালন করে আসছিল রামমোহন রায়ের বাসস্থানের নির্দিষ্ট ঠিকানার। এমতাবস্থায় রঙ্গপুরে রামমোহনের অবস্থানের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য তার আবাসস্থলে একটি স্থায়ী সৌধ নির্মাণ আজ বিশেষ প্রয়োজন। আরও প্রয়োজন স্মৃতিফলক স্থাপনের পরবর্তী সময়ে কখন কিভাবে উক্ত শিব মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল তার প্রকৃত তথ্য উদঘাটন করা।

তথ্য নির্দেশিকা

১। জে, এ, ভাস, *রংপুর ডিষ্ট্রিক গেজেটিয়ার,* (এলাহাবাদ, ১৯১১) পৃঃ ১৪৮–১৪৯।

২। তদেব, পৃঃ ২৪।

৩। এ শিব মন্দিরের একখানা ফটো প্রবন্ধ লেখক নিজ এলবামে তুলে রেখেছেন ১৯৮৬ সালে।

৪। তামফাট ইউনিয়ন অফিস খানি রামমোহন রায়ের বাসস্থান বলে পরিচিত। ইউনিয়ন অফিস প্রাঙ্গনে মন্দির খানি অবস্থিত ছিল। প্রাচীন ইটের নির্মিত বাড়ীর দেয়ালের ধ্বংসাবশেষ আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন। এখান থেকে নগর মীরগঞ্জ (প্রাচীন জেলা অফিস প্রাঙ্গন) প্রায় অর্ধমাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

৫। নীলমনি মুখার্জি, *এ বেঙ্গল জমিনদার, জয়কৃষ্ণমুখার্জি অব উত্তর পাড়া এন্ড হিজ টাইমস* ১৮০৮–১৮৮৮ (কলিকাতা, ১৯৭৫), পৃঃ ৫৫।

৬। সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম (কলিকাতা* ১৯৮০) পৃঃ ৮, ভূমিকা।

৭। জে, এ ভাস, পৃঃ ১৪৬–১৪৭।

৮। মন্টোগোমারী মার্টিন, *ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া, ৫ম খণ্ড, দিল্লী,* ১৯৭৬) পৃঃ ৪২২–৪২৩

৯। ই, জি, গ্লেজিয়ার, *এ রিপোর্ট অন দি ডিষ্ট্রিক অব রংপুর,* ১ম খণ্ড (কলিকাতা, ১৮৭৩) পৃঃ ৪৬

১০। তদেব,

১১। নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, *উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার কৃষক সমাজ ও রামমোহন রায়,* (সমতট প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০), পৃঃ ১০৭–১০৮।

১২। রাধারমন মিত্র, *বাংলার তিন মহিষী* (কলিকাতা, ১৯৮২), পৃঃ ১।

১৩। ডঃ নাদিগ কৃষ্ণমূর্তি, ইণ্ডিয়ান জার্নালিজম, পৃঃ ৪৩, দেখুন, মোতাহার হোসেন সুফী, *সাংবাদিক অগ্রণী মহমুদ হোসেন* (রংপুর, সাহিত্য প্রকাশনী ১৯৮৬), পৃঃ ১৪।

১৪। কোন পদে চাকুরী করেন তা নিয়ে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। অনেকের মতে দেওয়ান, অনেকের মতে সাধারণ কর্মচারী হিসেবে।

১৫। গভর্ণর জেনারেল লর্ড মিন্টুর কাছে আরজীতে রামমোহন বিস্তারিত তার নাজেহালের কথা ব্যক্ত করেছেন, দ্রষ্টব্য আর. সি. মজুমদার (সম্পা), পৃঃ ৩৪০, দেখুন সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা ও সামাজিক সমস্যা,* ২য় সং (ঢাকা, ১৯৮১), পৃঃ ১৮২।

১৬। খান চৌধুরী আমালত উল্লাহ, কোচবিহারের ইতিহাস ১ম খন্ড (কোচবিহার, ১৯৩৬) পৃঃ ৩২৮–২৯।

১৭। তদেব, পৃঃ ৩২৮।

১৮। মোতাহার হোসেন সুফী, *সাংবাদিক অগ্রণী মহমুদ হোসেন* পৃঃ ১৬।

১৯। তদেব, পৃঃ ১৭।

২০। নগেন্দ্রনাথ বসু, *বিশ্বকোষ, ষোড়শ ভাগ (কলিকাতা,* ১৩১২), পৃঃ ৫০০।

২১। রঙ্গপুরে রামমোহন রায়, শ্রী ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়, প্রবাসী শ্রাবণ, কলিকাতা, ১৩৩৬, দেখুন সুফী মোতাহার হোসেন পৃঃ ১৭।

২২। কোচবিহারের ইতিহাস, পৃঃ ৫৫৫।

২৩। ভুটান পর্বত হতে সমতল ভূমিতে আসার জন্য ভুটান ও কোচবিহার মধ্যবর্তী গিরিপথ সমূহকে ভুটান দুয়ারস (Bhutan Duars) বলা হয়। ইহা ওয়েষ্টার্ন ডুয়ারস্ নামেও খ্যাত। দেখুন, জন, এফ *গ্রানিং জলপাইগুড়ি ডিষ্ট্রিক গেজেটিয়ার,* এলাহাবাদ, ১৯১১), পৃঃ ১-২

২৪। কোচবিহারের ইতিহাস, পৃঃ ৩৫৫।

২৫। ১৭৭৩ খৃঃ কোচবিহার সন্ধিচুক্তিতে কোচবিহার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধীনে এলেও আশ্রিত রাজ্যের মর্যাদা দেয়া হয়।

২৬। উত্তরবঙ্গের সাহিত্যিক, সৈয়দ মর্তুজা আলী, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা* দ্বিতীয় বর্ষ; প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৬৫ দেখুন, মোতাহার হোসেন সুফী, পৃঃ ১৭।

২৭। নগেন্দ্রনাথ বসু, *বিশ্বকোষ ষোড়শ ভাগ* (কলিকাতা, ১৩১২)পৃঃ ৫০০-৫০২

২৮। তদেব।

২৯। বিদ্যাদর্শন পত্রিকা, ১৭৬৪ শক, ৩ সংখ্যা *বিনয় ঘোষ সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ মিত্র*-৩, (কলিকাতা ১৯৮০) পৃঃ ৯ থেকে গৃহীত।

৩০। মোতাহার হোসেন সুফী, পৃঃ ১৫।

৩১। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের ৮ম সাম্বৎসরিক কার্য বিবরণী ভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী সম্পাদিত *রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৭ম ভাগ (রঙ্গপুর ১৩১৯ বঙ্গাব্দ)* পৃঃ ৯-১০।

৩২। রঙ্গপুরের জেলা কালেক্টর ও সভাপতি রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ ১৯১২-১৪।

৩৩। রঙ্গপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ১৯১২ সালের দিকে ইনি রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের বিভিন্ন সাহিত্য কর্মের সাথে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন।

৩৪। জমিদার রাধাবল্লভ রঙ্গপুর এবং রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

৩৫। সুপারিনটেনডেন্ট কোচবিহার এষ্টেট।

৩৬। রঙ্গপুর নল ডাঙ্গার জমিদার ও রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার সম্পাদক (১৩২০-২৫)।

৩৭। জমিদার মুন্সিপাড়া ও স্মৃতি কমিটির সম্পাদক।

৩৮। ইনি লালমনিরহাট জেলার তুষভাণ্ডারের খ্যাতনামা কবি (১৮৮৫-১৯৩১) শান্তি কনা ও কর্মবীর কাব্যসহ ইনি প্রায় ১০ খানা গ্রন্থের রচয়িতা।

৩৯। ইনি রঙ্গপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের একজন সক্রিয় কর্মী।

৪০। রঙ্গপুর ডিষ্ট্রিক বোর্ড ও রঙ্গপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং বিশিষ্ট উকিল।

৪১। জমীদারনী তবে কোন এষ্টেটের তার তথ্য নেই।

৪২। উত্তর বঙ্গের সাহিত্যিক, সৈয়দ মতুর্জা আলী, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা,* ২য় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৬৫।

৪৩। জে, এ, ভাস পৃঃ ১৪৭, ১৪৮।

৪৪। তদেব, পৃঃ ১৪৮।

৪৫। বিদ্যাদর্শন পত্রিকা, ১৭৬৪ শক, সংখ্যা ৩, বিনয়ঘোষ, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র ৩. পৃঃ ৮২৯।

৪৬। তদেব, পৃঃ ৯।

১৯৪৭ সালে ভারত বনাম পাকিস্তান প্রশ্নে সিলেটে গণভোট ও র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ

সফর আলী আকন্দ

সারসংক্ষেপঃ

পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অন্তিম ও চরম সমস্যাসংকুল দিনগুলোতে সিলেটে গণভোট অনুষ্ঠান এবং স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের সভাপতিত্বে বেঙ্গল বাউন্ডারি কমিশনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমস্যা, বিতর্ক ও পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি পর্যালোচনামূলক বিবরণ উপস্থাপন করাই এই প্রবন্ধের লক্ষ্য। অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ আসাম প্রদেশাধীন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সিলেট জেলা ভারতের অংশ হিসেবে থেকে যাবে, না প্রস্তাবিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চল পূর্ব বাংলার সংগে যুক্ত হবে-তা নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে সিলেটে গণভোট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বর্তমান প্রবন্ধে গণভোটের বিষয়টি সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচনায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে (১) সিলেটে গণভোটের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ; (২) বাউন্ডারি কমিশন গঠন ও কমিশনের বিচার্য বিষয়, (৩) গণভোটের বিধিগত আনুষ্ঠানিকতা ও আইনগত কাঠামো প্রক্রিয়াকরণ; (৪) বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত; (৫) গণভোটকালীন নির্বাচনী প্রচারণা, গণভোটের পূর্বে ও পরবর্তী সময়ে লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের এবং তৎসহ সংবাদ পত্রসমূহের ভূমিকা এবং (৬) গণভোটের ফলাফল বাস্তবায়ন প্রসঙ্গ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সিলেটে অনুষ্ঠিত গণভোটের সকল দিকের উপর আলোকপাত করে বাংলায় একটি পূর্ণাঙ্গ রচনা উপস্থাপনের এটিই প্রথম প্রয়াস। বেঙ্গল ও আসাম সেক্রেটারিয়েট ফাইল, মাউন্টব্যাটেন পেপার্স, সরকারী প্রকাশনা, সমসাময়িক বিশ্লেষণ ও সংবাদ পত্র সমূহের ভিত্তিতে এই প্রবন্ধ রচিত হয়েছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

যদিও উপমহাদেশের স্বাধীনতাই ছিলো ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫) এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগের (১৯০৬) চূড়ান্ত লক্ষ্য, তথাপি ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দুই দশকে ভারতের জন্য দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র উদ্ভাবনের নানাবিধ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ, মুসলিম লীগ লাহোর সম্মেলনে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে তাদের লক্ষ্য পুনঃনির্ধারণ করে ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা ও আসামকে নিয়ে মুসলমানদের একটি পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম শুরু করার প্রস্তব গ্রহণ করে-যা পরবর্তীকালে পাকিস্তান প্রস্তাব নামে খ্যাত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে (১৯৩৯-৪৫) মিত্রপক্ষীয় রণ কৌশলে ভারতের গুরুত্ব এবং ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তার স্বাধীনতা লাভের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। যুদ্ধ শেষে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলি (১৯৪৫-৫১) ভারতের শাসনতান্ত্রিক

সংকট মোকাবেলার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং প্রয়োজন হলে ভারত বিভাগেরও ইঙ্গিত দেন। তদনুযায়ী ক্যাবিনেট মিশন (১৯৪৬) ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সূত্র বের করার কাজে নিয়োজিত হয়। কিন্তু শাসনতান্ত্রিক চুক্তির ক্ষেত্রে কংগ্রেস ও লীগ পরস্পর ঐক্যমতে পৌঁছুতে ব্যর্থ হলে ১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৮ সালের জুনের মধ্যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনাবসানের দৃঢ় প্রতিশ্রুতির কথা ঘোষণা করে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের শেষ ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত করে এবং তার উপর ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের পদ্ধতি তৈরীর পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করে। লর্ড মাউন্টব্যাটেন (১৯০০–১৯৭৯) এসে প্রচণ্ড সমস্যার সম্মুখীন হন এবং তিনি ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সংগে শক্ত দরকষাকষি ও অবাধ কূটনীতিক দৌত্য (Open diplomacy) চালিয়ে যে উপসংহারে পৌঁছান, তাহলো, ভারত এবং সেই সাথে বাংলা ও পাঞ্জাব (এবং আসামও) ভাগই ভারত সমস্যার একমাত্র সমাধান। এই পটভূমিতেই লর্ড মাউন্টব্যাটেন একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং তা কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সমর্থনক্রমে মহামান্য ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ১৯৪৭ সালের ৩ জুন তারিখে একটি বিবৃতির আকারে ঘোষণা করা হয়। পরিকল্পনায় ভারতকে, ভারত ও পাকিস্তান–দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রে ভাগ করার আইনগত কাঠামোর ব্যবস্থাসহ বাংলা, পাঞ্জাব এবং আসাম ভাগের সুস্পষ্ট বিধান রাখা হয়।[১]

সিলেট জেলা এবং তৎসংলগ্ন কাছাড় জেলা ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত বাংলার অংশ ছিলো। পরবর্তী আদমশুমারির অব্যবহিত আগে জেলা দু'টিকে সেখানকার জনসাধারণের প্রবল প্রতিবাদের মুখে চীফ কমিশনার শাসিত আসাম প্রদেশের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। সিলেট ও কাছাড়বাসীরা তাদের ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত ঐক্যসূত্রে বাংলার সংগে থাকতে চেয়েছিলো বলে আসামের সংগে তাদের অন্তর্ভূক্তিতে প্রতিবাদ জানায়। ১৯০৫ সালে যখন পূর্ব বাংলা ও আসাম নামে নতুন (মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ) প্রদেশ গঠিত হয় তখন সিলেট ও কাছাড় পুনরায় এই নতুন প্রদেশের চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্ভূক্ত হয়। কিন্তু ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে গেলে জেলা দুটি পুনর্বার আসাম প্রদেশের অধীনে চলে যায় এবং ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সিলেট আসামের সংগে সংযুক্ত থাকে।

অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ আসামের (মোট লোকসংখ্যা ১০,২০৪,৭৩৩ এর মধ্যে ৩,৪৪২,৪৭৯ জন মুসলমান) বাংলা সীমান্ত সংলগ্ন জেলা সিলেটেই কেবল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিলো (৩,১১৬,৬০২ জনের মধ্যে ১,৮৯২,১১৭ জন মুসলমান)[২]। তবুও ঐতিহাসিক বন্ধন এবং ভূ-প্রকৃতিগত অবস্থানের কারণে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবে আসামকেও প্রস্তাবিত পাকিস্তান পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্তির জন্য বিবেচনা করা হয়। এই অন্তর্ভূক্তির পেছনে যে মূলনীতি কাজ করেছিলো, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬ –১৯৪৮) ১৯৪৬ সালের ১২ মে ক্যাবিনেট মিশনের কাছে লীগের দফাসমূহ পেশ করার সময় সে ব্যাপারে স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করেন। জিন্নাহ দাবী

করেন, সম্পূর্ণ আসামসহ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং বাংলাকে পাকিস্তান গোষ্ঠী হিসেবে গোষ্ঠীভুক্ত করতে হবে। সেই মুহূর্তে লীগের চিন্তা-ক্ষমতার আওতায় সেটা ছিলো ন্যূনতম দাবী। দাবীর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে জিন্নাহ আরো বলেন, নিজেদের পছন্দমতো সরকার পদ্ধতি নির্ধারণ করার অধিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের থাকতে হবে। তিনি যুক্তি আরোপ করে বলেন, পাকিস্তানকে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ভাবে সক্ষম করে তোলার উদ্দেশ্যে লীগ পরিকল্পনায় বেশ কিছু মুসলিম সংখ্যালঘু এলাকাও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।[৩] অন্যদিকে কংগ্রেসের স্মারকে কংগ্রেস সভাপতি (১৯৩৯ – ১৯৪৬) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (১৯৮৮ – ১৯৫৮) লীগ দাবীর সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে জোরালোভাবে জানান যে, জিন্নাহ ব পাকিস্তান পরিকল্পনায় 'বোধগম্য কারণেই কোনো অবস্থায়ই আসামের স্থান হতে পারে না'।[৪]

ক্যাবিনেট মিশন মুসলিম লীগ কর্তৃক দাবীকৃত একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান প্রশ্নটি পরীক্ষা করে দেখে। মিশন উল্লেখ করে, মুসলিম লীগ যে ভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে তাতে সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান হবে না। পাঞ্জাব, বাংলা ও আসামের যে সব জেলায় অ-মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে সে সব জেলা পাকিস্তান এর অন্তর্ভূক্ত করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। মিশন আরো উল্লেখ করে, পাকিস্তান-এর পক্ষে যতোগুলো যুক্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে ঠিক ততোগুলো যুক্তিই, আমাদের মতে, পাকিস্তান থেকে অ-মুসলিম এলাকা পৃথক করার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে।[৫] এরপর, কমিশন কেবল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার মধ্যে ক্ষুদ্র পাকিস্তানকে সীমাবদ্ধ রেখে আপোসের সম্ভাব্য ভিত্তি হতে পারে কিনা বিবেচনা করে। তবে এ ধরনের একটি পাকিস্তান, মুসলিম লীগের কাছে সম্পূর্ণভাবে অকার্যকর বিবেচিত হয়। কেননা, এরমধ্যে পাকিস্তান থেকে, (ক) পাঞ্জাবের গোটা জলন্ধর ও আমবালা বিভাগ, (খ) কলকাতাসহ (যেখানে মোট লোকসংখ্যার বড়জোর এক চতুর্থাংশ মুসলিম) পশ্চিম বঙ্গের একটি বৃহৎ অংশ (সম্পূর্ণ বর্ধমান বিভাগ), এবং গ) সিলেট জেলা ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ আসামের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি ছিলো। কিন্তু লীগ নেতৃবৃন্দ তৎসত্বেও সীমানা সমন্বয়ের ব্যাপারটি পরবর্তী পর্যায়ে বিবেচনা করতে প্রস্তুত হয় এই শর্তে যে, আগে পাকিস্তান নীতিটি স্বীকৃত হতে হবে।[৬]

সিলেট ও কাছাড়সহ পাকিস্তানে আসামের অন্তর্ভূক্তির মুসলিম লীগের দাবী আবদুল মতিন চৌধুরী (১৮৯৫-১৯৪৯), মনোয়ার আলী, মুদাব্বের হোসেন চৌধুরী, আবদুল হামিদ, মাহমুদ আলী (সাধারণ সম্পাদক, আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ, ১৯২২) মইনুল হক চৌধুরী (কাছাড়) এবং মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮৫-১৯৭৬, সভাপতি, আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ) প্রমুখ নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে সোচ্চার হয়ে ওঠে। কিন্তু বাংলা ও আসাম ভাগের সম্ভাবনা যখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে তখন সিলেট ও কাছাড়ের মুসলমানগণ বাংলার মুসলমানদের সাথে তাদের ঐতিহাসিক,

ভাষাগত, সংস্কৃতি ও জাতিগত সম্বন্ধের কারণে সিলেট ও কাছাড়কে পাকিস্তান-এর অংশ হিসেবে গঠিতব্য পূর্ববাংলার সংগে যুক্ত করার দাবী জানায়।

মূলনীতি

এ সব পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এবং ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সংগে ভাইসরয়ের কয়েক দফা বৈঠকের ভিত্তিতে ৩ জুন পরিকল্পনা প্রণীত হয়। ৩ জুন ঘোষণায় স্পষ্ট উল্লেখ করা হয় যে, যদি বাংলাকে ভাগ করতে হয় তাহলে-

> ..... সিলেট আসাম প্রদেশের অংশ হিসেবে থেকে যাবে, না- নতুন প্রদেশ পূর্ব বাংলার সংগে যুক্ত করা হবে, (এ ব্যাপারে) যদি সেই প্রদেশ রাজি হয়, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আসাম প্রাদেশিক সরকারের সংগে পরামর্শক্রমে গভর্ণর জেনারেলের তত্ত্বাবধানে সিলেট জেলায় গণভোটের আয়োজন করা হবে।

পরিকল্পনায় সিলেট ও তৎসংলগ্ন (জেলাগুলি থেকে পূর্ববাংলার সংগে যুক্ত করা হবে এমন) মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার সীমানা চিহ্নিত করার জন্য বাংলা ও পাঞ্জাবের মতো একই বিচার্য বিষয়ের আওতাসহ একটি বাউন্ডারি কমিশন গঠনের বিধান রাখা হয়।[৭] এই আইনগত পটভূমিতেই সিলেটে গণভোটের আয়োজন হয়।

বাংলা ও আসামের জন্য বাউন্ডারি (সীমানা-নির্ধারণ) কমিশন গঠন

উল্লেখ্য যে, ৩ জুনের ঘোষণায় ক্ষমতা হস্তান্তরের তারিখ ১৯৪৮ সালের জুন থেকে ১৯৪৭ সালের ১৪-১৫ আগষ্টে এগিয়ে আনা হয়। অতঃপর দু'টি বিষয়ের প্রতি ভাইসরয়ের তাৎক্ষণিক মনোযোগ এবং সক্রিয় বিবেচনার ব্যাপার এসে পড়ে; যথাঃ (১) বাংলা (এবং আসাম) ও পাঞ্জাবের জন্য বাউন্ডারি কমিশন গঠন ও কমিশনের বিচার্য বিষয় নির্ধারণ, এবং (২) সিলেটে গণভোট আয়োজনের সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা। বিচার্য বিষয় নির্ধারণসহ বাউন্ডারি কমিশন গঠনের ব্যাপারটি ছিলো অত্যন্ত জটিল। ৩ জুন পরিকল্পনায় নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যে, বাউন্ডারি কমিশনের গঠন ও কমিশনের বিচার্য বিষয় ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সংগে পরামর্শক্রমে স্থির করতে হবে। ভাইসরয় অতঃপর কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সংগে প্রথমে পৃথকভাবে পরামর্শের জন্য বসার এবং পরে 'উভয়ের মধ্যে ভাবের আদান- প্রদানের চেষ্টা চালানোর' সিদ্ধান্ত নেন।[৮] নথিপত্রে দেখা যায় যে, প্রত্যেক কমিশনের জন্য একজন স্বতন্ত্র সভাপতি এবং কংগ্রেস মনোনীত দু'জন ও লীগ মনোনীত দু'জন সদস্য রাখার কংগ্রেস প্রস্তাবে জিন্নাহ রাজী হন। নথিপত্রে আরো দেখা যায় যে, কমিশনের সদস্য মনোনয়নের ব্যাপারে নেহেরু'র আর একটি প্রস্তাব ছিলো যে, সদস্যরা "উচ্চ পর্যায়ে বিচার পরিচালনার সংগে জড়িত ব্যক্তি" হবেন এবং অন্যপক্ষে জিন্নাহ "সম্ভব হলে, আইনজ্ঞদের বাদ দিতে চেয়েছিলেন"। কারণ তাঁর মতে "দু'জন বা তার বেশি আইনজ্ঞ একত্র হলেই সব সময় একটা ঝামেলা তৈরী হয়ে যায়।"[৯] আর

কোন বিস্তারিত তথ্য না পাওয়া গেলেও এটা স্পষ্ট যে, জিন্নাহ কোনো পরিবর্তন ছাড়াই নেহেরুর প্রস্তাবকৃত কমিশনের বিচার্যবিষয় সম্পর্কেও একমত হয়েছিলেন।

> বাউন্ডারি কমিশনকে মুসলিম ও অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা সংলগ্ন এলাকা নির্ধারণের ভিত্তিতে বাংলার দুই অংশের সীমানা চিহ্নিতকরণের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এজন্যে 'অন্যান্য বিষয়কে'ও বিবেচনার অঙ্গীভূত করতে হবে। সিলেট জেলায় অনুষ্ঠিতব্য গণভোটের ফলাফল যদি সিলেটকে পূর্ববাংলার সংগে একত্রীভূত করার অনুকূলে যায়, সেক্ষেত্রে বাংলার জন্য গঠিত বাউন্ডারি কমিশন সিলেট জেলা ও তৎসন্নিহিত জেলাসমূহের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলোর সীমানাও চিহ্নিত করবে।[১০]

এর ফলে সিলেটের জন্য পৃথক বাউন্ডারি কমিশন গঠনের সম্ভাবনা আগেই তিরোহিত হয়ে যায়। আসামের গভর্ণর তবুও বিষয়টি আরেকবার তুলে ধরার চেষ্টা করেন এবং ভাইসরয়ের নিকট প্রেরিত পত্রে সিলেটের জন্য একটি পৃথক বাউন্ডারি কমিশন গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন।[১১] ভাইসরয়, তাঁর পরামর্শকদের সংগে আলোচনাক্রমে আসামের গভর্ণরের প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন "এই কারণে যে, নেতৃবৃন্দ ইতোমধ্যেই একমত হয়েছেন, বেঙ্গল বাউন্ডারি কমিশন আসামের ক্ষেত্রেও কাজ করবে," এবং জিন্নাহ ও নেহেরু কমিশনের বিচার্যবিষয় নিরূপণের ক্ষেত্রেও পরস্পর সম্মত হয়েছেন।[১২]

ইতোমধ্যে ভাইসরয় বাউন্ডারি কমিশনের জন্য নেহেরু এবং জিন্নাহ কর্তৃক মনোনীত সদস্যদের তালিকা পেয়ে যান।[১৩] ১৯৪৭ সালের ৩০ জুন গভর্ণর জেনারেল এক সরকারী ঘোষণায় বাংলা ও পাঞ্জাবের জন্য দুটি পৃথক বাউন্ডারি কমিশন গঠনের কথা প্রকাশ করেন। বেঙ্গল বাউন্ডারি কমিশনে কংগ্রেস কর্তৃক মনোনীত সদস্য হলেন: (১) বিচারপতি বিজন কুমার মুখোপাধ্যায় এবং (২) বিচারপতি সি. সি. বিশ্বাস, এঁরা দু'জনেই কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন; আর লীগ মনোনীত সদস্য হলেন: (৩) বিচারপতি আবু সালেহ মহামেদ আকরাম এবং (৪) বিচারপতি এস. এ. রহমান। বিচারপতি আকরাম কলিকাতা হাইকোর্টের এবং বিচারপতি রহমান পাঞ্জাব হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। তাঁরা কেউই বাঙ্গালী ছিলেন না। এজন্যই উল্লেখ্য যে, নেহেরু এবং জিন্নাহর ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের কারণে বেঙ্গল বাউন্ডারি কমিশনে বাংলার ভৌগোলিক অবস্থার সংগে পরিচিত কোনো উচ্চ পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় ব্যক্তি বাছাই করার ক্ষেত্রে মুসলিম লীগের ভূমিকা শেষ পর্যন্ত সীমিত হয়ে পড়ে। এর দ্বারাই প্রতীয়মান হয়, বেঙ্গল বাউন্ডারি কমিশনে কেন মুসলিম লীগকে লাহোর হাইকোর্টের একজন বিচারপতিকে মনোনীত করতে হয়েছিলো। উপযুক্ত ঘোষণায় বেঙ্গল বাউন্ডারি কমিশনকে পূর্ববাংলা ও আসামের সীমানা চিহ্নিতকরণের নির্দেশ প্রদান করা হয়।[১৪] ৪ জুলাই, ভাইসরয় বাংলা ও পাঞ্জাবের দুটি বাউন্ডারি কমিশনের জন্য সভাপতি হিসেবে স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের (১৮৯৯-১৯৭৭) নিযুক্তির কথা ঘোষণা করেন।[১৫]

গণভোটের বিধিগত আনুষ্ঠানিকতা ও আইনগত কাঠামো

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ৩ জুন পরিকল্পনা ঘোষণার পরপরই ভাইসরয় অবিলম্বে সিলেটে "গণভোট অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক পদক্ষেপ" গ্রহণের জন্য আসামের গভর্ণরকে অনুরোধ করেন। গভর্ণর, গণভোটের বিধিগত ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, এবং ভাইসরয়ের সংগে পরামর্শক্রমে তাঁর সুপারিশ ও নির্দেশ অনুসারে গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য যে পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করেন, তাহলোঃ (১) রেফারেন্ডাম কমিশনার হিসেবে এইচ. সি. স্টর্ক, আই. সি. এস. (আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিভাগের সচিব ও আইনস্মারক, আসাম) –এর নিযুক্তির জন্য ভাইসরয়ের অনুমোদন প্রার্থনা। এ ব্যাপারে তিনি যুক্তি দেখান যে, এইচ. সি. স্টর্কের "নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং তিনি সাধারণভাবে আস্থাভাজন।" (২) গণভোটের জন্য তিনি ভাইসরয়কে জানান যে, ৬–৭ জুলাই ভোট গ্রহণ করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট তালিকাভূক্ত (১৯৪৬ সালের তালিকা অনুযায়ী) সকল ভোটার দু'দিনের যে কোনো দিনে ভোট দিতে পারবে। গত সাধারণ নির্বাচনের মতই ভোট গ্রহণ কেন্দ্র ও বুথের ব্যবস্থা করা হবে। (৩) তিনি ভাইসরয়কে আরো জানান যে, রেফারেন্ডাম কমিশনার "ব্যক্তিগতভাবে ভোট গণনা করবেন এবং আমাকে তার ফলাফল জানাবেন –যা আমি অবিলম্বে তারবার্তা মারফত আপনাকে অবহিত করবো।" গণভোটের ফলাফল প্রকাশের ব্যাপারে গভর্ণর ভাইসরয়কে জানান "আমার মন্ত্রীসভার এই অভিপ্রায় এবং আমিও তাঁদের সাথে একমত যে, গণভোটের ফলাফল আসাম থেকে প্রদান করা বা আসাম থেকে জানাজানি হওয়ার পরিবর্তে তা দিল্লী থেকে ইয়োর এক্সেলেন্সী কর্তৃক প্রকাশিত হোক।" এছাড়াও তিনি ভাইসরয়কে এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কাজ প্রায় চূড়ান্ত এবং তিনি সময়সূচী মেনে চলার ব্যাপারে অবিচল থাকবেন।[১৬]

বঙ্গভঙ্গ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত

৩ জুনের পরিকল্পনায় দেখা যায় যে, সিলেটের গণভোট ছিলো বঙ্গভঙ্গ এবং সিলেটকে "পূর্ববাংলা কর্তৃক একত্রীভূত করার সম্মতির" সংগে শর্তসাপেক্ষ। অতঃপর ৩ জুন পরিকল্পনার ২১ সংখ্যক অনুচ্ছেদ অনুসারে গভর্ণর জেনারেল ১৬ জুন গণভোটের কার্যক্রম ঘোষণা করেন এই শর্তে যে,

> "যদি .... বাংলাকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাহলে বঙ্গীয় আইন পরিষদের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যবর্গ ..... যদি ..... সিলেটে অনুষ্ঠিতব্য গণভোটের ফলাফল ..... নতুন প্রদেশ পূর্ববাংলার সংগে সিলেটকে একত্রীভূত করার অনুকূলে যায়, সে ক্ষেত্রে, অনুরূপ একত্রীকরণে প্রদেশের সম্মতির জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অগ্রসর হবেন।"[১৭]

তদনুসারে, বঙ্গীয় আইন পরিষদ ১৯৪৭ সালের ২০ জুন দু'টি অধিবেশনে মিলিত হয়। দু'টি প্রশ্ন সদস্যদের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়–বাংলাকে কি বিভক্ত করা হবে? যদি তাই হয়, তবে কোন্ গণপরিষদ সংবিধান এর আইন তৈরী করবে? পরিষদের স্পীকার নূরুল আমিনের (১৮৯৭–১৯৭৪) সভাপতিত্বে সদস্যদের (মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ও অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলার সদস্য)

এক যৌথ অধিবেশনে ১২৬ জন সদস্য একটি নতুন ও স্বতন্ত্র (পাকিস্তান) গণ-পরিষদের পক্ষে এবং ৯০ জন সদস্য (ভারতীয়-১৯৪৬ সালে নির্বাচিত) বর্তমান গণপরিষদের পক্ষে ভোট দেন। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যবৃন্দ বর্ধমানের মহারাজাধিরাজের সভাপতিত্বে এক পৃথক সভায় মিলিত হয়ে ৫৮-২১ ভোটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, বাংলাকে ভাগ করা উচিত হবে এবং বর্তমান গণপরিষদই তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে গঠিত রাজ্যের জন্য আইন প্রণয়ন করবে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যবৃন্দ অপর এক পৃথক সভায় মিলিত হয়ে ১০৬-৩৫ ভোটে বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাসমূহের সদস্যবর্গের সভার ভোটের ফলাফল যখন তাঁদেরকে জানানো হয় তখন তাঁরা ১০৭-৩৪ ভোটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাসমূহ নিয়ে গঠিত রাজ্য, প্রস্তাবিত পাকিস্তান গণ পরিষদে যোগদান করবে। সেই সাথে ১০৫ -৩৪ ভোটে এ সিদ্ধান্তও গৃহীত হয় যে, বাংলা ভাগ হলে পূর্ব বাংলা, তার সাথে সিলেটের একত্রীকরণে সম্মত থাকবে।[১৮]

নির্বাচনী প্রচারাভিযান

কংগ্রেস পন্থী ও লীগ পন্থীদের নির্বাচনী শ্লোগান শুরু হলে সিলেট জেলা গণভোটের উত্তেজনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। নির্বাচনী প্রচারণার দিনগুলোতে সিলেট জেলায় যথেষ্ট উৎসাহ ও উত্তেজনার সঞ্চার হয়। সিলেটকে পাকিস্তানের সংগে সংযুক্ত করার পক্ষে প্রচারাভিযানের জন্য হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির (১৮৯৩-১৯৬৩) নেতৃত্বে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের এক বিরাট দল সিলেটে আসেন। বাংলার যে নেতৃবৃন্দ ব্যক্তিগতভাবে গণভোটের প্রচার অভিযান তদারক করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮), নূরুল আমিন, পীর বাদশা মিয়া, সৈয়দ মুয়াজ্জেম উদ্দীন হোসেন, এ. এইচ. ইস্পাহানী, মৌলানা আবদুল্লাহেল বাকী, ইউসুফ আলী চৌধুরী (১৯০৯ -৭১), মৌলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ (১৯০০-৮৬), এবং ছাত্রনেতা শাহ আজিজুর রহমান (১৯২৫-৮৮), ফজলুল কাদের চৌধুরী (১৯১৯-৭২), এবং শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-৭৫ , ১৯৬৯ থেকে বঙ্গবন্ধু নামে পরিচিত) প্রমুখ। বাংলায় তখন শ্লোগান ছিলো, 'চলো চলো সিলেট চলো'। স্থানীয় সেনাবাহিনী সূত্রে জানা যায় "পূর্ব বাংলা পক্ষীয় মুসলমানদের সংগঠন ও প্রচারণা কংগ্রেসের তুলনায় স্পষ্টতই অনেক ভালো ছিলো। মুসলিম লীগ দল যে কায়দায় তাদের প্রচারাভিযান চালায় তা ছিলো দেখার মতো।"[১৯] শোভাযাত্রা, শ্লোগান, তরুণদের কুচকাওয়াজ ছিলো তাদের দৈনিক কর্মসূচী। মাইক্রোফোন ও লাউডস্পীকার সজ্জিত মোটর গাড়ী ও নৌকা প্রচারণার-মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছিলো। এ সময়ে বাইরে থেকে আসা মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড ও স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা সিলেট ভরে যায় এবং তারা দুর-দূরান্তের গ্রামেও প্রবেশ করে। তরুণ শিখসহ কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবকরাও অবশ্য সুদূর গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিদিনের শোভাযাত্রা ও সভা ৫ জুলাই ১৯৪৭ এ চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছায়।

বাংলা থেকে আসা মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড ও ছাত্রনেতাদের ব্যাপক উপস্থিতি আসামপন্থী অমুসলিমদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে। দুটি ভিন্নমুখী জনমতকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দলের মধ্যে কিছুটা উত্তেজনাকর সম্পর্কেরও সৃষ্টি হয়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ, উভয় শিবিরই এই সময়ে পরস্পরের প্রতি সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ করতে থাকে। বিভিন্ন মহকুমা থেকে, বিশেষ করে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে উচ্ছৃঙ্খলতা, আক্রমন ও আতংক সৃষ্টির অভিযোগ উত্থাপন ৩ জুলাই থকেই শুরু হয়ে যায়। লীগ কর্মীদের দ্বারা সন্ত্রাস সৃষ্টির কিছু কিছু অভিযোগও পাওয়া যায়। সেনাবাহিনী ও পুলিশ নামানোর অসংখ্য অনুরোধ আসতে থাকে। ২ জুলাই ১৯৪৭-এ সেনাবাহিনী মোতায়েন করার পরও ৩ ও ৪ জুলাইয়ে অসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে কংগ্রেস ও জামাত এর পক্ষ থেকে অত্যন্ত অতিরঞ্জিত অভিযোগ আসে। সামরিক ও অসামরিক কর্তৃপক্ষ অরাজকতা সৃষ্টির বহু অভিযোগ পরীক্ষা করে দেখে এবং সেগুলো অসত্য বলে প্রমাণিত হয়। স্থানীয় সরকারী সূত্রে বলা হয়, "এই অভিযোগগুলো ছিলো একেবারেই ভিত্তিহীন এবং সেজন্যই তা অগ্রাহ্য করা হয়েছে।" ঐ একই সূত্র থেকে দাবী করা হয়, কিছু কায়েমী স্বার্থবাদী মহল 'নিজেদের রাজনৈতিক লক্ষ্য হাসিলের জন্য এবং হেরে গেলে নিজেদের অবস্থান আগে থেকেই ঠিক রাখার জন্য' এই আতংক সৃষ্টি করে।[২০]

সিলেট জেলা মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা হলেও গণভোটের ফলাফল নিয়ে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের যথেষ্ট আশংকা ছিলো। আসাম সরকারের মধ্যে হিন্দু মন্ত্রীগণ বিশেষ করে সিলেটের বসন্ত কুমার দাস এবং বৈদ্যনাথ মুখার্জি সিলেটের আসামে থেকে যাওয়ার পক্ষে সক্রিয় প্রচারণায় অংশ গ্রহণ করেন। জামাত-ই-উলেমা-ই-হিন্দ-এর নেতা মৌলানা হোসেন আহমদ মাদানির (১৮৭৯-১৯৫৭) অনুসারীবৃন্দ-সিলেটে যাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ছিলো, তারাও সিলেটের পাকিস্তানের সংগে অন্তর্ভূক্তির বিপক্ষে প্রচারণা চালায়। এ কারণে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের আশংকা ছিলো, প্রাদেশিক সরকারের - যার অর্থ কংগ্রেস মন্ত্রীসভার-গণভোটে যেখানে তাদের নিজস্ব স্বার্থ আছে-তাদের, এবং স্যার আকবর হায়দারির মতো গভর্ণর 'যিনি মুসলিম লীগের আদর্শের বিরোধীতার জন্য কুখ্যাত এবং কংগ্রেসকে তুষ্ট করার জন্য ব্যস্ত' - তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে অনুষ্ঠিত গণভোট অবাধ কিংবা পক্ষপাতহীন কোনোটাই হতে পারেনা।[২১] ফলে আসামের মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ, বিশেষভাবে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ আলী (জন্ম-১৯২২) আসামের গভর্ণর পাল্টানোর জন্য সুপারিশ করেন।[২২] এদিকে মুসলিম লীগপন্থী হিন্দু নেতারাও কংগ্রেস এবং আসামপন্থী কর্মীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগ আনেন।[২৩]

অতঃপর, গণভোট অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার সংগে সংগেই নতুন দিল্লী থেকে প্রকাশিত মুসলিম লীগের দৈনিক পত্রিকা 'দি ডন' এর সহ সম্পাদকীয়তে গণভোট অনুষ্ঠানের প্রস্তাবিত পদ্ধতির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়, ভাইসরয়, ৩ জুনের ঘোষণায় বর্ণিত শর্তাবলী কিংবা ঐ ঘোষণার পরদিন সাংবাদিক সম্মেলনে-

ব্রিটিশ সেনাবাহিনী গণভোটের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান করবে বলে জনসমক্ষে তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার কোনোটাই পালন করেননি। পত্রিকায় বিশেষ ভাবে বলা হয়, ৩ জুন পরিকল্পনায় যদিও নির্দিষ্টভাবে বিধান রাখা হয়েছে যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মতো সিলেটের গণভোটও গভর্ণর জেনারেলের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হবে, কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে যে, গণভোটের ব্যাপারে যাদের স্বার্থ রয়েছে সেই প্রাদেশিক কংগ্রেস মন্ত্রীসভার হাতেই গণভোটের ব্যাপারগুলো ছেড়ে দেয়া হয়েছে। পত্রিকা অভিযোগ করে যে, যদিও কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হয়নি তথাপি বিভিন্ন সংবাদ সূত্রে জানা যাচ্ছে যে, যিনি আসামে মুসলিম বিরোধী হিসেবে কুখ্যাত 'সেই স্টর্ককে রেফারেন্ডাম কমিশনার নিযুক্ত করা হয়েছে। পত্রিকায় দাবী করা হয়, এই অফিসার 'এই পদের জন্য উপযুক্ত নন' কারণ, (১) তিনি 'সিলেটের এক হিন্দু মন্ত্রীর সরাসরি অধীনস্থ কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করছেন'; এবং (২) প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে তুরস্কে তিনি ছিলেন একজন যুদ্ধবন্দী, এবং সেই থেকে ধারণা করা হয়, 'তুর্কী টুপি' কিংবা সেই টুপি পরিহিত যে কোনো ব্যক্তি সম্পর্কেই তিনি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। ফলে আসামের মুসলমানগণ তাঁকে অবিশ্বাসের চোখে দেখে।[২৪] প্রতীক নির্বাচনের ক্ষেত্রেও পত্রিকা অভিযোগ করে যে, ভোট বাক্সের প্রতীক, মুসলিম লীগ গণভোট কমিটির সংগে আলোচনা না করেই ইচ্ছামতো নির্ধারণ করা হয়েছে। পূর্ব বাংলার সংগে সিলেটের সংযুক্তির বিপক্ষে ভোটের জন্য ভোট বাক্সের প্রতীক বাছাই করা হয়েছে 'কুড়ে ঘর', অন্যদিকে পাকিস্তানের পক্ষে ভোটের জন্য ভোটবাক্সের প্রতীক বাছাই করা হয়েছে 'কুড়াল'। এই প্রতীকগুলো সম্পর্কে অনেক লোক-বিশ্বাস প্রচলিত আছে এবং কংগ্রেসকর্মীরা ইতোমধ্যেই সেই সব প্রচলিত লোক-বিশ্বাসকে পুঁজি করে পূর্ব বাংলার সংগে সিলেটের সংযুক্তির বিপক্ষে প্রচারণা শুরু করে দিয়েছে এই বলে যে, 'কুড়াল' হলো একজনকে আঘাত করার প্রতীক, আর 'কুঁড়ে ঘর' সুখ-শান্তির প্রতীক।[২৫] পত্রিকায় আরো উল্লেখ করা হয় যে, প্রিজাইডিং অফিসারগণ আসাম সরকারের অধীনে চাকুরিরত এবং তাদেরকে স্থানীয় সরকারের আদেশে কাজ করতে হবে, অথচ তাদেরকে গভর্ণর জেনারেলের নিয়ন্ত্রণাধীন অফিসারদের তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করার ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। পত্রিকাটি অতঃপর, আসাম সরকারের বিরুদ্ধে নির্বিচারে লীগকর্মী আটক করা এবং লীগের প্রচারকর্মে বাধা দেওয়ার প্রচুর অভিযোগ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করে।

জিন্নাহ এই 'ডন' পত্রিকার অভিযোগ সমর্থন করে মাউন্টব্যাটেনকে তা অবহিত করেন এবং মন্তব্য করেন যে, বিশেষ করে সিলেটের বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যাকবলিত থাকার কারণে গণভোটের তারিখ বেশ আগে হয়ে গেছে এবং ভোট প্রদান করার সময়সীমা (সকাল ৯-৩০ থেকে সন্ধ্যা ৬-০০) ও প্রচার কাজ চালানোর সময় বেশ সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে।[২৬]

'ডন'-এর মন্তব্য ও তৎসহ জিন্নাহর মন্তব্য ১৯৪৭ এর ২৮ জুনে অনুষ্ঠিত ভাইসরয়ের ষ্টাফ সভায় সতর্কতার সংগে বিবেচনা করা হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, "গণভোট 'সম্পূর্ণ'

পক্ষপাতহীনভাবে পরিচালিত করতে হবে এবং সারাবিশ্ব সেটাই জানবে।" যদিও 'ডন' এর সমালোচনার কারণে কোনো চাপের কাছে নত হওয়ার কোনো প্রশ্নই ছিলো না তথাপি মুসলমানদের আশংকা দুর করার জন্য এবং সমালোচনার সম্ভাব্য সকল কারণ অপসারণ এবং উভয়পক্ষের আস্থা নিশ্চিত করার জন্য ভাইসরয় আসামের গভর্ণরকে জানান যে, ক) গণভোট কমিশনারকে গভর্ণরের একান্ত ষ্টাফ হিসেবে কিংবা তাঁর নিজের ষ্টাফ হিসেবে যুক্ত করা হতে পারে; খ) তাঁর নিজের প্রতিনিধিরূপে একজন যুগ্ম গণভোট কমিশনার নিয়োগ করা যেতে পারে; গ) সিলেটে গণভোটের সহায়তা ও তত্বাবধানের জন্য কতিপয় সামরিক অফিসার প্রেরিত হতে পারে; এবং ঘ) গণভোটের তারিখ কিছু দিনের জন্য স্থগিত রাখা যেতে পারে।[২৭]

আসামের গভর্ণরকে এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মতামত প্রদানের অনুরোধ জানানো হয়। আনীত অভিযোগের জবাবে গভর্ণর ভাইসরয়কে জানান যে, গণভোট গভর্ণর জেনারেলের নিশ্চিত তত্বাবধানেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং এর ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারের কোনো হাত বা নিয়ন্ত্রণ নেই। এ ছাড়াও গণভোট কমিশনার হিসেবে ষ্টর্ক 'কোনো মন্ত্রীর অধীনে নন বরং তিনি আমার অধীনে' এবং মন্ত্রীসভা কর্তৃক নির্দেশিত হওয়ার সন্দেহকে এড়ানোর জন্য তাঁকে লিগ্যাল রিমেমব্র্যান্সারের পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। গভর্ণর, জেলার দূরবর্তী অঞ্চলের ভোট গ্রহণে ষ্টর্ককে সাহায্য করার জন্য যতোজন সামরিক অফিসার পাঠানো সম্ভব, তাদের সকলের আগমনকেই স্বাগত জানান, তবে তিনি (১) কোনো যুগ্ম গণভোট কমিশনারকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান এই কারণে যে, 'অনুরূপ নিয়োগ মূল বিষয়কে পাশ কাটিয়ে ষ্টর্কের নিরপেক্ষতার উপর অযথা কলংক আরোপ করে বর্তমান কর্মপদ্ধতিকে বিভ্রান্ত করবে' এবং তিনি (২) গণভোট স্থগিত রাখতেও অস্বীকৃতি জানান। স্বীয় মতের সমর্থনে তিনি ভাইসরয়কে বলেন যে, গণভোটের ব্যাপারে সামরিক ও অসামরিক ব্যবস্থাপনার কাজ এতদুর এগিয়ে গেছে যে, এই পর্যায়ে তা আর স্থগিতযোগ্য নয়।[২৮]

গভর্ণর 'ডন' এর অভিযোগ সম্পর্কেও দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং প্রতিটি অভিযোগ খন্ডন করে মন্তব্য করেন, 'ডন' যা বলেছে তা অত্যন্ত সতর্কতার সংগে বিবেচনা করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন, বস্তুত 'ডন' এর গোটা রচনাটাই ছিলো সিলেটের প্রখ্যাত মুসলিম লীগ নেতা আবদুল মতিন চৌধুরীর বানানো কাহিনী।[২৯] যাহোক গভর্ণর এরপর গণভোট অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ষ্টর্ক কর্তৃক গৃহীত বিশদ ব্যবস্থাদির প্রতি গভর্ণর জেনারেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন, গণভোটের ঘোষণা দেয়ার আগে জারি করা সিলেট থেকে দুইজন মুসলমান মহকুমা অফিসারের বদলির আদেশ তাঁর অনুরোধে মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলই বাতিল করে দিয়েছেন। বলাবাহুল্য এ নিয়ে যাতে কারো মধ্যে কোনো সন্দেহ না জন্মায় সে জন্যই এ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। গণভোট কমিশনার হিসেবে ষ্টর্কের

নিযুক্তি প্রসংগে গভর্ণর বলেন যে, আবদুল মতিন চৌধুরী এবং সম্ভবতঃ তিনিই প্রধান অভিযোগকারী ব্যক্তিগতভাবে স্টর্ক সম্পর্কে কোনো অবিশ্বাস ব্যক্ত করেননি, কিংবা সিলেটের মুসলিম লীগের কোনো নেতাও সম্প্রতি তাঁর সাথে দেখা করার সময় স্টর্ক সম্পর্কে কোনো অভিযোগ করেননি। প্রতীক সম্পর্কে গভর্ণর উল্লেখ করেন যে, মতিন চৌধুরীর উদ্দেশ্য ছিলো, পূর্ববাংলার সংগে সংযুক্তির পক্ষে নতুন চাঁদকে প্রতীক হিসেবে রাখা– যা দেয়া হলে সিলেটের জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের মধ্যে ক্ষুব্ধতার সৃষ্টি হতো এবং সাম্প্রদায়িক চেতনাকে প্রশ্রয় দেয়া হতো। জিন্নাহ আনীত অভিযোগ প্রসংগে গভর্ণর ভাইসরয়কে আশ্বাস প্রদান করে বলেন, সেন্সরশীপ সম্পর্কিত অভিযোগ তিনি তদন্ত করে দেখবেন। তবে তিনি, জননিরাপত্তা আইনে কাউকে গ্রেফতার করার ঘটনা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তিনি ভাইসরয়কে নিশ্চিত করেন, এ ধরনের কোন গ্রেফতারের ঘটনা ঘটলে তিনি তাদের মুক্তির আদেশ দেবেন, কিন্তু সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির বেলায় তিনি তা হতে দেবেন না। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, শিখ অফিসারদের বলতে সম্ভবতঃ ১ম আসাম রেজিমেন্টের কম্যান্ডিং অফিসার লেঃকঃ মহিন্দর সিং চোপরাকে বোঝানো হয়েছে। বস্তুতঃ, তিনি ইউরোপীয় এবং অন্যান্য অ–শিখ অফিসারদের একটি দল নিয়ে ২–৮ জুলাই ১৯৪৭ পর্যন্ত সময়ে জেলায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষার সুবিধার জন্য কৌশলগত স্থানগুলোতে ফাঁড়ি স্থাপনের ব্যবস্থা করছেন। পরিশেষে, গভর্ণর পরিষ্কারভাবে বলেন যে, গণভোটে নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং আসাম সরকার গণভোটের ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারে না, কারণ তা তাদের হাতে নেই এবং তিনি জোরালোভাবে উল্লেখ করেন–

> সিলেটকে আসামের মধ্যে রাখার ব্যাপারে সিলেটের বাইরের কেউ বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন নন। সুরমা ভ্যালির চারজন বাদে আমার সকল মন্ত্রীই এ ব্যাপারে নৈর্ব্যক্তিক এবং প্রধান মন্ত্রীকে, সিলেটকে আসামে রাখার ব্যাপারে তাঁর উৎসাহহীনতার জন্য প্রকাশ্যে সমালোচনাও করা হয়েছে। আসাম মন্ত্রীসভা সিলেটকে আসামের মধ্যে রাখতে বদ্ধ পরিকর বলে মুসলিম লীগ যে প্রচারণা চালাচ্ছে তা আদৌ সত্য নয়।[৩০]

'ডন' এর অভিযোগ সম্পর্কে স্যার আকবর হায়দারির জবাব ও বিশ্লেষণ যুক্তিযুক্ত ছিলো। এরপর সবচেয়ে জরুরী যে বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয়, তা হলো, ভাইসরয় গভর্ণরের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন বা বাতিল করে গণভোটের তারিখ স্থগিত বা পরিবর্তন করবেন কিনা। ভাইসরয়ের সহকারী একান্ত সচিব আই. ডি. স্কট গণভোট স্থগিত রাখার বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, সিলেটে বন্যা জনিত কারণে রাস্তাঘাট যা খারাপ তা জুলাই হতে দিনে দিনে আরো খারাপ হয়ে পড়বে। "এই পর্যায়ে গণভোট স্থগিত করা হলে, তা ভাল না হয়ে বরং ঝামেলারই সৃষ্টি করবে।"[৩১] মাউন্টব্যাটেন স্কটের যুক্তি মেনে নেন এবং গণভোট সম্পর্কে সকল ব্যবস্থাই যে নিরপেক্ষভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে তা স্বীকার করে নিয়ে আসাম সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ অনুমোদন করেন।[৩২] এরপর ভাইসরয় গণভোট তত্বাবধানে সহায়তার জন্য ৫

জুলাইয়ের মধ্যে মেজর অথবা সমপর্যায়ের চারজন ব্রিটিশ সামরিক অফিসার সিলেটে প্রেরণের জন্য কম্যান্ডার-ইন-চীফকে অনুরোধ জানান।[৩৩] সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন হলে, মুসলিম লীগ মহলকে আশ্বস্ত করার জন্য লিয়াকত আলী খানকে (১৮৯৫-১৯৫১) চিঠিতে ভাইসরয় জানান, সিলেটের গণভোট 'মন্ত্রীসভার কোনো রকম নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।'[৩৪]

নির্বাচন ব্যবস্থাপনা

গণভোটের সকল প্রস্তুতি সম্পর্কে যাবতীয় দায়িত্ব পালন ও এ নিয়ে মাথাব্যথার কারণ ছিলো স্টর্ক এবং সিলেটের ডেপুটি কমিশনার ডামব্রেক-এর। দুই প্রধান দলের সম্মতিক্রমে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যা ২৩৯টি নির্ধারণ করা হয় (প্রত্যেক ভোট কেন্দ্রের জন্য দু'জন করে প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রত্যেক প্রিজাইডিং অফিসারের সংগে পাঁচ থেকে ছ'জন করে পোলিং অফিসার বরাদ্দ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়)। গোটা জেলায় যেহেতু পরপর দু'দিনের মধ্যে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন করতে হবে, সেজন্য ৪৭৮ জন প্রিজাইডিং অফিসার এবং ১,৪৩৪ জন পোলিং অফিসারের ব্যবস্থা করা গণভোট কমিশনারের সম্মুখে বড়ো সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়, কারণ এত অফিসারের সংস্থান করা একা সিলেটের পক্ষে সম্ভব ছিলো না।[৩৫] অতএব আসামের মুখ্য সচিবের সহযোগিতা ও নির্দেশক্রমে কাছাড়সহ আসাম উপাত্যকর জেলাসমূহ, শিলিং এবং আসাম সচিবালয় ২৫০ জন প্রিজাইডিং অফিসার ৫০০ জন পোলিং অফিসার প্রেরণ করে। এসব সত্বেও, মুসলমান অফিসারদের সংখ্যাল্পতার কারণে প্রত্যেক কেন্দ্রের দু'জন প্রিজাইডিং অফিসারের মধ্যেও একজন মুসলমান অফিসার বরাদ্দ করা সম্ভব ছিলো না। ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের জন্য প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসার বরাদ্দ করা এবং তাঁদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশসহ গণভোটের সকল সরঞ্জাম, বাক্স, ব্যালট কাগজ সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি গণভোট কমিশনারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেন সিলেটের ডেপুটি কমিশনার এবং তাঁর স্টাফ। প্রায় ২০ জন প্রিজাইডিং অফিসার এবং ৪০ জন পোলিং অফিসারকে সিলেট সদরে জরুরী প্রয়োজনে প্রস্তুত রাখা হয়। এর মধ্যে কোনো মুসলমান অফিসারকে অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব হয়নি।[৩৬]

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষা

সমশক্তি সম্পন্ন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের নির্বাচনী প্রচারণা-সৃষ্ট উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে অবাধ ও নিরপেক্ষ গণভোট আয়োজন করাটা এক সমস্যা ছিলো। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, আসাম গভর্ণরের এবং অন্যান্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষের পরামর্শ ও সাহায্যক্রমে এবং প্রতিবেশী জেলাসমূহের সহায়তায় সাহসিকতার সংগে সমস্যার মোকাবেলা করে এবং নির্ধারিত সময়ের আগেই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

গণভোটের সময়ে গোটা সিলেট জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষার জন্য আসাম রাইফেলস ও রেল বাহিনীসহ বিপুল সংখ্যক পুলিশ তলব করে আনা হয়। ২৩৯টি ভোট কেন্দ্রের প্রত্যেকটিতে কমপক্ষে তিনজন করে অস্ত্রহীন কনস্টেবল মোতায়েন করা হয়। অস্ত্রহীন কনস্টেবলদেরকে অন্য জেলা থেকে এবং অন্যান্যদেরকে জেলা বাহিনী থেকে নিযুক্ত করা হয়। গুরুত্ব অনুসারে কয়েকটি

ভোটকেন্দ্রে অতিরিক্ত সংখ্যায় অস্ত্রহীন কনস্টেবল মোতায়েন করা হয়। প্রায় ৫০% ভোট কেন্দ্রকে 'বিপদজনক স্থান' হিসেবে চিহ্নিত করে সে সব কেন্দ্রে তিনজন অস্ত্রহীন কনস্টেবলের অতিরিক্ত একজন এন সি ও এবং ছ'জন সশস্ত্র কনস্টেবল মোতায়েন করা হয়। চাহিদা অনুপাতে সশস্ত্র কনস্টেবলের সংখ্যা অপর্যাপ্ত থাকায় অনেক কেন্দ্রে আসাম রাইফেলস এবং রেল বাহিনীর[৩৭] সদস্য মোতায়েন করা হয়।

সন্ত্রাস সৃষ্টির সম্ভাব্য প্রচেষ্টা রোধ করার জন্য প্রধান প্রধান সড়কে ট্রাকযোগে এবং মফঃস্বল এলাকায় নৌকাযোগে সশস্ত্র টহলের ব্যবস্থা করা হয়। পুলিশের টহল ব্যবস্থা ছিলো সেনাবাহিনীর টহলের অতিরিক্ত। প্রয়োজনবোধে সামরিক সাহায্যেরও ব্যবস্থা রাখা হয়।

আসামের গভর্ণরের অনুরোধে উর্ধতন সামরিক কর্তৃপক্ষ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তার জন্য এবং গণভোটের আগে ও গণভোটকালীন এবং প্রয়োজনে গণভোটের পরে সন্ত্রাস সৃষ্টি রোধের জন্য সেনাবাহিনী নামানোর ব্যবস্থা অনুমোদন করেন। লেঃ কঃ মহিন্দর সিং চোপরাকে 'সিলফোর্স' নামে গঠিত বাহিনীর অধিনায়কত্ব প্রদান করা হয়। সিলফোর্সের দায়িত্ব ছিলো "গণভোটের আগে, গণভোটকালীন এবং পরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষা করা, ভোটারদের মধ্যে ভয় দেখানোর চেষ্টা রোধ করা এবং পুলিশের জন্য সংরক্ষিত সচল শক্তি হিসেবে কাজ করা।"[৩৮] জেলার ভূ-সংস্থানগত বৈশিষ্ট্যের কারণে এবং প্রায় সবগুলো মহকুমা ব্যাপকভাবে বন্যাকবলিত থাকার কারণে যে কোনো সংকটপূর্ণ স্থানে যথাসম্ভব দ্রুত পৌছানো যায়-এমন গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রসমূহে এক প্লাটুন করে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়। সুনামগঞ্জ এবং হবিগঞ্জের উত্তর-পশ্চিম এলাকার সম্পূর্ণ জল প্লাবিত স্থানগুলোর জন্য মোটর বোট বরাদ্দ করা হয়। সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ চূড়ান্ত হলে সিলফোর্সের সকল সদস্য ২ জুলাই, ১৯৪৭, অপরাহ্ন ছ'টার মধ্যে তাদের অবস্থান গ্রহণ করে এবং ব্যাপক টহল শুরু হয়।

৩ জুলাই, ডেপুটি কমিশনার মারাত্মক অস্ত্রবহন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী দলগুলোকে এ আদেশ পালনে সকলকে বাধ্য করার কাজে সহায়তার জন্য বলা হয়। কমিশনারের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক দলের নেতাদেরকে এই মর্মে হুশিয়ারিও প্রদান করা হয় যে, গণভোটের সময়ে ন্যায় বিচার ও শান্তি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী ও সশস্ত্র পুলিশ এখন প্রস্তুত রয়েছে। প্রয়োজন হলে, শান্তি ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে তারা যে কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মারাত্মক অস্ত্রও ব্যবহার করবে।[৩৯]

এছাড়া, গনভোটের সময়ে ভাইসরয়ের পক্ষ থেকে পর্যবেক্ষকরূপে কাজ করার জন্য কমান্ডার-ইন-চীফ কর্তৃক ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন লেঃ কর্ণেল এবং তিনজন অফিসারকে ৫ জুলাইয়ে সিলেটে গণভোট কমিশনারের নিকট রিপোর্টের জন্য প্রেরণ করা হয়। স্টর্কের নির্দেশে তাদেরকে বিভিন্ন মহকুমায় নিয়োগ করা হয়। এদের মধ্যে, মেজর বুচার্ডকে হবিগঞ্জে, মেজর

কার্টারকে মৌলবীবাজারে, মেজর ইয়ুংকে করিমগঞ্জে পাঠানো হয়, এবং লেঃ কঃ পিয়ারসনকে সিলেটে রেখে দেওয়া হয়। খুব দুরে হওয়ার কারণে এবং বন্যা প্লাবিত হওয়ার জন্য পুলিশের ডি. আই. জি. রীড এবং ডেপুটি কমিশনার ডামব্রেক-এর পরামর্শে কেবল সুনামগঞ্জে কাউকে পাঠানো হয়নি।[৪০]

গণভোট অনুষ্ঠান

৬ জুলাই সকাল সাড়ে ন'টায় জেলার বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ২৩৯টি ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে কিছু কিছু ভোটকেন্দ্রে জনতার মধ্যে হুড়োহুড়ি এবং দৌড়াদৌড়ি শুরু হলে লাইন ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়। তবে প্রিজাইডিং অফিসারগণ পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর সহায়তায় অবস্থা দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং এরপর নিয়মবদ্ধভাবে ভোট কেন্দ্রে ভোটারদের ব্যাপক আসা যাওয়া পরিলক্ষিত হয়।[৪১] গণভোট কমিশনারের কাছ থেকে জানা যায়, একটি মাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া, দ্বিতীয় দিন ভোট গ্রহণ সমাপ্তির আগে পর্যন্ত প্রচুর ভোটদানেচ্ছু ব্যক্তি ভোট দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল-এমন কোনো সংবাদ তিনি পাননি। ব্যতিক্রমটি ছিলো একটি মাত্র ভোটকেন্দ্রে, যেখানে অতিরিক্ত এক ঘন্টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হয়। তিনি আরো উল্লেখ করেন, শুধুমাত্র সময়াভাবের কারণে কাউকে ভোটদানে বিরত রাখা হয়নি এবং এ ব্যাপারে তিনি কোনো অভিযোগও পাননি।[৪২] কর্ণেল চোপরার অভিমত অনুযায়ী জানা যায়, প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার ফলে দ্বিতীয় দিনের ভোটগ্রহণ আরো সুষ্ঠু হয়। তিনি আরো জানান যে, সাধারণভাবে সর্বত্রই ভোটাররা শান্ত এবং সংযত ছিলো। যদিও কিছু কিছু কেন্দ্রে বৃষ্টির কারণে অসহিষ্ণুতা দেখা দিলেও তার জন্য ভোট গ্রহণে বিলম্ব ছাড়া আর কিছু ঘটে নি। গণভোট 'শান্তিপূর্ণ' ভাবেই অনুষ্ঠিত হয়।[৪৩]

সিলেটের গণভোট নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী এবং সরকারী সূত্র মোতাবেক 'শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়'। গণভোটের ফলাফল ১২ জুলাইয়ে টেলিগ্রাফযোগে দিল্লীতে পাঠানো হয়। সিলেটের জনগণ ৫৫,৫৭৮ ভোটের ব্যবধানে সিলেটকে পূর্ব বাংলার সংগে একত্রীকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সিলেটকে পূর্ব বাংলার সংগে সংযুক্তির পক্ষে বৈধ ভোটের সংখ্যা ছিলো ২,৩৯,৬১৯ এবং অন্যদিকে আসামের মধ্যে সিলেটের থেকে যাওয়ার পক্ষে ভোটের সংখ্যা ছিলো ১,৮৪,০৪১। মোট ভোটদাতাদের মধ্যে বৈধ ভোটার সংখ্যা ছিলো ৭৭.৩৩%।[৪৪]

লীগ-কংগ্রেস প্রতিক্রিয়া

সরকারী মহলের মতে গণভোট 'শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত' হলেও ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার সাথে-সাথেই কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দল থেকে ভোট প্রদানে বাধা দান ও সন্ত্রাস সৃষ্টির অসংখ্য পারস্পরিক অভিযোগ সরকারী মহলে আসতে থাকে। ভোটদাতাদের মধ্যে আতংক সৃষ্টির অসংখ্য অভিযোগ

জমা হয় এবং এর প্রায় সবগুলিই ছিলো মুসলমান ভোটদাতাদের দ্বারা হিন্দু ভোটদাতাদের ভয় দেখানোর অভিযোগ। মুসলিম লীগ, ভাইসরয়ের কাছে ব্যাপক অভিযোগ উথাপন করে এবং এর মধ্যে বিশেষভাবে গণভোটে আসাম মন্ত্রীসভার হস্তক্ষেপের অভিযোগই ছিলো মুখ্য এবং এ ব্যাপারে তারা তদন্তের দাবি জানায়।[৪৫] অন্যদিকে আসামপন্থী দলসমুহ মুসলমান ভোটার এবং মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের বিরুদ্ধে সাংঘাতিক প্রচারণা অভিযান শুরু করে। ভাইসরয়, নেহেরু, গান্ধী ও প্যাটেলের কাছে প্রেরিত টেলিগ্রামে আসামপন্থী দলসমূহ অভিযোগ করে যে, বহু জায়গায় বিশেষ করে হবিগঞ্জে, সকল গ্রামে গ্রামে ভয় দেখিয়ে হিন্দু ভোটারদেরকে ভোটকেন্দ্রে আসতে কিংবা ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে বিরত রাখা হয়।[৪৬] তাঁরা আরো অভিযোগ করেন যে, প্রায় সব কেন্দ্রেই, আসামপন্থী ভোটারদের অবাধে ভোটদানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ব্যাপারে যারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এমন বহু অ-ভোটার ও অননুমোদিত লীগকর্মীকে ভোটকেন্দ্রের ভেতরে প্রবেশ করার ও থাকার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। সিলেট জেলা গণভোট কমিটির সেক্রেটারী কর্তৃক ভাইসরয়ের নিকট প্রেরিত টেলিগ্রামে প্রায় নির্দিষ্ট করেই বলা হয় যে, অন্যান্য ইউরোপীয় অফিসারদের সহায়তায় ডেপুটি কমিশনার নিজে শত শত আসামপন্থী ভোটারকে ভোটকেন্দ্রের সীমানা থেকে বাইরে বের করে দিয়েছেন।[৪৭]

কংগ্রেস এবং আসামপন্থী সংগঠনসমূহ অভিযোগ করে যে, ভোটকেন্দ্রে পর্যাপ্ত সতর্কতা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি এবং সামরিক বাহিনী ও পুলিশের উচিত ছিলো ভোটারদেরকে বাড়ি থেকে সাথে করে ভোটকেন্দ্রে আনা এবং ফেরত রেখে আসা। কংগ্রেসী সংবাদপত্র সমূহে এ ধরনের উল্লেখ করা হয় যে, গণভোটের প্রাক্কালে ও গণভোট গ্রহণকালে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটে এবং গোটা জেলায় অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়। কলিকাতার শোভাবাজারের জনৈক রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী ভাইসরয়ের কাছে প্রেরিত এক টেলিগ্রামে দাবী করেন যে, ইতোমধ্যেই সংবাদপত্র সমূহে যেসব বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যায়, "মুসলিম লীগের সন্ত্রাস এবং গণভোটে শোচনীয় অনিয়মসমূহ সিলেট গণভোটকে প্রহসনে পরিণত করেছে"। তিনি একটি দ্বিতীয় 'ন্যায্য' গণভোট এবং জনসংখ্যা বিনিময়ের মাধ্যমে জেলার একটি ন্যায্য 'বিভক্তি'র দাবী জানান।[৪৮] আসাম মন্ত্রীসভার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বসন্ত কুমার দাসও সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে গণভোটকে 'প্রহসন' আখ্যা দেন এবং সরবরাহমন্ত্রী বৈদ্যনাথ মুখার্জির সঙ্গে একজোট হয়ে গণভোট পরিচালনার ব্যাপারে তদন্তের দাবী জানান।[৪৯]

অভিযোগের প্রতিক্রিয়া

গণভোটের ফলাফল জানার সঙ্গে সঙ্গে নেহেরু, আসাম ও কলকাতা থেকে বিভিন্ন রিপোর্ট, টেলিগ্রাম ও প্রতিনিধি মারফত প্রাপ্ত সকল অভিযোগ বর্ণনা করে মাউন্টব্যাটেনকে এক চিঠি লেখেন এবং তাতে উল্লেখ করেন যে, এই সকল অভিযোগ যদি "সত্যিই তথ্যভিত্তিক হয় তাহলে

গণভোটের বৈধতা সন্দেহজনক হয়ে পড়ে"। অতঃপর তিনি পরামর্শ দেন যে, এ ব্যাপারে যে কোন ধরনের সংক্ষিপ্ত তদন্ত অনুষ্ঠিত হতে হবে এবং গণভোটের ফলাফল প্রকাশের পূর্বে গভর্ণরের রিপোর্টের অপেক্ষা করতে হবে।[৫০] নেহেরু এ সকল অভিযোগসহ আসামের গভর্ণরের কাছেও একটি টেলিগ্রাম পাঠান এবং গণভোটকালীন পরিস্থিতির একটি বিবরণ পাঠানোর জন্য গভর্ণরকে অনুরোধ জানান।[৫১]

যেহেতু গণভোটের ফলাফল প্রকাশের তারিখ নির্ধারিত হয়েছিলো ১৪ জুলাই, ফলে মাউন্টব্যাটেন নেহেরুর চিঠির উত্তরে বলেন, জিন্নাহও গণভোটে আসাম মন্ত্রীসভার হস্তক্ষেপের ব্যাপক অভিযোগ উথাপন করেছেন এবং তদন্তের দাবী জানিয়েছেন যা "আমি প্রত্যাখ্যাণ করেছি"।[৫২] গণভোটের ফলাফলের প্রকাশ স্থগিত রাখার বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে মাউন্ডব্যাটেন জানান, "গণভোটের ফলাফল আমি ইতিমধ্যেই টেলিগ্রাম মারফত লণ্ডনে জানিয়েছি এবং আগামীকাল তা প্রকাশের জন্য কর্তৃত্ব প্রদান করেছি এবং এখন তা প্রত্যাহার করা হলে উত্তেজনার সৃষ্টি হবে।" তিনি নেহেরুকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, যে কোন নির্বাচন বা গণভোট পরিচালনার ব্যাপারে সব সময়ই অভিযোগ থাকে এবং এ ক্ষেত্রে আসামের গভর্ণর যখন ফলাফল অবিলম্বে প্রকাশ করার জন্য বলেছেন, তাতে পরিস্কার বোঝা যায়, তিনি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট, এবং অতঃপর "ফলাফল প্রকাশ বন্ধ করা আমাদের ঠিক হবে না।"[৫৩]

ইতিমধ্যে ভাইসরয়ের কাছে প্রেরিত এক বার্তায় স্যার আকবর হায়দরি জানান যে, গণভোট কিভাবে পরিচালনা করা হয়েছে সে সম্পর্কে অসামরিক ও সামরিক কর্তৃপক্ষদের কাছ থেকে প্রাথমিক তথ্য পাওয়ার জন্য তিনি নিজে ৯ জুলাই সিলেট সফর করেছেন। বসন্ত কুমার দাস এবং বৈদ্যনাথ মুখার্জি ইতোমধ্যেই কমাণ্ডার-ইন-চীফ কর্তৃক সিলেটে প্রেরিত ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অফিসারবৃন্দ, পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল (রীড), সিলেটের ডেপুটি কমিশনার (ডামব্রেক), সিলফোর্স এর কমাণ্ডার (কর্ণেল চোপরা), পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট (এস.পি.দত্ত) এবং অন্যান্যদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এক সভায় ব্রিটিশ সামরিক অফিসারবৃন্দ কর্তৃক পেশকৃত প্রথম রিপোর্টের সঠিকতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন এবং সেই সাথে এটাও সমর্থন করেন যে, "বিশৃঙ্খলার খাপছাড়া উদাহরণ দিয়ে স্বার্থান্বেষী মহলের দাবীকৃত আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতির ধারণা করাটা কল্পনার অতিরঞ্জন ছাড়া সম্ভব নয়।"[৫৪] গভর্ণর আরো উল্লেখ করেন যে,

> বসন্ত কুমার দাস এবং অন্যান্য বাঙালী (কংগ্রেস) কর্মীবৃন্দ কর্তৃক সংবাদপত্রে প্রদত্ত চরম দায়িত্বহীন বিবৃতি প্রদানের উদ্দেশ্য হলো লড়াইয়ে যে তাদের হার হচ্ছে তা তারা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং সে জন্যই এই বিবৃতি তাদের পরাজয়ের ব্যাপারে আগে থেকেই একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর প্রয়াস মাত্র।[৫৫]

নেহেরুর টেলিগ্রাম পেয়ে হায়দরি দ্রুত গণভোটের বিশদ ফলাফল মহকুমা অনুযায়ী (যা সারণী - ১ এ বর্ণিত হয়েছে) বিশ্লেষণ করে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, (১) "নির্বাচকমণ্ডলীর এক বৃহৎ

সারণি - ১

মহকুমা	মোট মুসলমান ভোটার সংখ্যা	পূর্ববাংলার পক্ষে প্রদত্ত ভোট সংখ্যা	%	মোট সাধারণ ভোটার সংখ্যা	আসামের পক্ষে প্রদত্ত ভোট সংখ্যা	%
সিলেট সদর	৯২,২৬৮	৬৮,৩৮১	৭৪.১১	৪৮,৮৬৩	৩৮,৮৭১	৭৯.৫৫
করিমগঞ্জ	৫৪,০২২	৪১,২৬২	৭৬.৩৮	৪৬,২২১	৪০,৫৩৬	৮৭.৭০
হবিগঞ্জ	৭৫,২৭৪	৫৪,৫৪৩	৭২.৪৬	৬০,২৫২	৩৬,৯৫২	৬১.৩৩
সিলেট দক্ষিণ	৩৮,২৯৭	৩১,৭১৮	৮২.৩২	৪১,৪২৭	৩৩,৪৭১	৮০.৭৯
সুনামগঞ্জ	৫১,৮৪৬	৪৩,৭১৫	৮৪.৩১	৩৯,০৪৫	৩৪,২১১	৮৭.৬২
সিলেট	৩,১১,৭০৭	২,৩৯,৬১৯	৭৬.৮৭	২,৩৫,৮০৮	১,৮৪,০৪১	৭৮.০৫

অংশ ভোট দিতে যায়", (২) "প্রত্যেক মহকুমাতেই মুসলমান ও সাধারণ ভোটারদের পূর্ব বাংলা কিংবা আসামের পক্ষে প্রদত্ত ভোটের অনুপাত ছিল অত্যন্ত বেশী, এবং সেজন্য তাঁর (নেহেরুর) অনুমান, প্রাপ্ত তথ্যের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। দূরবর্তী এলাকাসহ সমগ্র সিলেট জেলার পরিস্থিতি প্রসঙ্গে গভর্ণর দৃঢ়তার সঙ্গে জানান যে, "কোথাও বড়ো ধরনের কোনো সন্ত্রাসমূলক ঘটনা ঘটেনি, কিংবা যদি ঘটার মতোও হতো তাহলে তা প্রতিরোধ করার জন্য পর্যাপ্ত সামরিক ও পুলিশী সতর্ক ছিলো।"[৫৬] তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, বৈদ্যনাথ মুখার্জি যিনি এর আগে ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগে সায় দিয়েছিলেন, তিনিও এখন ভোটের সংখ্যা দেখে স্বীকার করছেন যে, এ ধরণের অভিযোগের প্রমাণ সিদ্ধতা নেই। গভর্ণর জানান, যে সব এলাকা থেকে নির্দিষ্ট অভিযোগ এসেছে, সেই সব এলাকায় মোতায়েনকৃত সামরিক ও পুলিশবাহিনীর সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে দেখা যায়, ঐসব অভিযোগের অধিকাংশই ভিত্তিহীন। হায়দরি অবশ্য স্বীকার করেন যে, বাংলা থেকে মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের বেশ কিছু সদস্য এসেছিলো এবং এদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো উদ্যত আচরণ করতেও পারে, তবে তিনি জোর দিয়ে বলেন, "তাদের কাউকে কোনো অস্ত্র, এমনকি লাঠি ব্যবহারেরও অনুমতি দেওয়া হয়নি।" তিনি আরো স্বীকার করেন যে, মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় হিন্দু ভোটাররা হয়তঃ তাদের ঘরবাড়ি এবং মহিলাদের নিয়ে আশংকিত ছিলো, কিন্তু, তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, তাদের কিছু লোককে সেনাবাহিনীর সদস্যরা গ্রাম থেকে সাথে করে ভোটকেন্দ্রে আনার এবং ফিরিয়ে রেখে আসার প্রতিশ্রুতি দিলেও তারা ভোটকেন্দ্রে যেতে সম্মত হয়নি। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, মনগড়া অভিযোগেরও কিছু ভিত্তি থাকতে হয়, যদিও "বাস্তবে অরাজকতার কোনো ঘটনাই ঘটেনি।" তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, গণভোট কমিশনারের সাক্ষ্য প্রমাণ থেকেও যে কোনো মাত্রার সামান্য অভিযোগও ভিত্তিহীন

প্রমাণিত হয়। তিনি অতঃপর জানান, গণভোট কমিশনারের রিপোর্ট এবং সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে তিনি নিঃসন্দেহ যে, গণভোট অবাধ ও পক্ষপাতহীণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।[৫৭]

গণভোট পরিচালনা সম্বন্ধে মূল্যায়ন

যদিও আসামের গভর্ণর এবং গণভোট কমিশনারের বক্তব্য অনুযায়ী গণভোট নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে তথাপি মুসলিম লীগ কর্মীদের দ্বারা হিন্দু ভোটারদের ভয় দেখানো ও শারীরিক নির্যাতনের অসংখ্য অভিযোগ উত্থাপিত হয়। অবশ্যই স্বীকার করতে হয়, গোপন ব্যালটে, মোট ভোটদাতা প্রদত্ত ভোটের সামগ্রিক শতকরা পরিমাণ, পূর্ব বাংলার সঙ্গে সংযুক্তির পক্ষে দেয়া ভোটের তুলনায় আসামের পক্ষেই কিঞ্চিৎ বেশি। এর দ্বারা, ব্যাপক ভীতিসঞ্চার এবং শারীরিক উৎপীড়ন সংক্রান্ত হিন্দু ভোটারদের দাবী অনেকাংশেই খারিজ হয়ে যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, অন্যান্য স্থানের তুলনায় হবিগঞ্জ মহকুমাতে শতকরা ভোটের পরিমাণ বিচারে পূর্ববাংলার সঙ্গে সংযুক্তির পক্ষে দেয়া ভোটের চাইতে আসামের পক্ষে দেয়া ভোটের পরিমাণ কম ছিলো। গোবিন্দগাঁও, আউশকান্দি, দেওপাড়া, কুরশী এবং বামনি – এই পাঁচটি ভোটকেন্দ্রের প্রতি স্টর্ক – এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। কেননা ঐ পাঁচটি ভোটকেন্দ্রে যথাক্রমে আনুমানিক মাত্র ২৭, ৮, ১৩, ৬ এবং ২৬ শতাংশ ভোট পড়ে। সাধারণ ভোটসংখ্যার তুলনায় এইসব ভোটকেন্দ্রে প্রদত্ত ভোটের পরিমাণ যথেষ্ট কম দেখা গেলেও এক্ষেত্রে ভোটারদের এই অনুপস্থিতি যে ভয়ভীতির কারণেই ঘটেছে, সরকারী কিংবা নিরপেক্ষ উৎস থেকে এর কোনো সমর্থন পাওয়া যায় নি। গণভোট কমিশনার দ্ব্যর্থহীনভাবে উপসংহার টানেন–

> সন্ত্রাস সৃষ্টির ঘটনা, যদি আদৌ কোথাও ঘটে থাকে, তাহলে তা দু'একটি এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিলো এবং গণভোটের এই ফলাফল, দু'টি ভিন্ন পক্ষের সমর্থকদের তুলনামূলক ক্ষমতার পরিষ্কার প্রতিচ্ছবি।[৫৮]

লেঃ কর্ণেল সি. গিয়ার্সনের নেতৃত্বে গঠিত ভাইসরয়ের প্রতিনিধি পরিষদের প্রতিবেদনে কংগ্রেস ও আসামপন্থীদের অভিযোগ খণ্ডন করা হয় এবং দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করা হয় যে, "গণভোট অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ভোটারদের ভোট প্রদানে কোনো বাধার সৃষ্টি হয়নি।" পিয়ার্সন দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, সরকারী সদস্যবৃন্দ, বিশেষ করে স্বরাষ্ট্র–মন্ত্রী কর্তৃক সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতিতে গণভোটকে 'প্রহসন' আখ্যা দেয়া উচিৎ হয়নি। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন যে, "কোথাও আইন–শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেনি এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে সেনাবাহিনী ও পুলিশের ভূমিকা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ছিলো।"[৫৯] হবিগঞ্জের অধিবাসী–জেলা পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট ডি. সি. দত্ত জানান যে, "আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সন্তোষজনকভাবে রক্ষা করা হয়।"[৬০] ভাইসরয় আসামের গভর্ণরকে, সিলেট গণভোট পরিচালনা, গভর্ণরের ও তাঁর

অফিসারদের 'বিরাট কৃতিত্ব' বলে উল্লেখ করে অভিনন্দন জানান এবং এ ব্যাপারে স্বীয় আস্থা ও সন্তোষ জ্ঞাপন করে বলেন, "এ ধরনের পরিস্থিতিতে অভিযোগ আসাটাই যে বেশী স্বাভাবিক তা আমি জানি এবং যতদূর আমি বিচার করতে পেরেছি, তাতে দেখেছি গণভোট দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার সাথে পরিচালনা করা হয়েছে।[৬১]

সিলেটে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ

বেঙ্গল বাউন্ডারি কমিশন ১৬–২৪ জুলাই, ১৯৪৭ পর্যন্ত কলিকাতায় বাংলার সীমানা চিহ্নিতকরণের জন্য উন্মুক্ত বৈঠকে মিলিত হয়। বাংলার উপর কার্যবিবরণী তৈরী শেষ হলে সিলেট প্রশ্নে আগ্রহী পক্ষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত স্মারকলিপি ও তাদের প্রতিনিধিদের শুনানির জন্য ৪–৬ আগস্ট, ১৯৪৭ পর্যন্ত কমিশনের গণবৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্য যুক্তি উপস্থাপনকারী ভূমিকায় একদিকে ছিলেন পূর্ববাংলা সরকার এবং আসামের প্রাদেশিক ও সিলেট জেলা মুসলিম লীগ প্রতিনিধিবর্গ এবং অপরদিকে ছিলেন আসামের প্রাদেশিক সরকার এবং আসামের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও আসামের প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা।[৬২]

কমিশনের সদস্যবর্গের মধ্যে বিচার্যবিষয়ের পরিধি সম্পর্কে প্রথমেই মতবিরোধ দেখা দেয়। চেয়ারম্যানের বক্তব্য থেকে জানা যায়, কমিশনের দু'জন সদস্য এই অভিমত পোষণ করেন যে, কমিশনকে "পূর্ববাংলার সন্নিহিত হিসেবে বর্ণিত হতে পারে আসামের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এমন এলাকাসমূহ আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে পূর্ববাংলার সঙ্গে যুক্ত করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।" 'আসামের সন্নিহিত জেলাসমূহ' বলতে তাঁরা ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন 'পূর্ববাংলার সঙ্গে সন্নিহিত আসামের যে কোনো জেলা।' অন্য দু'জন সদস্য যুক্তি দেখান যে,

> আসাম থেকে এলাকা বিচ্ছিন্ন করে তা পূর্ববাংলার সাথে যুক্ত করার ক্ষেত্রে কমিশনের ক্ষমতা সিলেট জেলা এবং আসামের অন্যান্য জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা (যদি থাকে) যা সিলেটের সন্নিহিত, তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।[৬৩]

মতবিরোধ এতো প্রবল ছিলো যে, বিষয়টি সম্পর্কে চেয়ারম্যানের নির্ণায়ক ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। চেয়ারম্যান অভিমত পোষণ করেন যে, শেষোক্ত ব্যাখ্যাটিই সঠিক, যেহেতু তা বিচার্য বিষয়ের মধ্যে ব্যবহৃত শব্দের 'স্বাভাবিক অর্থের' সঙ্গে বেশ সংগতিপূর্ণ এবং 'আসামের সন্নিহিত জেলাসমূহ' বলতে যা সিলেট সংলগ্ন, তার অতিরিক্ত আসামের অন্যান্য জেলাসমূহ বোঝায় না। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মতে প্রশ্নটি সিলেট এবং কাছাড় জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিচার্য–বিষয়ের ব্যাখ্যাদানের ব্যাপারে মাউন্টব্যাটনের আদৌ কোনো অভিপ্রায় ছিল না। তথাপি বিষয়টি যখন তাঁর কাছে প্রেরিত হয় তখন তিনি মতামত দেন যে 'সন্নিহিত' ব্যাপারটি শুধু সিলেটের ক্ষেত্রেই

প্রযুক্ত হওয়া উচিত। তিনি উল্লেখ করেন যে, হিজ ম্যাজেস্টিস গভর্ণমেন্টের অভিপ্রায় হলো "কেবল সিলেটের সাথে সংলগ্ন (জেলাসমূহের) মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাই পূর্ববাংলার কাছে হস্তান্তর করা।"৬৪

পূর্ববাংলা সরকারের পক্ষ থেকে এই যুক্তিও দেখানো হয় যে, "বিচার্যবিষয় এবং ভারতীয় স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭ এর ৩ নং ধারার প্রকৃত ব্যাখ্যা অনুসরণ করে অন্ততঃপক্ষে সমগ্র সিলেট জেলা পূর্ববাংলার কাছে অবশ্যই হস্তান্তর করতে হবে এবং এই দায়িত্ব পালন করা ছাড়া কমিশনের আর কোন করণীয় নেই।" কমিশনের সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে এই যুক্তি অগ্রাহ্য হয়ে যায় এবং চেয়ারম্যান, সদস্যদের সাথে একমত হন। পরিশেষে, কমিশনের সদস্যবর্গ এই মর্মে সর্ব সম্মত উপসংহারে পৌছান যে, তাঁদের দায়িত্ব হলো মুসলিম ও অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে 'পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের মধ্যে সিলেট ও তৎসন্নিহিত আসামের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা ভাগ করে দেওয়া' - তবে সেই সাথে 'অন্যান্য কারণ'ও বিবেচনার মধ্যে থাকবে।৬৫

তবে, কমিশনের সদস্যবর্গ সীমানা লাইন কিভাবে টানা হবে সে ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌছাতে ব্যর্থ হন এবং এ ব্যাপারে র‍্যাডক্লিফ বলেন, তাঁরা তাঁদের বিরোধসমূহ আলোচনার পর 'আমাকে আমার রায় প্রদানের আমন্ত্রণ জানান।'৬৬

সিলেট জেলার থানার সংখ্যা ছিলো ৩৫ (পঁয়ত্রিশ)টি। এরমধ্যে ১৯৪১ সালের আদমশুমারি অনুসারে ৮ (আট) টিতে ছিলো অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা। এই আটটির মধ্যে সাল্লা (সুনামগঞ্জে) এবং আজমিরিগঞ্জে (হবিগঞ্জে) মুসলিম ও অ-মুসলিম জনসংখ্যা ছিলো প্রায় সমান সমান। থানা দুটির অবস্থান ছিলো ময়মনসিংহের দিকে সিলেটের পশ্চিম সীমান্তে এবং পুরোপুরি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার একেবারে মাঝখানে। অন্য ছয়টি অ-মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ থানা - শ্রীমঙ্গল, কামালগঞ্জ, কুলাউড়া, বরলেখা, পাথরকান্দি ও রাতাবাড়ি-ছিলো দক্ষিণ সিলেট এবং করিমগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত। ৫,৩১,৮১৭ জন লোক সংখ্যা অধ্যুষিত থানাগুলির অবস্থান ছিলো সিলেট জেলার দক্ষিণ সীমান্ত জুড়ে একই লাইনে। তবে থানাগুলি আসামের কোনো অংশের সংগে সন্নিহিত ছিলো না। নিচে প্রদর্শিত সারণী-২ এ দেখা যাবে ৫,১৫,১৫৪ লোকসংখ্যা অধ্যুষিত দক্ষিণ সিলেটে বাস্তবিক পক্ষে অ-মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিলো ৩৯,৬৩২ জনের এবং অন্যদিকে ৫,৬৮,২২৮ লোকসংখ্যা অধ্যুষিত করিমগঞ্জের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিলো ৫৫,৫৩৪ জনের।৬৭

সারণী-২

মহকুমা	থানা	মোট লোকসংখ্যা	মুসলমান	অ-মুসলমান
সুনামগঞ্জ	সাল্লা	৩৭,১৩৭	১৩,৪৩১	২৪,৫০৬
হবিগঞ্জ	আজমিরিগঞ্জ	৪৬,২৯৭	২৩,১২৯	২৩,১৬৮
দক্ষিণ সিলেট	শ্রীমঙ্গল	৭৯,২৬০	২২,০০০	৫৭,২৬০
	কামালগঞ্জ	৮৬,৭০৮	৩৩,৯২৫	৫২,৭৮৩
	কুলাউড়া	১,৪৬,০০৬	৬৯,৯৪৭	৭৬,০৫৯
	রাজনগর	৭৯,৫৫৯	৪৩,২৪৭	৩৬,৩১২
	মৌলবীবাজার	১,২২,৮৩৭	৬৮,৫৩১	৫৪,৩০৬
	রেলওয়ে এলাকা	৭৮৪	১১১	৬৭৩
	মোটঃ	৫,১৫,১৫৪	২,৩৭,৭৬১	২,৭৭,৩৯৩
			(৪৬.১১%)	(৫৩.৮৯%)

করিমগঞ্জ	বরলেখা	৮১,৪৫৬	৩৯,২৫০	৪২,২০৬
	পাথরকান্দি	৭০,৭৮৮	২৭,৬৬৪	৫৩,১২৪
	রাখাবাড়ি	৬৭,৫৯৯	২৪,৭৩০	৪২,৮৬৯
	বিয়ানিবাজার	১,০০,৮৯৯	৭০,৬৯০	৩০,২০৯
	করিমগঞ্জ	২,০২,৩৪১	১,৩৩,৭৩৩	৭৮,৬০৮
	বদরপুর	৪৬,৬৭২	২৫,২২৮	১৭,৪৪৪
	রেলওয়ে এলাকা	২,৪৭৩	৫৮৬	১,৮৮৭
	মোটঃ	৫,৬৮,২২৮	৩,১১,৮৮১	২,৫৬,৩৪৭
			(৫৪.৮৯%)	(৪৫.১১%)

কাছাড় জেলার একটি থানা–হাইলাকান্দিতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিলো, এবং তা ছিলো সিলেট জেলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ থানা বদরপুর ও করিমগঞ্জের সংগে সংলগ্ন। এই থানাটি এবং এর অব্যবহিত দক্ষিণে কাটলিছড়া থানা নিয়ে গঠিত ছিলো হাইলাকান্দি মহকুমা। সারণী – ৩ অনুসারে দেখা যাবে সামগ্রিকভাবে এই মহকুমার মোট লোকসংখ্যার মধ্যে ৫১.৬২% ভাগ

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিলো। চেয়ারম্যানের বক্তব্য অনুযায়ী স্বাভাবিক যাতায়াত ব্যবস্থার জন্য কাটলিছড়া সম্পূর্ণভাবে হাইলাকান্দির উপর নির্ভরশীল ছিলো এবং এ কারণেই মহকুমাটির একটি অখণ্ড প্রশাসনের অধিক্ষেত্রের অধীনে থাকা জরুরী হয়ে পড়ে।[৬৮] সন্দেহ নেই, হাইলাকান্দি মহকুমাকে আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে পূর্ব বাংলার সঙ্গে যুক্ত করাটা মুসলমানদের নিকট অত্যন্ত প্রত্যাশিত ছিলো।

সারণী - ৩

থানা	মোট লোকসংখ্যা	মুসলিম	অমুসলিম
হাইলাকান্দি	১,২৩,১৮৩	৬৭,৫৪৬	৫৫,৬৩৭
কাটলিছড়া	৪৩,১৭৬	১৮,৩৯১	২৪,৭৮৫
রেলওয়ে এলাকা	১৭৭	২৬	১৫১
	১,৬৬,৫৩৬	৮৫,৯৬৩	৮০,৪৭৩
কাছাড় জেলার হাইলাকান্দি মহকুমা		(৫১.৬২%)	(৪৮.৩৮%)

এছাড়া, চেয়ারম্যান, আসাম সরকারের শেষ মুহূর্তের একটি পত্রও বিবেচনা করেন। পত্রে বলা হয়, খাসি পাহাড় (সিলেটের উত্তরে) থেকে যে রাস্তাটি কাছাড় ও লুসাই পাহাড় (পূর্ব ও দক্ষিণে) পর্যন্ত গেছে তা সিলেটের উত্তর প্রান্তকে বেষ্টন করে রেখেছে এবং গভর্ণরের বক্তব্য অনুযায়ী, রাস্তাটি এই দুই জেলার সংগে আসামের যোগাযোগের বর্তমানে একমাত্র উপায় এবং দুর্গম পাহাড়ি ভূমির মধ্য দিয়ে অতঃপর আরেকটি বিকল্প রাস্তা তৈরী করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য এবং ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে পড়বে। গভর্ণর তাঁর ব্যক্তিগত মতামতসহ উপসংহারে বলেন,

> রাস্তাটি আসামের যাতায়াত ব্যবস্থার জন্য এতো গুরুত্বপূর্ণ যে, যদি সরকারের অনুরোধ সীমানা কমিশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক গৃহীত হয় তাহলে আমি আমার মন্ত্রীবর্গকে এর বদলে সিলেট জেলার কিছু অংশের উপর তাঁদের দাবী ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে বুঝাতে সক্ষম হবো।[৬৯]

র‍্যাডক্লিফ তাঁর রোয়েদাদে উল্লেখ করেন যে, মানচিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় গণভোটের ফলাফলের ভিত্তিতে যদি এলাকা ভাগ করা হয় তাহলে তা প্রশাসনিক সমস্যার সৃষ্টি করবে এবং এর ফলে জেলাগুলির ভবিষ্যৎ কল্যাণ ও সমৃদ্ধি ব্যাহত হবে। করিমগঞ্জ (সিলেট) এবং হাইলাকান্দি (কাছাড়) মহকুমার উপর মুসলমানদের দাবী যদি স্বীকৃত হয়, তাহলে সিলেটের ছ'টি অ-মুসলিম থানা আসামের বাকি অংশ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, এবং আসামের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের যোগাযোগের জন্য দুর্গম সংরক্ষিত বনাঞ্চল এবং লুসাই পাহাড় অতিক্রম করা ছাড়া আর কোনো পথ থাকবে না। অন্যদিকে, থানাগুলি যেভাবে পূর্ব থেকে পশ্চিমে লম্বালম্বি আছে তাতে সেগুলোকে যদি সিলেট থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় তাহলে সিলেটের ভেতরকার রেল লাইনও

অদ্ভুতভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং সিলেট শহরে যাওয়ার জন্য যে রেলওয়ে জংসন (কুলাউড়া) তা পূর্ব বাংলায় না থেকে আসামের মধ্যে পড়বে।[৭০]

অতঃপর, এই পরিস্থিতিতে, চেয়ারম্যানের বক্তব্য অনুযায়ী, একটি কার্যকর সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য কিছু এলাকা বিনিময় করার প্রয়োজন দেখা দেয়। তিনি বলেন, এর দ্বারা "কিছু অমুসলিম থানা অবশ্যই পূর্ব বাংলার মধ্যে যাবে এবং কিছু মুসলমান এলাকা এবং হাইলাকান্দি অবশ্যই আসামের মধ্যে থাকতে হবে।"[৭১] তদনুসারে, দক্ষিণ সিলেট এবং করিমগঞ্জ মহকুমার অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ (শ্রীমংগল, কামালগঞ্জ, কুলাউড়া ও বরলেখা) থানার বিনিময়ে সিলেট জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার মুসলিম অধ্যুষিত থানা করিমগঞ্জ ও বদরপুর এবং অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ থানা পাথরকান্দি ও রাতাবাড়ি এবং তৎসহ কাছাড়ের হাইলাকান্দি মহকুমা আসামকে প্রদান করা হয়। এভাবেই বেঙ্গল বাউন্ডারি কমিশনের রোয়েদাদে করিমগঞ্জ, বদরপুর (মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ), পাথরকান্দি ও রাতাবাড়ি (অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ) থানা বাদে সমগ্র সিলেট জেলাকে আসাম প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নতুন প্রদেশ পূর্ববাংলার সংগে যুক্ত করা হয়। আসামের আর কোনো অংশ পূর্ব বাংলাকে দেয়া হয়নি।[৭২]

রোয়েদাদের সমালোচনা

যে নীতির ভিত্তিতে সীমানা চিহ্নিত করা হয়–আসামকে সিলেট ও কাছাড়ের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা প্রদান করায় সে নীতি লংঘিত হয়। সীমানা কমিশনের বিচার্য বিষয়ের নিয়ন্ত্রক দুটি মূলনীতি ছিলোঃ (১) সন্নিহিত মুসলিম ও অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা বিভক্ত করা, এবং (২) বড় একটি এলাকায় বসবাসকারী এক সম্প্রদায়কে অন্য সরকারের অধীনে বাস করতে বাধ্য না করা। এটা করতে গিয়ে বিচার্য বিষয়ের 'অন্যান্য কারণ', প্রধান নীতি সমূহের সাথে কেবল গৌণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে, না হলে তা এই দুই অপরিহার্য নীতিকে লংঘন করবে। সন্নিহিত মুসলমান ও অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নির্ধারণ করার জন্য 'সন্নিহিত' বলতে কি বুঝায় সে ব্যাপারে তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিলো। যেহেতু মুসলিম লীগ তখন মাউন্টব্যাটেন ও কংগ্রেসের সাথে দরকষাকষিতে দারুণ অসুবিধাজনক অবস্থায়, সেজন্য লীগ হাইকম্যান্ড কর্তৃক বিচার্য বিষয়ে সন্নিহিত এলাকা বলতে কি বুঝায় তা স্পষ্ট করে নেয়ার প্রয়োজন ছিলো, যাতে সন্নিহিত মুসলমান ও অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নির্ধারণ করার ব্যাপারে কোন মতদ্বৈততার প্রশ্ন না আসে। কিন্তু জিন্নাহ এবং লীগ হাইকম্যান্ড, 'একেবারেই কোনো পাকিস্তান নয়' এর বদলে অন্ততঃ 'ছাঁটা' কিংবা 'পোকা ধরা পাকিস্তান' হলেও তো পাওয়া গেলো–এই আনন্দে বিচার্য বিষয় গ্রহণের সময় তা স্পষ্ট করার চেষ্টা করলেন না, কোনরূপ আপত্তি ছাড়াই নেহেরু কর্তৃক প্রস্তাবিত ভাষ্য মেনে নিলেন। আর এভাবেই র‍্যাডক্লিফ, করিমগঞ্জ মহকুমার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা (৫৫,৫৩৪ জনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা) এবং কাছাড়ের হাইলাকান্দি মহকুমা আসামকে প্রদান করে

'সংখ্যাগরিষ্ঠতা' এবং 'সন্নিহিত' নীতি সম্পর্কে চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করলেন। যেহেতু অ-মুসলিম থানাগুলি আসামের সন্নিহিত ছিলোনা এবং মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা দিয়ে সম্পন্ন আবদ্ধ ছিলো, সেজন্য স্থানীয় কারণ সমূহের ভিত্তিতেই সিলেটের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার সাথে প্রশ্ন না তুলে পূর্ব বাংলার সাথে সংযুক্ত করা যুক্তিসংগত ছিল। এ ব্যাপারে এগুলির বিনিময়ে মুসলিম অধ্যুষিত করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি মহকুমা আসামকে দিয়ে আসামের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের যোগাযোগ নিশ্চিত করার প্রশ্নই ছিলো না। র‍্যাডক্লিফ কথিত 'আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি এবং রায় দিচ্ছি' প্রসংগটি ছিলো খুশি মতো সিদ্ধান্ত এবং তা মূলনীতি ও বিচার্য-বিষয়ের পরিপন্থী। যদি করিমগঞ্জ মহকুমার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ থানাগুলি এবং সেইসাথে হাইলাকান্দি মহকুমা সিলেট থেকে বিচ্ছিন্ন না করা হতো তাহলে পরিণামে ত্রিপুরা রাজ্য পাকিস্তানের সংগে যুক্ত হতে বাধ্য হতো। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, আসামের সাথে ত্রিপুরার যোগাযোগহীনতার কারণে ত্রিপুরার মহারাজা-পূর্ববাংলায় যাঁর অনেক সম্পত্তি ছিলো- সত্যি সত্যিই পাকিস্তানের সাথে যোগ দেয়ার জন্য লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদ প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি মত পাল্টান এবং ভারতের সাথে যোগ দেন।[৭৩]

রোয়েদাদ প্রকাশ

বেঙ্গল বাউন্ডারি কমিশনের রিপোর্ট (রোয়েদাদ, তারিখ ১২ আগষ্ট, ১৯৪৭), সিলেট জেলা ও তৎসন্নিহিত আসামের জেলাসমূহ সম্পর্কিত রিপোর্ট (তারিখ ১৩ আগষ্ট, ১৯৪৭)- ১৫ আগষ্টের বেশ আগেই প্রকাশের কথা ছিলো, যাতে করে বিভক্ত প্রদেশদ্বয়ের উভয় পক্ষই তাদের প্রশাসনিক ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা গুছিয়ে নিতে সময় পায়। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন অবশ্য ১৫ আগষ্টের আগে রোয়েদাদ প্রকাশের পক্ষপাতী ছিলেন না এবং তিনি নেহেরু এবং জিন্নাহকে 'রোয়েদাদ প্রকাশের সময় ও পদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য' ১৬ আগষ্টে একটি সভা অনুষ্ঠানের পরামর্শ দেন।[৭৪] অতঃপর, হিজ ম্যাজেস্টিস গভর্ণমেন্টের ঘোষণার ভিত্তিতে ভাইসরয়, রোয়েদাদের প্রকাশ ও বাস্তবায়ন স্থগিত সাপেক্ষে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা সরকারকে, মুসলমান ও অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্ভর 'ধারণাগত সীমানা' (Notional boundary) পর্যন্ত দায়িত্ব গ্রহণের নির্দেশ দেন। তদনুসারে, সমগ্র সিলেট জেলা ১৪ আগষ্টে সাময়িকভাবে পূর্ববাংলা সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয় এবং করিমগঞ্জের চারটি থানাসহ সকল থানায় পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলিত হয়। করিমগঞ্জের চারটি থানা-যা রোয়েদাদে আসামকে দেয়া হয়, তা পরে আসামের কাছে বদলি করা হয়।

সিলেট ভাগের অনিয়মগুলো ১৮ আগষ্ট, ১৯৪৭ তারিখে রোয়েদাদ প্রকাশিত হওয়ার পরপরই প্রকট হয়ে দেখা দেয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার সকল মানুষ যারা পাকিস্তানের পতাকা

তুলেছিলো এবং পাকিস্তানের অভ্যুদয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছিলো, তাদের অনেকে ১৮ আগস্টের সকালে তাকিয়ে দেখলো, তারা এখন ভারতে।

রোয়েদাদ, পাকিস্তান ও ভারত উভয় দেশের সংবাদ পত্রে, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কৃর্তক নিন্দিত হয়। লীগ নেতৃবৃন্দ রোয়েদাদকে 'অন্যায়, অভাবনীয়' বলে আখ্যা দেন এবং বলেন, এটি 'বৈধ রোয়েদাদ নয় বরং একটি রাজনৈতিক রোয়েদাদ'[৭৫]।

ভারত সরকার এই রোয়েদাদকে 'কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসন্তোষজনক এবং যুক্তিহীন' বলে বর্ণনা করে বলেন, 'বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে এটি গ্রহণ করা হলো', এবং 'পরবর্তীকালে কোনো সুবিধাজনক সময়ে তা সংশোধন করে নেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।'[৭৬] ব্যাপক সমালোচনা অবশ্য খুব শীগগীরই উভয় দেশের মোহাজের সমস্যার মধ্যে চাপা পড়ে যায়।

উপসংহারঃ

উপমহাদেশকে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি দেশে বিভক্ত করার উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ এর ৩রা জুন, বৃটিশ সরকার ঘোষিত মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনার অপরিহার্য পরিণতি ছিলো সিলেটের গণভোট। পরিকল্পনায় উল্লিখিত হয় যে, যদি বাংলাকে ভাগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, সেক্ষেত্রে সিলেট জেলা আসামের অংশ হিসেবে থেকে যাবে, না নতুন প্রদেশ পূর্ব বাংলার অন্তর্ভুক্ত হবে তা নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে গভর্ণর জেনারেলের তত্বাবধানে সিলেটে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। এ ব্যাপারে আরো উল্লিখিত হয় যে, গণভোটের ফলাফল যদি পূর্ববাংলার মধ্যে সিলেটের অন্তর্ভূক্তির পক্ষে যায় তাহলে স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের সভাপতিত্বে বাংলার জন্য গঠিত সীমানা কমিশন, সিলেটের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাসমূহ ও তৎসন্নিহিত অন্যান্য জেলাসমূহের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার সীমানা চিহ্নিত করবে এবং তার ভিত্তিতে নির্ধারিত এলাকাসমূহ পূর্ববাংলাকে প্রদান করা হবে।

বিভিন্ন আলোচনাসূত্রে দেখা যায় যে, আসামের গভর্ণরের সংগে পরামর্শক্রমে ভাইসরয় গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য আইনগত কাঠামো জারী করেন এবং গণভোট কমিশনার নিযুক্ত করেন। গভর্ণর, গণভোটের ব্যাপারে আসামের কংগ্রেস মন্ত্রীসভার কার্যকলাপের বিরুদ্ধে মুসলীম লীগ আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী ৬-৭ জুলাইয়ে সিলেটে গণভোটের আয়োজন করেন। সিলেট জেলা ২,৩৯,৬১৯ - ১,৮৪,০৪১ ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পূর্ববাংলার সংগে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

শেষের অধ্যায় হলো, গণভোটের ফলাফল প্রকাশ এবং গণভোট পরিচালনার ব্যাপারে কংগ্রেস আনীত অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগ প্রত্যাখ্যান। মুসলিম লীগ কর্তৃক আসামের গভর্ণর ও

আসাম সরকারের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে শিলং আগাগোড়াই নিরপেক্ষ থেকেছে।

গণভোটের রায় বাস্তবায়নের সময় সীমানা কমিশনের সদস্যবৃন্দ নিজেরাই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন। তখন কমিশনের চেয়ারম্যান 'রোয়েদাদ' আকারে নিজস্ব সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করে মুসলিম অধ্যুষিত করিমগঞ্জ মহকুমার করিমগঞ্জ, বদরপুর, পাথরকান্দি ও রাতাবাড়ি থানা বাদ রেখে বাকি সিলেট জেলা আসাম থেকে আলাদা করে পূর্ব বাংলাকে প্রদান করেন। অথচ গণভোটের ফলাফলকে যদি পুরোপুরি মেনে চলা হতো তাহলে সম্পূর্ণ সিলেট জেলা এবং কাছাড় জেলার মুসলিম অধ্যুষিত হাইলাকান্দি মহকুমা পূর্ববাংলার অন্তর্ভূক্ত হতে পারতো এবং ত্রিপুরা রাজ্য পাকিস্তানের সংগে যুক্ত হতে বাধ্য হতো।

তথ্য নির্দেশ

1. Statement by His Majesty's Government, 3 June 1947. *India office Records (IOR), R/3/1/157*-File No. 1446 (17)/GG/43-Boundary Commissions, 1947, pp. 1-4.
   For details, see *The Transfer of Power, 1942-47*, Vol. XI; The Mountbatten Viceroyalty, Announcement and Reception of the 3 June plan (31 May - 7 July 1947), London: Her Majesty's Stationery Office, 1982, pp. 89-94.
2. In the Census of 1872, Sylhet was a district of Dacca Division, and the Muslims constituted 49.67% (854, 131 Muslims) out of a total population of 1,719,539. By 1941 the percentage of Muslims increased to 60.7% out of a total population of 3,116,602. H. Beverly, *Report on the Census of Bengal 1872*, Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1872, pp. 12-13; *Census of India*, 1941, Vol. IX, Assam, Delhi: Manager of Publications, 1942, pp. 24, 36.
3. Jinnah to Lord Pethic-Lawrence, 12 May 1946. The *Transfer of Power, 1942-47*. Vol. vii: The Cabinet Mission, London; HMSO, 1978, pp. 516-517 and 529.
4. Maulana Abul Kalam Azad to Lord Pethic-Lawrence, 12 May 1946 *ibid.*, p. 519.
5. Cabinet Delegation to Prime Minister and India Oftfice, 12-13 May 1946, *ibid.*, pp. 528-30.
6. Statement by Cabinet Delegation and the Viceroy, 16 May 1946, *ibid.*, pp. 584-85.
7. *Ibid.*, Vol. XI, pp. 89-94 and *R/3/1/157*,pp. 2-3.
8. Viceroy to the Secretary of State (for India), 9 June 1947, *R/3/1/157*, p. 4.
9. Nehru to Lord Mountbatten, 12 June 1947, *ibid.*, pp. 12-14. Extracts from Notes of Viceroy's 18th Misc. meetting with the Congress and League leaders held on 13 June 1947, *ibid.*, pp. 18-20. Viceroy's Interview No. 146, *The Transfer of Power*, Vol. XI, p. 234.
10. Nehru to Lord Mountbatten, 12 June 1947, *ibid*, pp. 12-14.
11. Governor of Assam to the Viceroy, 23 June 1947, *L/3/1/157*, p. 38.
12. Extracts from Minutes of Viceroy's 47th staff meetting held on 25 June 1947, *ibid.*, pp. 43-46.
13. Nehru to Lord Mountbatten, 15 June 1947; and Jinnah to Lord Mountbatten, 24 June 1947, *R/3/1/157*, pp. 24 and 47.
14. *Ibid.*, pp. 89-90; and *The Statesman*, 1 July 1947.

15. *The Statesman*, 5 July 1947. For details of the composition of the Boundary Commission, acceptance of the terms of reference and the selection of the Chairman, see S. A. Akanda "The Bengal Boundary Commission and the Radcliffe Award, 1947", *Bangladesh Historical Studies*, Vol. VII, 1983. pp 55-65
16. Governor of Assam to Viceroy, Telegram No. 841-C, 11 June 1947, *Ibid.*,p. 6. Governor of Assam to Viceroy, Telegram No. 144 MSG 1679-S, 15 June 1947, *ibid.*, p. 19; Governor of Assam to Viceroy, Telegram No. 377/47/26, 1801- S, 23 June 1947, *ibid.*, p. 39; Akbar Hydari to Mountbatten, Fornightly Report, 23 June 1947, *ibid.*, p. 39A.
17. Announcement by the Governor-General, 16 June 1947, *ibid.*, pp. 28-29; *The Statesman*, 17 June 1947.
18. *The Statesman*, 21 June 1947.
19. Report of Lt. Col. Mohinder Singh Chopra, as Annexure C to Referendum Commissioner H. C. Stork's report, *R/3/1/1558*, pp. 114-15.
20. Lt. Col. Chopra, op. cit., p. 117. Also see *The Azad, Morning News* 3 - 7 July 1947.
21. *Dawn*, 28 June 1947. Also see R/3/1/158, pp. 48-49.
22. *The Statesman*, 26 June 1947.
23. Jogendra Nath Mandal, Law member in the Interim Cabinet (as League nominee), while touring Sylhet to address the schedule castes on the subject of referendum, informed the Viceroy that, according to a telegram from Salare -Suba, Bengal, the Muslim National Guards had been attacked in the train between Kulaura and Sylhet on 3 July by the tea-garden labourers with lathis and arrows instigated by the Communist and Congress workers. Jogendra Nath Mandal to Viceroy. Telegram, 4 July 1947, *R/3/1/158*. pp. 61- 62 and 68.
24. *Dawn*, 28 June 1947, also see telegram No. 1622-S from Viceroy to Governor of Assam, 28 June 1947, *ibid.*, pp. 48-52.
25. *ibid.*
26. Viceroy to Governor of Assam, Telegram No. 1622- S, 28 June, 1947, p. 52; and *Dawn*, 28 June 1947. For details also see M. K. U. Molla, "The Sylhet Referendum of 1947: The Delhi - Shillong Dimension" Rafiquddin Ahmed (ed), Bangladesh of Society *Religion and Politics* Chittagong: South Asia Studies group, 1985, pp. 104-119.
27. Extracts from minutes of Viceroy's 48th Staff meetting held on 28 June 1947, *R/3/1/158*, pp. 46-47; and Viceroy to Governor of Assam, Telegram No. 1631- S, 28 June 1947, *ibid.*, p. 53.

28. Governor of Assam to Viceroy, Telegram 1952 - S, No. 151 MSG, 30 June 1947, *ibid.*, p. 54.
29. *Ibid.*
30. Governor of Assam to Viceroy, Telegram No. 152 MSG, 1 July 1947, *ibid.*,pp. 55 - 56.
31. I. D. Scott's file note, 1 July 1947, *ibid.*, pp. 57- 58.
32. Viceroy to Governor of Assam, Telegram No. 1692 - S, 2 July 1947, *ibid.*, p. 59.
33. Lord Mountbatten to Field Marshal Sir Claude Auchinleck, letter No. 1446/20, 2 July 1947, *ibid.*, p. 60.
34. Viceroy to Liaquat Ali Khan, No. 1446 / 20, 4 July 1947, *ibid.*, p. 64.
35. Akbar Hydari to Lord Mountbatten, 23 June 1947, *ibid.*, p. 39A.
36. Report on Sylhet Referendum by H. C. Stork, Referendum Commissioner, dated 26 July 1947, *R/3/1/158*, pp. 101-103.
37. Report by D. C. Dutt, Superintendent of Police, Sylhet, dated 19.7.47. *ibid.*, p. 113.
38. Lt. Col. Mohinder Singh Chopra, "History of the Operation Held in Connection with the Sylhet Referendum, July 1947, *ibid.*, p. 113.
39. *Ibid.*, pp. 115-116.
40. Governor of Assam to Viceroy, letter dated 23 June 1947, *ibid.*, p. 39A.
41. The author was an eye-witness to this while visiting 7 polling stations during polling hours on 6-7 July 1947. Also see Chopra, *op. cit.*
42. H. C. Stork, *op. cit.* , *R/3/1/158*, p. 104.
43. Chopra, *ibid.*, p. 117-18.
44. Governor of Assam to Viceroy, Telegram Conf. 2134-S, No. 157 MSG, 7 July, R/3/1/158, p. 71; Governor of Assam to Viceroy, Telegram, 12 July 1947, *ibid.*, p. 74.
45. Mountbatten to Nehru, 13 July 1974, *ibid.*, p. 83. Viceroy to Governor of Assam, Telegram No. 2000- S, 16 July 1947, *ibid.*, p. 90.
46. For instance, Telegram from Rabindranath Choudhury to Viceroy, Nehru, Patel, Gandhi and Kripalani, n. d. ibid., p. 95C. Letter of confirmation along with post copy to viceroy, 17 July 1947, ibid., p. 95b.
47. Secretary, Sylhet District Referedum Committee to Viecroy, No 6-234, *R/3/1/158*, p. 70.
48. Rabindranath Choudhury to Viceroy, 17 July 1947, *R/3/1/158*. p. 95b.
49. *The Amrita Bazar Patrika*, 8 July 1947.
50. Nehru to Mountbatten, 13 July 1947, *ibid.*, pp. 80-81.
51. Nehru to Governor of Assam. Tel. OTP No. 5483, 13 July 1947, *ibid.*, p. 79a.

52. Mountbatten to Nehru, 13 July 1947, *ibid.*, p. 83.
53. *Ibid.*
54. Hydari to Mountbatten, 11 July 1947, *ibid.*, pp. 73a-b.
55. *Ibid.*, Report, H. C. Stork, ibid., p. 106.
56. Secretary, Governor of Assam, Shillong to Foreign, New Delhi, No. 959/C, 14 July 1947. Personal for Pandit Nehru from Hydari, *ibid.*, pp. 84-85.
57. *Ibid.*, pp. 85-86. Also testimony of Chopra. op. cit. p. 118.
58. *Ibid.*, p. 107.
59. Report, Lt. Col. Pearson, *ibid.*, pp. 109-11.
60. Report, D. C. Dutt, 19 July 1947, *ibid.*, p. 112.
61. Viceroy to Governor of Assam, Telegram No. 2000-S, 16 July 1947. *Ibid.*, p. 92. and letters, 21 July and 10 August 1947. *Ibid.*, pp. 98 and 124.
62. *Report of the Bengal Boundary Commission* relating ro Sylhet District and the adjoining Districts of Assam, New Delhi, 13 August 1947, Appendix III, *L/PO/433*, pp. 309-10.
63. *Ibid.*, p. 317.
64. Proceedings of the Viceroy's 66th Staff meeting held on 2 August 1947, *R/3/1/158.* p. 189.
65. *Report*, Sylhet, *L/ PO/433*, pp. 317-18.
66. Ibid.
67. *Census of India, 1941, vol. IX, Assam*, Delhi: Manager of Publications, 1942, pp. 24-38.
68. Governor of Assam to Viceroy, Telegram No. 175/MSG, 10 August 1947, *R/3/1/157*,p.209.
69. Report, Sylhet, *L/ PO/433*, p. 319.
70. *Ibid.*
71. *Ibid.*, p. 320.
72. *Ibid.*
73. Interview with Hamidul Huq Chowdhury, Counsel for Bengal Provincial Muslim League and Government of East Bengal in 1947.
74. On 9 August Mountbatten was reported to have said that "if he could exercise some discretion in the matter he would much prefer to postpone its appearance until after the independence day itself". Therefore, he wrote to Nehru and Jinnah that he had not yet received all the awards by the time he left for Karachi on 13 August. Alan Campbell Johnson, *Mission with Mountbatten*, London: Robert Hale, 1953, p. 152, and *L/ PO/433*, p. 248.
75. *The Azad, Morning News, Jugaberi, The Ananda Bazar, The Amrita Bazar Patrika*, 17-20 August 1947.
76. Quaid-i-Azam Mohammad Ali Jinnah, *Speeches as Governor-General*, Karachi: Pakistan Publications, 1963, pp. 32-33.

১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনঃ নির্বাচনী কর্মকাণ্ডের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

মোঃ মাহবুবর রহমান

সূচনাঃ

অবিভক্ত বাংলার আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৬ সালে। ১৮ই আগষ্ট ১৯৪৭-এ ঘোষিত "Provincial Legislative Assembly order, 1947" অনুসারে '৪৬-এর নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যগণ ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ থেকে পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যে পরিণত হন। সুতরাং পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ১৯৫২ সালে। কিন্তু উক্ত পরিষদের প্রথম অধিবেশন ১৯৪৮ সালের ১৫ই মার্চ অনুষ্ঠিত হয়েছে এই যুক্তিতে তৎকালীন কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৬১ (২) নং ধারা সংশোধন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচন ১৯৫৩ সালে অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু ১৯৪৯ সালে পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ আসনের উপ নির্বাচনে মুসলীম লীগ প্রার্থী পরাজিত হওয়ায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকার আর কোন নির্বাচন মোকাবিলা করতে ভয় পান।[১] ফলশ্রুতিতে নুরুল আমীন সরকারের অনুরোধক্রমে পাকিস্তান গণপরিষদ "The East Bengal Legislative Assembly (Continuation) Act, 1953" পাশ করার মাধ্যমে পূর্ব-বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের মেয়াদ আরও এক বৎসর বৃদ্ধি করেন। অবশেষে ১৯৫৪ সালের ৮থেকে ১২ই মার্চ উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১। যে পটভূমিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ঃ

ভারত স্বাধীনতা আইন (১৯৪৭) এ উল্লেখিত হয়েছিল যে, পাকিস্তানের সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাপেক্ষে তার অর্ন্তবর্তীকালীন সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করা হবে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী প্রদেশের শাসন বিভাগ ও আইন সভার সুনির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র ছিল। প্রদেশের শাসন বিভাগ ও আইন সভা কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত ছিল। রাজার প্রতিনিধি হিসেবে গভর্ণর প্রদেশের প্রধান শাসনকর্তা ছিলেন। গভর্ণরের কার্য পরিচালনার জন্য একটি মন্ত্রী পরিষদ ছিল। মন্ত্রী সভার সদস্যগণকে প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য হতে হতো এবং তাঁরা আইন সভার নিকট দায়ী থাকতেন। যে সকল ক্ষেত্রে গভর্ণরকে সুবিবেচনায় কাজ করতে হতো কিংবা যে সকল বিষয়ে তাঁর বিশেষ দায়িত্ব থাকতো সে সকল ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে গভর্ণর মন্ত্রীগণের

পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতেন। তবে দেশে জরুরী আইন ঘোষিত হলে কেন্দ্র প্রাদেশিক বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারত।

স্বাধীন পাকিস্তানে শুরু থেকেই কেন্দ্রকে শক্তিশালী করা হয় এবং প্রদেশের উপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ জোরদার করা হয়। প্রদেশের গভর্ণরের নিয়োগদান করতেন গভর্ণর জেনারেল। স্বাভাবতঃই প্রাদেশিক গভর্ণর সবসময় গভর্ণর জেনারেলের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতেন। এমনকি প্রাদেশিক মন্ত্রী পরিষদের গঠন, দায়িত্ব বন্টন, কার্যকাল বিষয়েও গভর্ণরের উপর গভর্ণর জেনারেলের নিয়ন্ত্রণ ছিল। "The Pakistan Provincial Consitution (Third Amendment) Order, 1948"–এর মাধ্যমে প্রদেশের উপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ আরো বৃদ্ধি করা হয়। এতে বলা হয় গভর্ণর জেনারেল যদি মনে করেন যে পাকিস্তান কিংবা এর কোন অংশের শান্তি ও নিরাপত্তা হুমকীর সম্মুখীন হয়েছে, কিংবা এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যাতে প্রাদেশিক সরকার দায়িত্ব পালনে অপারগ সেক্ষেত্রে গভর্ণর জেনারেল উক্ত প্রদেশের সকল ক্ষমতা নিজ হাতে গ্রহণ করতে পারবেন (তবে প্রদেশের হাইকোর্ট এই নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকবে)। ১৯৪৯ সালে PRODA (Public and Representative Offices Disqualification Act) জারীর মাধ্যমে প্রাদেশিক মন্ত্রীদেরকে পরোক্ষভাবে পরাধীন করা হয়। এই আইনে হাইকোর্টের বিচারককে দিয়ে যে কোন সময় যে কোন মন্ত্রীর কাজের তদন্ত করা যেত এবং উক্ত তদন্তে কোন অনিয়ম কিংবা দুর্নীতি চিহ্নিত হলে উক্ত মন্ত্রীকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সকল রকম সরকারী গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা যেত।[২] এর ফলে প্রাদেশিক মন্ত্রীগণ সবসময় কেন্দ্রের অনুগত থাকতেন।

প্রদেশের উপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার আরেকটি মাধ্যম ছিল কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্যবর্গ। প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে তারা অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তাদের চাকরী ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে। ফলে তারা প্রাদেশিক সরকারের আদেশ নিষেধ মানতেন না। ফলে প্রদেশে আমলাতন্ত্র খুব শক্তিশালী হয়ে উঠে। এই আমলাগোষ্ঠীতে বাংলাদেশের কোন প্রতিনিধিত্ব ছিল না। এমনকি ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলা সচিবালয়ে একজন বাঙ্গালী সচিবও ছিলেন না। অবাংগালী সচিবগণ পূর্ববাংলার স্বার্থকে কখনই বিবেচনায় আনতেন না, বাংগালী অফিসারদের সংগেও তারা ভাল ব্যবহার করতেন না, তারা ছিলেন জনবিচ্ছিন্ন।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের অফিসগুলিতে পূর্ব বংগের প্রতিনিধিত্ব ছিল নাম মাত্র। "পররাষ্ট্র দপ্তর ও কুটনৈতিক অফিসগুলিতে সাতজন সহকারী সেক্রেটারীর মধ্যে একজনও পূর্ববংগের লোক নেই। বায়ান্ন জন সুপারিনটেনডেন্টের মধ্যে মাত্র তিনজন এবং দু'শ ষোলজন সহকারীর মধ্যে মাত্র পঁচিশজন পূর্ববংগের অধিবাসী"[৩]

দেশের সামরিক বাহিনীতেও বাংগালীদের প্রতিনিধিত্ব ছিল না বললেই চলে। ১৯৫৬ সালের এক হিসেবে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব ছিল নিম্নরূপঃ[৪]

পদ	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
জেনারেল	১	০
লে. জেনারেল	৩	০
মেজর জেনারেল	২০	১
বিগ্রেডিয়ার	৩৫	০
কর্ণেল	৫০	০
লে. কর্ণেল	১৯৮	২
মেজর	৫৯০	১০

সকল বাহিনীর সদর দফতর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে।

অর্থনৈতিক দিকেও প্রদেশের উপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পায়। যদিও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে আয়ের মুল উৎসসমূহ কেন্দ্রের হাতে দেয়া হয়েছিল, তথাপি উক্ত আয় কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে বন্টনের একটা বিধি ছিল। স্বাধীনতার পর আয়কর পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে যায়। বিক্রয় কর, যা ইতিপূর্বে প্রদেশের হাতে ছিল তা' ১৯৪৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করে। ইতিপূর্বে Jute export Duty এর কমপক্ষে ৫০% পাট রফতানীকারী প্রদেশ লাভ করতো। কিন্তু স্বাধীনতার অব্যাবহিত পরেই ঐ নিয়ম বদলানো হয় এবং প্রদেশ কতভাগ পাবে তা' গভর্ণর জেনারেলের ইচ্ছের উপর ছেড়ে দেয়া হয়।[৫] এ প্রসংগে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীনও গণপরিষদের ১৯৫১-৫২ সালে বাজেট অধিবেশনে পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক করুণ দশার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, পূর্ব বাংলার বাজেট ঘাটতি বছরপ্রতি ৪/৫ কোটি টাকার, কিন্তু এই ঘাটতি প্রশাসনিক ব্যর্থতার জন্য ছিল না, এটা ছিল প্রদেশের আয়ের উৎসসমূহ কেন্দ্রের হাতে নিয়ে নেয়ার কারণে।

১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৫৪-৫৫ সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে পূর্ব-পাকিস্তানে ব্যয় করেছে ৪২ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয়ের পরিমাণ ৭৯০ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। এই সময়ে বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৩৯ কোটি ১২ লক্ষ টাকা-এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ ছিল মাত্র ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। যার ফলে পশ্চিম ও পূর্বের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশাল বৈষম্যের সৃষ্টি হয়।[৬]

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বাজেট বরাদ্দের বৈষম্যের আরেকটি নমুনা নিম্নরূপঃ

> "এবারের (১৯৫১) উদ্বৃত্ত পাক বাজেটে শিক্ষা খাতে কোন প্রদেশের জন্য কত ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাই দেখা যাকঃ করাচী ৪০ লক্ষ-১৪ হাজার, মাথাপিছু ৪ টাকা

৩ আনা ৩ পাই; সিন্ধু ১০ লক্ষ, মাথাপিছু ৩ আনা ৬ পাই; সীমান্ত প্রদেশ ১১ লক্ষ, মাথাপিছু ৩ আনা ৩ পাই, পূর্ব বঙ্গ ৭১ হাজার, মাথাপিছু ১ পাইয়ের তিন ভাগের ১ ভাগ"।[৭]

উপরে উল্লেখিত বিষয়সমূহের সংগে বাংলা ভাষার আন্দোলন পূর্ব বাংলার মানুষের মনে মুসলিম লীগ ও সরকারের প্রতি ক্ষোভ ও অসন্তুষ্টির সৃষ্টি করে পূর্ব বাংলায় অধিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী জোরদার হয়।

এমনি প্রেক্ষাপটে ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।

২. নির্বাচন পদ্ধতিঃ [৮ক]

১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে পাকিস্তান গণপরিষদে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের নির্বাচন সংক্রান্ত বিধি সংশোধন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে,

(ক) নির্বাচন হবে ২১ বৎসর বয়স্ক সকল নাগরিকের প্রত্যক্ষ ভোটে।

(খ) অমুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণ করে, পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা অনুসরণ করা হ'বে।

(গ) পূর্ব বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদের আসন সংখ্যা হবে নিম্নরূপঃ

১। মুসলমান আসন	২৩৭	(৯টি মহিলা আসনসহ)
২। সাধারণ (বর্ণ হিন্দুসহ	৩১	(১টি মহিলা আসনসহ)
৩। তফসিলি জাতি হিন্দু	৩৮	(২টি মহিলা আসনসহ)
৪। বৌদ্ধ	২	
৫। খৃষ্টান	১	
সর্বমোট ঃ	৩০৯	(১২টি মহিলা আসনসহ)[৮খ]

১৯৫১ সালে সেন্সাস রিপোর্টকে ভিত্তি করে আসন বন্টন করা হয়। আনুমানিক ১ লক্ষ ৪০ হাজার অধিবাসীর জন্য একটি আসন নির্দিষ্ট করা হয়। সারণী ১-এ জনসংখ্যা, ভোটার সংখ্যা ও সম্প্রদায় ভিত্তিক আসন বন্টন দেখানো হলো। সমস্ত পূর্ব বাংলা যেখানে মুসলমানদের জন্য ২২৮টি নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করা হয়, সেখানে বর্ণ-হিন্দুদের ক্ষেত্রে ৩০টি এলাকায় ও তফসিলী হিন্দুদের জন্য ৩৬টি এলাকার বিভক্ত হয়। স্বভাবতঃই বর্ণ হিন্দু বা তফসিলী হিন্দুদের নির্বাচনী এলাকা মুসলমানদের নির্বাচনী এলাকার চেয়ে অনেক বড় ছিল।[৯]

সারণী–১ঃ জনসংখ্যা, ভোটার সংখ্যা ও সম্প্রদায়ভিত্তিক আসন বন্টন[১০]

সম্প্রদায়	আসন সংখ্যা	মোট জনসংখ্যা (১৯৫১)	মোট ভোটার সংখ্যা	আসন প্রতি জনসংখ্যা	আসন প্রতি ভোটার সংখ্যা
(ক) মুসলমান	২২৮ সং/ম. ৯	৩,২২,২৬,৬৩২	১,৫১,৫৯,৮২৫ সং/ম ১,৬১,৯৬৬	১,৪১,৩৪৫	৬৬,৪৯০ সং/ম. ১৭,৯৯৬
(খ) সাধারণ (বর্ণ হিন্দুসহ)	৩০ সং/ম. ১	৪২,২৭,৯৮২	২০,৯৫,৩৫৫ সং/ম. ২৫,৭২৬	১,৪০,৯৩৩	৬৯,৮৪৫ সং/ম. ২৫,৭২৬
(গ) তফসিলী হিন্দু	৩৬ সং/ম. ২	৫০,৫২,২৫০	২৩,০৩,৫৭৮ সং/ম. ১৪,৭৮৫	১,৪০,৩৪০	৬৩,৯৮৮ সং/ম. ৭,৩৯৩
(ঘ) বৌদ্ধ	২	৩,১৮,৯৫১	১,৩৬,৪১৭	১,৫৯,৪৭৫	৬৮,২০৯
(ঙ) খ্রীষ্টান	১	১,০৬,৫০৭	৪৩,৯১১	১,০৬,৫০৭	৪৩,৯১১
	২৯৭ + মহিলা ১২	৪,১৯,৩২,৩২৯			

সং/ম. = সংরক্ষিত মহিলা আসনের জন্য মহিলা ভোটার সংখ্যা

মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন ব্যতিরেকে অন্য আসনেও মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতেন। মহিলাদের জন্য যে ১২টি আসন সংরক্ষিত ছিল সে আসন সমূহের নির্বাচনে কেবলমাত্র মিউনিসিপ্যাল এলাকায় মহিলাদের ভোট দানের অধিকার ছিল।[১১] সুতরাং মিউনিসিপ্যাল এলাকায় বসবাসরত মহিলা ভোটারদের প্রত্যেকের ভোট ছিল ২টি করে–১টি নিজ সম্প্রদায়ের মহিলা (সংরক্ষিত) প্রার্থীর জন্য, অন্যটি নিজ সম্প্রদায়ের পুরুষ/মহিলা প্রার্থীর জন্য। মফস্বল এলাকায় (মিউনিসিপ্যালিটির বাইরে) বসবাসরত মহিলা ভোটারের ভোট ছিল একটি–নিজ সম্প্রদায়ের পুরুষ/মহিলা প্রার্থীর জন্য।

১৯৫৩ সালের ১লা জানুয়ারী যাদের বয়স ২১ বৎসর পূর্ণ হয়েছিল তারা ভোটার হওয়ার যোগ্য ছিলেন।[১২] ভোটার তালিকায় অসংখ্য ভুল–ভ্রান্তি ছিল। অনেকের নামই ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এমনকি ঢাকা সিটি মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব সৈয়দ আহমদ রাজা–এর নাম ভোটার তালিকাভুক্ত হয়েছিল না বলে তিনি অভিযোগ করেছিলেন।[১৩] ভোটার তালিকা সম্পর্কে আপত্তি পেশের শেষ তারিখ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দাবীর মুখে ১০ দিন বাড়ানো হলেও আপত্তি পেশের মোট সংখ্যা শতকরা এক ভাগেরও কম ছিল।[১৪] চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয় ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৫৩। মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ১,৯৭,৩৯,০৮৬–এর মধ্যে মহিলা ভোটার ১,০৫,৭১,৯৪৯ জন।[১৫] ১৯৫৪ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে মনোনয়নপত্র গ্রহণ শুরু

হয়। মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ছিল ১৪ই জানুয়ারী ১৯৫৪। মনোনয়নপত্র বাছাই ১৬ই, ১৭ই ও ১৮ই জানুয়ারী (১৯৫৪) এবং মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ছিল ২১শে জানুয়ারী (১৯৫৪)।

৩। নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী দল ও জোটঃ

১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনে মোট ১৬টি দল অংশ গ্রহণ করে।[১৬] মুসলমান আসনে যে সকল দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সেগুলি হচ্ছে, মুসলিম লীগ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক–শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলামী, যুব লীগ, গণতন্ত্রীদল, খেলাফত রব্বানী পার্টি প্রভৃতি। অমুসলমান আসনে যে দলগুলি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে সেগুলির মধ্যে অন্যতম পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস, তফসিলী ফেডারেশন, গণসমিতি, অভয় আশ্রয় (কুমিল্লা), পূর্ব পাকিস্তান সমাজতন্ত্রী দল প্রভৃতি। কমুনিষ্ট পার্টির মুসলমান সদস্যগণ মুসলমান আসনে এবং হিন্দু সদস্যগণ হিন্দু আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। মুসলমান আসনে আওয়ামী লীগ, কৃষক–শ্রমিক পাটি, এবং নেজামে ইসলামী 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন করে সম্মিলিতভাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। হিন্দু আসনের নির্বাচনে গণসমিতি, অভয় আশ্রম ও পূর্ব পাকিস্তান সমাজতান্ত্রিক দল 'সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট' গঠন করে।[১৭]

৩ ক। যুক্তফ্রন্ট গঠনঃ[১৮]

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের পতন ঘটানোর উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক–শ্রমিক পার্টি ও নেজামে এছলামী মিলে 'যুক্তফ্রন্ট' নামক একটি নির্বাচনী আঁতাত গড়ে তোলেন। ইতিপূর্বে ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'মুসলিম লীগ সরকার' বিরোধী একটা রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে 'যুবলীগ' সকল বিরোধী দলের ঐক্য গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে। শুরুতেই 'গণতান্ত্রিক দল' ও 'আওয়ামী লীগ' ঐ উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের নেতৃবৃন্দ ও মুসলিম লীগ বিরোধী জোট গঠন করতে প্রচারাভিযান চালায়। ফলশ্রুতিতে ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে মুসলিম লীগ বিরোধী জোট গঠনের উদ্দেশ্যে সমমনা দলসমূহ নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[১৯]

১৯৫৪ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা জারীর সংগে সংগে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক নির্বাচনী প্রস্তুতি শুরু করেন। ১৯৪৫–৪৬ সালের নির্বাচনে তাঁর দলের ভরাডুবী ঘটলে তিনি রাজনীতি থেকে নির্বাসন গ্রহণ করেন। নুরুল আমীন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ফজলুল হককে পূর্ব বাংলার এ্যাডভোকেট জেনারেল পদে নিযুক্ত করেন। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত তিনি ঐ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৫৩ সালে তিনি পুনরায় রাজনীতি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং

সরকারী চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে তাঁর ১৯৩০ এর দশকের নিজস্ব দল কৃষক প্রজা পার্টিকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং এর নামকরণ করেন কৃষক-শ্রমিক পার্টি (KSP)[২০]। আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রন্ট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করলে তিনি যুক্তফ্রন্টে যোগ দেয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন।

যুক্তফ্রন্টের আরেক শরীকদল-'নিজামে এছলাম'-এর পূর্ব নাম 'জমিয়তে ওলামায়ে এছলাম'। ১৯৫৩ সালের ২৬শে নভেম্বর পূর্বপাক জমিয়ত ওলামায়ে এছলামের দু'দিন ব্যাপী অধিবেশন শেষে তাদের ধর্মীয় সংগঠনটিকে রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত করে এর নাম 'নিজামে এছলাম' রাখা হয়[২১] এবং আসন্ন নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অধিবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, "যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান নিজামে এছলাম ও উহার কার্যক্রম স্বীকার করিয়া নিজামে এছলাম দলের সহিত সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছেন, তাহাদের সহিত 'নিজামে এছলাম দল' 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন করিতে রাজী আছেন!"[২২]

এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার দলের সভাপতি মওলানা আতাহার আলীর উপর অর্পিত হয়। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ভবিষ্যত উজ্জ্বল বুঝতে পেরে নিজামে এছলাম যুক্তফ্রন্টে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[২৩]

অবশেষে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি এবং নিজামে এছলামীর সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়।[২৪]

যদিও যুক্তফ্রন্ট গঠনের মুল উদ্যোক্তা ছিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, গণতন্ত্রীদল ও যুবলীগ, কিন্তু ফ্রন্টের কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও নিজামে এছলামীর নেতৃবৃন্দের বিরোধিতায় এই দলগুলিকে ফ্রন্টভুক্ত করা হয়নি।[২৫] তবে গণতন্ত্রীদল, যুবলীগ ও কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য আওয়ামী লীগের নামে নমিনেশন লাভ করেন। এ প্রসংগে কীথ ক্যালার্ড উল্লেখ করেছেন যে,

> The Ganatantri Dal had alligned itself with the United Front during the campaign and some of its members had secured United Front nominations for Muslim seats. It seems probable that a few members of the communist party also secured United Front nominations although this was not publicly announced.[২৬]

এ প্রসংগে রংগলাল সেন উল্লেখ করেছেন যে, ১৫জন যুবলীগ সদস্য, ১০ জন গণতন্ত্রীদলের সদস্য এবং ১০জন কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য আওয়ামী লীগের পরিচয়ে যুক্তফ্রন্টের নমিনেশন লাভে সমর্থ হয়।[২৭] নাজমা চৌধুরী উল্লেখ করেছেন যে, অনেক বামপন্থী নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন।[২৮]

নির্বাচনে খেলাফতে রব্বানী পার্টিরও ইচ্ছে ছিল 'যুক্তফ্রন্ট'–এর শরীক দল হওয়ার। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫৩ সালের ১৬ই নভেম্বর ঢাকার গোপীবাগ থার্ডলেনে পার্টির সভাপতি জনাব আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রেসিডিয়ামের এক সভায় লীগ বিরোধী সম্মিলিত যুক্তফ্রন্ট গঠনের জন্য কৃষক–শ্রমিক পার্টি ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু খেলাফতে রব্বানী পার্টিকে 'যুক্তফ্রন্ট' ভুক্ত করা হয়নি। অগত্যা এই পার্টি একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, তারা মাত্র ১০টি মুসলিম আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন এবং বাকী ২২৬টি আসনের জন্য রব্বানী পার্টি যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীদের সমর্থন করবেন।[২৯]

৩খ. নির্বাচনে ছাত্র সংগঠন সমূহের ভূমিকাঃ

যুক্তফ্রন্ট গঠনে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল। নির্বাচনী কর্মকাণ্ড শুরু হলে এই দুই সংগঠন 'যুক্তফ্রন্ট কর্মী শিবির' গঠন করে এবং গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত এর শাখা বিস্তৃত হয়। সংগঠকদ্বয়ের সমর্থক ছাত্র কর্মীরা সারা দেশে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করে। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন করার পিছনে মূল কারণ ছিল এই যে, যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার ৯, ১০ এবং ১১ নং দফায় উল্লেখিত দাবীসমূহ ছিল ছাত্রদের স্বার্থ সম্পর্কিত। তাছাড়া '৫২ সালে বাংলা ভাষার দাবীতে ছাত্রবৃন্দ যে আত্মত্যাগ করেছিল ২১ দফার ১ম দফাটি ছিল সে বিষয় সম্পর্কিত। সুতরাং ছাত্রগণের দাবী–দাওয়া বাস্তবায়নের স্বার্থেই তারা যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন জ্ঞাপন করে।[৩০]

অপরপক্ষে সরকারপন্থী ছাত্র সংগঠনটি নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ (All East Pakistan Muslim Student League) মুসলিম লীগকে সমর্থন করে।

৩গ. নির্বাচনে ইসলামী দলসমূহের ভূমিকাঃ

কিছু ইসলামী দল বা সংগঠন এবং ইসলামী ব্যক্তিত্ব নিজেরা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করলেও মুসলিম লীগকে সমর্থন করার কথা ঘোষণা করেন। নীচে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হলো।

৩গ. (১) জমিয়তে হেজবুল্লাহঃ

এটি ছিল একটি ধর্মীয় সংগঠন। নির্বাচন সম্পর্কে এ দলের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ছিল নিম্নরূপঃ

> "জমিয়তে হেজবুল্লাহ আগামী নির্বাচনে স্বতন্ত্র পার্টি হিসাবে প্রার্থী খাড়া করাইবে না বা দল বিশেষকে সমর্থন করিবে না। দ্বিজাতিতত্ত্ব ও নেজামে এছলাম সমর্থক কোন নির্বাচন প্রার্থী জমিয়তে হেজবুল্লাহর 'একরার নামায়' দস্তখত করিলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় উক্ত ব্যক্তির জনসমর্থন ও তাঁহার নিজস্ব যোগ্যতা পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া জমিয়ত তাহাকে সমর্থন করিবে।"[৩১]

কিন্তু নির্বাচন প্রক্রিয়া পুরোদমে শুরু হলে তারা প্রকাশ্যে মুসলিম লীগের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেন। পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে হেজবুল্লাহর সম্পাদক মওলানা আজিজুর রহমান ঘোষণা করেন,

> "পাকিস্তানে আদর্শ এছলামী শাসন কায়েম, জাতীয় সংহতি রক্ষা ও পাকিস্তানের হেফাজতের জন্য দীনদার মুছলমানদের পক্ষে মোছলেম লীগকে সমর্থন করা ছাড়া বর্তমানে শরীয়ত সম্মত অন্য কোন পথ নাই। সুতরাং আসন্ন নির্বাচনে জমিয়তে হেজবুল্লাহ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবেই জাতীয় প্রতিষ্ঠান মোছলেম লীগকেই সমর্থন করিবে।"[৩২]

নির্বাচনের দুই সপ্তাহ পূর্বে এই দল ঘোষণা করে যে, "লীগকে সমর্থন করা ওয়াজেব"।[৩৩]

৩ গ (২) পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র-হেজবুল্লাহঃ

এটি জমিয়তে হেজবুল্লাহর ছাত্রফ্রন্ট। নির্বাচনে এই দলের ভূমিকা সম্পর্কে দলের প্রচার সম্পাদক মওলানা ছাহেব আলী ঘোষণা করেন,

> "....মুসলমানদের একমাত্র খালেছ প্রতিষ্ঠান হিসাবে মুসলিম লীগের স্থান বিরোধী খিচুড়ি দলের অনেক উর্ধ্বে। মরহুম ফুরফুরা ও শর্ষীণার পীর ছাহেবদ্বয় ও হজরত মওলানা আশরাফ আলী থানভী সাহেব প্রমুখ অলী–আল্লাহগণ ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে মুসলিম লীগকে সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।.....জাতীয় বর্তমান সংকট মুহূর্তে মাদ্রাসা ও স্কুল কলেজের দীনদার ছাত্রদের নীরব থাকিলে বা কংগ্রেসী ওলামাদের এ ধারায় ভুল পথে চলিলে দেশ ও জাতির পক্ষে তাহা মারাত্মক হইবে ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। তাই আজ আমি খোলাখুলিভাবে দীনদার ছাত্রদের প্রতি আবেদন করি যে, পাকিস্তানে নেজামে এছলাম কায়েম, জাতীয় সংহতি রক্ষা ও পাকিস্তানকে গুপ্ত শত্রুদের হস্ত হইতে রক্ষা করার জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগকে সমর্থন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।"[৩৪]

৩ গ. (৩) জমইয়াতে তেলাবায়ে আরাবিয়াঃ

এটিও একটি ধর্মীয় সংগঠন। নির্বাচনে সরাসরি অংশ গ্রহণ না করলেও পূর্ব বাংলার ওলামায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে এক আবেদনে এই দলের সম্পাদক মওলানা মোস্তাফিজুর রহমান বলেন,

"আসন্ন নির্বাচনে পাকিস্তানে নেজামে ইছলাম কায়েম করার উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যকার খুটিনাটি মতানৈক্য ভুলিয়া এক কর্মপন্থা অবলম্বন করুন।"৩৫

৩ গ. (৪) জামায়াতে এছলামীঃ

এই দলটি রাজনৈতিক দল হয়েও পাকিস্তানের নির্বাচন ব্যবস্থাকে 'অনৈছলামিক' বলে অভিহিত করে।৩৬ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান জামাতে এছলামীর আমীর চৌধুরী আলী আহমদ খান নির্বাচন পদ্ধতির সমালোচনা করে বলেন যে,

"ইহা দেশে 'অসাধুতার' বিষ ছড়াইতে সাহায্য করিবে। ধর্মনিরপেক্ষতা বর্তমান বিশ্বের সকল অনর্থের মূল।"৩৭

৩ গ. (৫) বিভিন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্বের মনোভাবঃ

শর্ষিণার পীর সাহেব তাঁর অনুসারীদেরকে মুসলিম লীগকে সমর্থনের আহ্বান জানান।৩৮

মহামান্য আগা খান তাঁর পাকিস্তানস্থিত বিভিন্ন কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ও সদস্যবর্গ এবং জামাতের সদস্যগণের নিকট প্রেরিত বাণীতে পূর্ব-বাংলার নির্বাচনে মুসলিম লীগকে সহায়তা করার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি মন্তব্য করেন, লীগ জয়ী না হলে পাকিস্তানে ইসলাম দুর্বল হবে।৩৯

পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে আহলে হাদিসের সভাপতি মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফি তাঁর অনুসারীদেরকে আইন সভার নির্বাচনে মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থীদেরকেই জয়যুক্ত করার প্রচষ্টা গ্রহণের জন্য আবেদন জানান।৪০

এইভাবে আমরা দেখি বিভিন্ন ইসলামীদল ও ব্যক্তিত্ব প্রকারান্তরে মুসলিম লীগকে সমর্থন জানান। তবে এককালের অনেক বিখ্যাত মুসলিম লীগার যে এই নির্বাচনে নিশ্চুপ থাকেন তার প্রমাণ খাজা নাজিমুদ্দীন। নির্বাচনে কোন দলকেই সমর্থন না জানিয়ে তিনি নিশ্চুপ থাকেন। এবং এক সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন যে,

"আমি রাজনীতি হইতে বিদায় লইয়াছি।"৪১

৩ ঘ. নির্বাচনে হিন্দু দল ও জোটঃ

তৎকালীন পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদে অমুসলমান আসনের সংখ্যা ছিল ৭২। এর মধ্যে বৌদ্ধ এবং খ্রীষ্টানদের জন্য নির্দিষ্ট আসন সংখ্যা যথাক্রমে ২ ও ১। নির্বাচনে মুসলমান আসনগুলো মুসলিম লীগ ও যুক্তফ্রন্টের মধ্যে সমানভাবে বিভক্ত হলে কোয়ালিশন সরকার গঠনের জন্য হিন্দু আসনের নির্বাচিত সদস্যদের সমর্থন প্রয়োজন হবে এই বিবেচনায় যুক্তফ্রন্টের ইঙ্গিতে 'সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট' গঠিত হয়। 'সংখ্যা লঘু যুক্তফ্রন্টে'র শরিক দলগুলি ছিল 'গণসমিতি', 'কুমিল্লার অভয়

আশ্রম' এবং পূর্ব পাকিস্তান সমাজতন্ত্রী দল'। 'গণসমিতি' নেতবৃন্দই এই ফ্রন্টকে নেতৃত্ব দেন। 'গণসমিতি' হচ্ছে 'পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস' থেকে বেড়িয়ে আসা নেতা-কর্মীদের সংগঠন। ১৯৪৭-এর পর 'পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস' গঠনের সময় কিছু নেতা 'কংগ্রেস' বাদে অন্য নামে দলগঠনের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তাদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হলে তারা ১৯৪৮-এর জুলাই মাসে 'গণসমিতি' গঠন করেন। এই দলে শুধু কংগ্রেস সদস্যরাই যোগ দেননি, 'সমাজতন্ত্রীদল', 'বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল', 'ফরওয়ার্ড ব্লক' এবং অন্যান্য সংগঠনের কিছু হিন্দু নেতা-কর্মীও যোগ দেন।[৪২]

১৯৪৭ এর পর কংগ্রেস ও গণসমিতি প্রধানতঃ বর্ণ হিন্দুদের সংগঠন ছিল। সে সময় তফসিলী হিন্দুদের সংগঠন ছিল 'তফসিলী জাতি ফেডারেশন' ১৯৪৭ এর পূর্ব এবং পরে এই সংগঠনের নীতি ছিল মুসলিম লীগকে সহযোগিতা করা। ফলস্বরূপ, ১৯৫০ সালে পূর্ব বাংলা সরকারের কেবিনেটে এই দল থেকে দলের প্রেসিডেন্ট মিঃ ডি. এন. বারুই মন্ত্রী নিযুক্ত হন। পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা হবে, না যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা হবে এই ইস্যুতে' ৫৪ এর নির্বাচনের প্রাক্কালে দল বিভক্ত হয়। ডি. এন. বারুই পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধ অংশের নেতৃত্ব দেন মিঃ রসরাজ মণ্ডল। অবশেষে ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে কুমিল্লায় বিরোধী অংশের সম্মেলন হয়। হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী উক্ত সম্মেলনে অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে রসরাজ মণ্ডলের অংশ এবং ডি. এন. বারুইয়ের অংশ পৃথক প্রার্থী মনোনয়ন দেন। নির্বাচনে ডি. এন. বারুইয়ের অংশের ভরাডুবি ঘটে।[৪৩]

৪। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন জোট ও দলের প্রার্থী সংখ্যাঃ[৪৪]

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন জোট ও দলের প্রার্থী সংখ্যা ছিল নিম্নরূপঃ

(ক) মুসলমান আসন (মোট আসন সংখ্যা ২৩৭)

মুসলিম লীগ	২৩৭	
যুক্তফ্রন্ট[৪৫]	২৩৪	
খেলাফতে রব্বানী পার্টি	৫	
স্বতন্ত্র	৫৪২	
মোটঃ-	১০১৮ জন	(মহিলা প্রার্থীসহ)

(খ) অমুসলমান আসন (মোট আসন সংখ্যা ৭২)

পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস-	৩৯[৪৬]	
তফসিলী জাতি ফেডারেশন-	৩২	(ডি. এন. বারুই গ্রুপ)
তফসিলী জাতি ফেডারেশন-	৩৬	(রসরাজ মণ্ডল গ্রুপ)
সংখা লঘু যুক্তফ্রন্ট	- ১৯	
কম্যুনিষ্ট পার্টি	১০[৪৭]	
বৌদ্ধ	১২	
খ্রীষ্টান	১	
স্বতন্ত্র (গণতন্ত্রীদল সহ)[৪৮]	১২৩	
মোটঃ-	২৭২	জন

সারণী–২–এ নির্বাচনে সম্প্রদায় ভিত্তিক প্রার্থী সংখ্যা উল্লেখিত হলো।

সারণী –২ঃ নির্বাচনে সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রার্থী সংখ্যা[৪৯]

সম্প্রদায়	আসন সংখ্যা		বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত		অংশগ্রহণকারী প্রার্থীর সংখ্যা		আসন প্রতি গড় প্রার্থী সংখ্যা	
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
মুসলমান	২২৮	৯	x	x	৯৮৬	৩২[৫০]	৪.৩	৩.৬
অমুসলমান ঃ								
সাধারণ	৩০	১	২	১	১০১	x	৩.৬	x
তফসিলী	৩৬	২	x	১	১৫১	৩	৪.২	৩
বৌদ্ধ	২	x	x		১২		৬	
খ্রীষ্টান	১	x	১		x			
মোট	২৯৭	১২	৩	২	১২৫০	৩৫		

পূর্ব বাংলা প্রথম ব্যবস্থাপক পরিষদের (১৯৪৭–৫৪) ৯৮ জন মুসলিম লীগ দলীয় সাংসদের মধ্যে ৪২ জন মুসলিম লীগের নমিনেশন পান। ৯ জন যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হন। এদের মধ্যে খয়রাত হোসেন (আওয়ামী লীগে যোগদেন) এবং ইউসুফ আলী চৌধুরীর (কৃষক শ্রমিক পার্টিতে যোগদেন) নাম উল্লেখযোগ্য। ৮ জন স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে নির্বাচন করেন। এরা মুসলিম লীগ কিংবা যুক্তফ্রন্টের নমিনেশ লাভে ব্যর্থ হয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হন। ৩৯ জন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেননি।[৫১] নির্বাচনে বিভিন্ন দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পর্কে 'আজাদ' পত্রিকায় কিছু মন্তব্য ছাপা হয়েছিল। উক্ত পত্রিকা থেকে এখানে কিছু উদ্ধৃতি দেয়া হলোঃ

> "....আজাদী লাভের পর পূর্ব বঙ্গে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। অবশ্য অতীতে আর কখনও প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচন এদেশে অনুষ্ঠিত হয় নাই।
>
> এত বেশী সংখ্যক ভোটদাতা আর কখনও ভোটাধিকার প্রয়োগ করে নাই, আর এত বেশী সংখ্যক প্রার্থীও অতীতে কোন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নাই। দুই কোটির অধিক ভোটদাতা এই নির্বাচনে ভোট দিবেন। আর ৩০৯ (৫ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ায় এই সংখ্যা হবে ৩০৪–লেখক) টি আসনের জন্য প্রার্থী দাড়াইয়াছেন মোট ১২৮৫ জন।

পূর্ব বঙ্গের বর্তমান মন্ত্রীদের মধ্যে জনাব হাবিবুল্লাহ বাহার ব্যতীত অপর সকল মন্ত্রীই আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন।".....

".....৩০৪টি নির্বাচন কেন্দ্রে প্রার্থীদের মধ্যে ৪১টি কেন্দ্রে সরাসরি অর্থাৎ মাত্র দুই দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতেছে। এই প্রসংগে দু'টি কেন্দ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্ব বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ও পূর্ব পাকিস্তান মোছলেম লীগের সভাপতি জনাব নুরুল আমিন মোমেনশাহী 'সদর দক্ষিণ পূর্ব' মোছলেম কেন্দ্র হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। এই কেন্দ্রে তাহার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হইতেছেন যুক্তফ্রন্টের মনোনীত জনাব খালেক নওয়াজ খান।

অপরদিকে যুক্তফ্রন্টের নেতা ও অবিভক্ত বাংলার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জনাব এ. কে. ফজলুল হক পিরোজপুর উত্তর পূর্ব মোছলেম কেন্দ্র হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। তাহার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হইতেছেন মোছলেম লীগ মনোনীত জনাব নুর মোহাম্মদ খান। জনাব হক পিরোজপুর পশ্চিমে মোছলেম কেন্দ্র হইতেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। এই কেন্দ্রে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতেছেন মোছলেম লীগের পক্ষ হইতে পূর্ব বঙ্গের সরবরাহ সচিব সৈয়দ মোহাম্মদ আফজল ও স্বতন্ত্র প্রার্থী নুর উদ্দীন আহমদ।

সর্বাধিক সংখ্যক প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন টাঙ্গাইল মোছলেম নির্বাচন কেন্দ্র হইতে। এই কেন্দ্রে মোট ১১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন।"[৫২]

".....মহিলা নির্বাচন কেন্দ্রসমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রার্থী দাড়াইয়াছেন বাখরগঞ্জ মোছলেম মহিলা নির্বাচন কেন্দ্র-এ। এই কেন্দ্রে মোট ৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। সর্বাপেক্ষা কম প্রার্থী দাড়াইয়াছেন ফরিদপুর কাম কুষ্টিয়া কাম যশোর কাম খুলনা মোছলেম মহিলা কেন্দ্রে ও ঢাকা শহর পশ্চিম মহিলা কেন্দ্রে (দুই জন করিয়া)।

মফস্বল এলাকার নির্বাচন কেন্দ্রসমূহে মহিলা প্রার্থীদের পুরুষ ও মহিলা মিশ্র নির্বাচন কেন্দ্র হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার থাকিলেও একজন ব্যতীত অন্য কোন মহিলা এই অধিকার প্রয়োগ করিতে আগাইয়া আসেন নাই। এই শ্রেণীর কেন্দ্র হইতে পূর্ব বঙ্গের একমাত্র মহিলা প্রার্থী হইতেছেন অরুন্ধতী মণ্ডল। তিনি ফরিদপুর উত্তর পশ্চিম তফসিলী নির্বাচন কেন্দ্র হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন।

এবারের নির্বাচনে একজন সাঁওতাল, একজন ধাংগর ও একজন বর্মী প্রার্থীও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। ইহারা হইতেছেন যথাক্রমে সিলেট দক্ষিণ পূর্ব তফসিলী কেন্দ্রের প্রার্থী

জীবন সাঁওতাল, ঢাকা মধ্য তফসিলী কেন্দ্রের প্রার্থী মোহন জমাদার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বৌদ্ধ কেন্দ্রের প্রার্থী মং কিয়াযু....."

৫। বিভিন্ন দল ও জোটের নির্বাচনী ম্যানিফেষ্টো ও প্রচারাভিযানঃ

৫। (ক) মুসলিম লীগঃ

মুসলিম লীগের অন্যতম বক্তব্য ছিল পাকিস্তানের অখন্ডতা ও সংহতি বজায় রাখা, কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিক শক্তিশালী করা, পাকিস্তানের জন্য ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী ঢাকার এক নির্বাচনী সভায় বলেন যে, মুসলিম লীগই একমাত্র দল যা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন অটুট রাখতে সক্ষম।[৫৪]

"খোদা না করুক, সামনের নির্বাচনে যদি অন্য কোন দল নির্বাচিত হয় তাহলে পাকিস্তানের সংহতি বিপন্ন হবে।" পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন বলেন যে, যারা স্বাধীন পাকিস্তানে বিশ্বাস করে না, যারা অখণ্ড ভারতের স্বপ্নদেখে তারা যদি নির্বাচিত হয় তাহলে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে। বাংলা ভাষার প্রশ্নে মুসলিম লীগ চতুরতার আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী এক জনসভায় বলেন যে, যদি পূর্ব বাংলা প্রদেশের জনগণের এই ইচ্ছে হয় যে, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে তাহলে তিনি গণপরিষদে তা সমর্থন করবেন। পূর্ব বাংলার ধর্মপ্রাণ নিরীহ মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য মুসলিম লীগ ধর্মীয় বন্ধনে পাকিস্তানের ঐক্য অটুট রাখার আহ্বান জানান। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ভগ্নি মিস ফাতেমা জিন্নাহ নির্বাচনী প্রচারাভিযানে মুসলিম লীগের পক্ষ নেন। তিনি ভোটারদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জনসভায় বলেন যে, মুসলমান ভোটারদের উচিত কম্যুনিষ্ট ও হিন্দু ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিহত করার জন্য মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থীদের ভোট দেয়া। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর জন্ম দিবস উপলক্ষে এক বেতার বক্তৃতায় পূর্ব বঙ্গবাসীর উদ্দেশ্যে মিস জিন্নাহ বলেন,

'আসন্ন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আপনাদিগকে এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। নির্বাচনের ফলাফলের উপরই পূর্ব বঙ্গের ভবিষ্যত নির্ভর করিতেছে। ভবিষ্যৎ চিন্তা করুন এবং অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টিকারী শক্তি সম্পর্কে সতর্ক থাকুন।[৫৫]

মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন বলেন যে, এই নির্বাচন অনেকটা গণভোটের মত। নির্বাচনের ফলাফলে নির্ধারণ হবে যে, পূর্ব বংগ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত থাকবে, না ভারতভুক্ত হবে।

নির্বাচন উপলক্ষে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে 'আজাদ' পত্রিকায় একটি দীর্ঘ নির্বাচনী ইশতেহার প্রচারিত হয়।[৫৬] উক্ত ইশতেহারের বক্তব্য বিষয় থেকে এই দলের মনোভাব অবলোকন করা সম্ভব।

৫ (খ) যুক্তফ্রন্টঃ

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে (পরিশিষ্ট–'ক'–এ ২১ দফার বিবরণী দ্রষ্টব্য)। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিরোধী যুক্তফ্রন্টের প্রেরণা শক্তি ছিল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। তাই যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী মেনিফেষ্টোতে '৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীর ২১ ফিগারটিকে চিরস্মরণীয় করার অতিরিক্ত উপায় হিসাবে ২১ দফায় কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়। আবুল মনসুর আহেমদ ২১ দফার খসড়া প্রণয়ন করেন।[৫৭]

২১ দফা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী, প্রদেশের জন্য অধিক স্বায়ত্বশাসন ও প্রশাসনে বাংগালীর অধিক সংখ্যক নিয়োগ প্রভৃতি দিক অন্যতম।

তবে ২১ দফার বিশ্লেষণে কিছু বিষয়ের অস্পষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। ১৯৫০ সালে পূর্ব বাংলায় জমিদারী স্বত্ব বিলোপ করে ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমি মালিকানার উচ্চতর সিলিং নির্ধারণ করলেও মুসলিম লীগ সরকার এই সিলিং বাস্তবায়িত করতে পারেননি। কারণ মুসলিম লীগ জোতদার শ্রেণীর সংগঠন ছিল। যুক্তফ্রন্টের অনেক নেতা জোতদার শ্রেণীর ছিলেন। স্বভাবতঃই যুক্তফ্রন্টের ২১ দফায় সিলিং এর কথা উল্লেখ করা হয়নি। তবে ভূমিহীন ভোটারদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য বলা হয় যে, ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে 'উদ্বৃত্ত' জমি বিতরণ করা হবে। পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে যুক্তফ্রন্ট শরিকদলের মতের ভিন্নতা ছিল। ডান পন্থীগণ পশ্চিমা শক্তির সংগে সম্পর্ক ভাল করার নীতিতে বিশ্বাসী হলেও বামপন্থী নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিভংগি ছিল ভিন্ন। ফলে পররাষ্ট্র ব্যাপারে ২১ দফা নিশ্চুপ থাকে।

এতদ্বসত্বেও ২১ দফার দাবীগুলি ভোটারদের মন জয় করে।[৫৮]

৫ (গ) খেলাফতে রব্বানী পার্টিঃ

এই দলের নির্বাচনী ম্যানিফেষ্টোর সারাংশ নিম্নরূপঃ

> পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি ইসলামের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও তামুদ্দনিক আর্দশের প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা; বৃটিশ কমনওয়েলথ ত্যাগ, ইঙ্গ–মার্কিন ও রাশিয়া এই 'জড়বাদী' ব্লকের দম্ভে পাকিস্তানের নিরপেক্ষতা রক্ষা, আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনাধিকার প্রতিষ্ঠা, বিনা বিচারে আটক রাখার নীতি বাতিল। শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ , বিনাবিচারে আটক রাজবন্দীদের মুক্তি, পাটসহ সমস্ত একচেটিয়া ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প রাষ্ট্রায়াত্তকরণ, বিনা খেসারতে সমস্ত কর আদায়ী ভূমি স্বত্বের বিলোপ সাধন, ভূমি নির্ভর ভূস্বত্বচ্যুত নাগরিকদের জীবিকার ব্যবস্থা করা, সর্বোচ্চ উৎপাদন ও ন্যায়সঙ্গত বন্টনের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে প্রকৃত চাষীদের মধ্যে জমি বন্টন, লবণ, তামাক, সুপারী, প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য ও খাদ্য শস্যের কর বাতিল, অবিলম্বে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সমূহের স্বাধীনতা এবং শিক্ষা ও নাগরিক অধিকারের পরিপন্থী শাসন বিভাগীয় সমস্ত বাধা নিষেধ প্রত্যাহার এবং ঘুষ দূর্নীতি ও অন্যান্য সমাজ বিরোধী কার্য কলাপের প্রতিকারের জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়ন ইত্যাদি।[৫৯]

৫ (ঘ) গণতন্ত্রী দলঃ

নির্বাচন উপলক্ষে গণতন্ত্রীদল 'দশ দফা' ম্যানিফেষ্টো ঘোষণা করে।[৬০]

১। বৃটিশ কমনওয়েলথ ত্যাগ ও পাকিস্তানকে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা। যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন;

২। পাকিস্তানে বাণিজ্য ও শিল্পে নিয়োজিত বিদেশী মূলধন ও সুদ বাজেয়াফত করণ;

৩। বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন। জমিদারদের দখলী অতিরিক্ত জমি বাজেয়াফত করে কৃষকদের মধ্যে উহার পূর্ণবন্টন;

৪। পাটের রপ্তানী ব্যবসা জাতীয়করণ, উহার বাজার সম্প্রসারণ ও পাটের সর্বনিম্ন ন্যায্য মূল্যের নিশ্চয়তা দান;

৫। দেশের শিল্পায়নে বেসরকারী জাতীয় মূলধন নিয়োগে সক্রিয় উৎসাহ দান;

৬। দেশবাসীর ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা, সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তিদান, অন্তরীণাদেশ ও রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার, সকল কালাকানুন ও অর্ডিন্যান্স রদকরণ এবং ধর্ম চর্চা, সংবাদ পত্র ও বাকস্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান;

৭। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতিদান;

৮। বেকারত্ব ও ব্যয় বহুল জীবন যাত্রার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে দেশবাসীর বাঁচার অধিকার কায়েম করা;

৯। জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়ন; অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন;

১০। পাকিস্তান–ভারত সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা।

৫ (ঙ) অন্যান্যঃ ৫.ঙ (১) কংগ্রেসঃ

নির্বাচন সম্পর্কে কংগ্রেস নির্বাচনী বোর্ডের সেক্রেটারী মিঃ মনোরঞ্জনধর বলেন যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্মান রক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ধর্ম, সংস্কৃতি ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান এবং সমান নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠাই কংগ্রেসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে।[৬১]

৫ ঙ (২) পূর্ব বঙ্গ তফসিলী জাতি ফেডারেশনঃ (রসরাজ মণ্ডল গ্রুপ)

এই দলের লক্ষ্য ছিল জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন এবং তফসিলীদের জন্য আসন সংরক্ষণসহ পৃথক নির্বাচনের দাবী বাস্তবায়ন প্রভৃতি।[৬২]

৬। নির্বাচনের প্রস্তুতিঃ

আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, ২৪শে ডিসেম্বর (১৯৫৩) চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয় এবং জনগণের অবগতির জন্য তা রেজিষ্ট্রি অফিসে, রিটার্নিং অফিসারদের অফিসে, পাবর্ত্য চট্টগ্রামে প্রত্যেক মৌজার সর্দারের অফিসে, সিলেট জেলায় সার্কেল সাব ডিপুটি কালেক্টরের অফিসে, ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে, মহকুমা হাকিমের অফিসে, জেলা জজের অফিসে, সাব জজের ও মুন্সেফের অফিসে, মিউনিসিপ্যাল এলাকায় মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে এবং মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ডের সুবিধাজনক স্থানে ১৪ই জানুয়ারী পর্যন্ত উন্মুক্ত রাখা হয়।[৬৩]

ছাপানো, কিংবা টাইপ করা কিংবা হাতে লেখা ফরমে মনোনয়ন জমা দেওয়ার নিয়ম করা হয়।[৬৪] তফসিলী নির্বাচনী এলাকা ছাড়া প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার প্রার্থীগণকে ২৫০ টাকা জামানত দাখেল করতে হতো। তফসিলী নির্বাচন এলাকার প্রার্থীগণকে ১০০ টাকা জামানত দাখেল করতে হতো। 'রেভিনিউ ডিপোজিট' খাতে টাকা জমা দিতে হতো।[৬৫]

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের ব্যালট বাক্সে ব্যবহারের জন্য সরকার চূড়ান্তরূপে মোট ২৪টি প্রতীক নির্দিষ্ট করেন।[৬৬] নির্বাচনে মুসলিম লীগ 'হারিকেন' প্রতীক এবং যুক্তফ্রন্ট 'নৌকা' প্রতীক গ্রহণ করে।

পূর্ব বাংলায় প্রায় ৫ হাজার ১০টি ভোট কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়। ভোট গ্রহণের জন্য রিজার্ভসহ ৭ হাজার ৪ শত ৮৩ জন প্রিসাইডিং অফিসার ও আনুমানিক ২৪ হাজার পোলিং অফিসার নিয়োগ করা হয়। গেজেটেড অফিসার, কলেজের প্রফেসর, হাইস্কুল ও হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের প্রিসাইডিং অফিসার নিযুক্ত করা হয়। কোন ভোটার যাতে একবারের বেশী ভোট দিতে না পারে সেজন্য ভোটদান কালে তার আঙুলে অনপনেয় (যাহা সহজে উঠে না) কালির ছাপ দেওয়ার বিধান করা হয় এবং ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে হিন্দু ও মুসলমান পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা স্থান নির্দিষ্ট করা হয়।[৬৭] ভোট দেওয়ার জন্য কোন ভোটারকে যাতে পাঁচ মাইলের বেশী হাঁটতে না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রেখে বুথ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভোট গ্রহণের জন্য দেড় লক্ষাধিক (১ লক্ষ্য ৫৩ হাজার) ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা হয় এবং প্রায় দুই কোটি ব্যালট পেপার ছাপানো হয়।[৬৮] নিয়ম করা হয় যে, ভোট গ্রহণ ৫ দিনে (৮ই মার্চ থেকে ১২ই মার্চ) সমাপ্ত হবে।[৬৯] ভোট গ্রহণ কার্য সকাল ৯.৩০ মিনিটে শুরু হয়ে বিকেল ৪.৩০ মিনিট পর্যন্ত চলবে; মাঝখানে ১২.৩০ মিনিট থেকে ১.৩০ এক ঘন্টাকাল ভোট গ্রহণ বন্ধ থাকবে; বিকেল ৪.৩০ মিনিটে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের আবেষ্টনী বন্ধ করা হবে; ঐ সময়ের পর আরো কোন নতুন লোককে আবেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না; আবেষ্টনীর মধ্যে যারা থাকবেন, ৪.৩০ মিনিটের পরও তাদের ভোট নেওয়া হবে।[৭০]

এই নির্বাচনে অনুপস্থিত ভোটারদের জন্য ডাকযোগে ভোট দেয়ার সুবিধা দেয়া হয়। সরকারী প্রেস নোটে বলা হয়,

যে সকল ভোটার কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক সরকারের কাজে নিজ এলাকা হইতে দুরে আছেন, অথবা যাহারা নিবর্ত্তনমূলক আইনে আটক আছেন, তাহারা ডাকযোগে ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।'[৭১]

উল্লেখিত ব্যবস্থা সমূহ নির্বাচন সম্পন্ন করার সুষ্ঠু পদ্ধতি -এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু নির্বাচন যাতে 'সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ' হয় সেজন্য বিরোধীদল সমূহের মনে যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিরোদীদল বিভিন্ন রকমের দাবী উথাপন করেন। জনাব ফজলুল হক প্রদেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচনী কমিশনারের নিকট নিম্নলিখিত দাবীগুলি পেশ করেন।[৭২]

১। মনোনয়ন পত্র বাছাইয়ের ব্যাপারে উদারনীতি গ্রহণ করিতে এবং নির্বাচনের পূর্বে মনোনয়ন পত্র বাছাইয়ের বিরুদ্ধে আপীলের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে;

২। কোন লোক যাহাতে দুইবার ভোট দান করিতে না পারে, তাহার জন্য ভোটারদের হাতে-নখে যে কালীর দাগ শীঘ্রই মুছিয়া না যায় সেইরূপ কালীর চিহ্ন দিতে হইবে;

৩। ... দল সমূহ যাহাতে গুণ্ডামীর আশ্রয় লইতে না পারে, তাহার জন্য ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের সিকি মাইলের মধ্যে শ্লোগান উচ্চারণ এবং অস্ত্র-শস্ত্র ও লাঠি সোটা বহন নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

৪। ইউনিয়নের কেন্দ্র স্থলে ভোট গ্রহণ কেন্দ্র স্থাপন করিতে এবং ভোটদাতাদের যাতায়াতের এবং স্থান সংকুলানের যাহাতে অসুবিধা না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৫। পুলিশ কর্মচারীসহ সকল সরকারী অফিসার যাহাতে পক্ষপাতমূলক তৎপরতা শুরু না করেন, তদজন্য এখনই তাহাদিগকে সর্তক করিয়া দিতে হইবে।

নির্বাচন কমিশনার জনাব আজফার 'অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রাণপণ প্রয়াস পাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন।'[৭৩]

মওলানা ভাসানী অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী নিয়ে পূর্ববাংলার গভর্ণর চৌধুরী খালিকুজ্জামানের সংগে সাক্ষাত করেন। গভর্ণর মওলানা সাহেবকে প্রতিশ্রুতি দেন যে,

> নির্বাচনী প্রচারকার্য চালাইবার জন্য মোছলেম লীগ ও বিরোধী দলগুলিকে সমান সুযোগ দেওয়া হইবে এবং কোন সরকারী কর্মচারী মোছলেম লীগের প্রচার কার্যে সহায়তা করিতেছে এরূপ সংবাদ পাইলে তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। গভর্ণর আরও বলেন যে, নির্বাচন যাহাতে শৃঙ্খলা ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেদিকে সর্তক দৃষ্টি রাখা হইবে।[৭৪]

সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবীতে নিজামে এছলাম তার কাউন্সিল অধিবেশন শেষে নিম্নলিখিত প্রস্তাব পাশ করেঃ

> সরকারী খরচে শাসন কর্তৃপক্ষের নির্বাচনী প্রচারণা চালান সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং অবিলম্বে বর্তমান মন্ত্রী সভা ভাংগিয়া দেওয়ার দাবী জানাইয়া দলমত নির্বিশেষে সকলকেই নির্বাচনী প্রচারণা চালাইবার জন্য গণতান্ত্রিক অধিকার হিসাবে মাইক ইত্যাদি ব্যবহারের অবাধ সুযোগ প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও গভর্ণরের নিকট দাবী জানানো হয়।[৭৫]

৭। নির্বাচনী সংঘর্ষঃ গ্রেফতারঃ ঘুষ প্রদান

নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হলে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ ঘটতে থাকে। প্রত্যেক দলের তরফ থেকে প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে তোড়ে জোরে সভা সমিতির অনুষ্ঠান শুরু হয়। এক দলের সভার উপর অপর দলের উদ্দেশ্য ও কর্মতালিকা বিষয়ে তীব্র সমালোচনা ও নিন্দাবাদ শুরু হয় এবং আপন দলের আক্রমন ঘটতে থাকে। মুসলিম লীগ 'সবুজ কোর্ত্তা বাহিনী' নামক একটি নির্বাচনী স্বেচ্ছা সেবক বাহিনী গঠন করে।[৭৬] এই বাহিনীর সংগে বিরোধী দলের কর্মীদের সংঘর্ষ এমন অবস্থায় পৌঁছে যে, ২০শে জানুযারী বরিশালে আব্দুল মালেক নামক একজন মুসলিম লীগ পন্থী স্বেচ্ছাসেবক নিহত হয়।[৭৭] যতদূর জানা যায় এটাই ছিল ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের একমাত্র হত্যাকান্ড।

এই হত্যাকান্ড ঘটার পর সরকার নির্বাচনী সংঘর্ষের পথ পরিহার করে গ্রেফতারী অস্ত্র ব্যবহার শুরু করেন। ২৫শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সরকার 'ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক গুণ্ডামী' বন্ধের জন্য 'নিবর্ত্তনমূলক ভাবে' ১৫০ জনকে গ্রেফতার করে।[৭৮] ৪ঠা মার্চ এর মধ্যে ২২৬ জনকে আটক করা হয়।[৭৯] আটককৃতদের সম্পর্কে সোহরাওয়ার্দী বলেন,

> 'ধর পাকড়' এবং 'জননিরাপত্তা' আইন অনুসারে আমাদের ভাল ভাল কর্মীদের আটক রাখিয়া বিভীষিকা সৃষ্টির কাজ শুরু হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার ফলে বিরোধী দলের কর্মীদের মনোবল হ্রাস পাইবে না। পক্ষান্তরে ইহাতে ভোটদাতাদের মধ্যে মোছলেম লীগের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইয়াছে। যাহারা এযাবৎকাল মোছলেম লীগকে সমর্থন করিতেছিলেন এক্ষণে তাঁহাদের নিকট ইহার স্বরূপ পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে এবং তাহারা মোছলেম লীগকে ভোট না দেওয়ার সংকল্প করিতেছেন।[৮০]

নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয় অবধারিত বুঝতে পেরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী ফজলুল হকের সংগে আঁতাত করে যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে দেয়ার চেষ্টা করেন। এ প্রসংগে মানিক মিয়া উল্লেখ করেনঃ[৮১]

> অবস্থা প্রতিকূল বুঝিয়া প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী জনাব ফজলুল হকের সহিত আঁতাত গঠনের গোপন প্রচেষ্টা চালাইলেন। তিনি প্রস্তাব দিলেন, নির্বাচন এক বৎসরের

জন্য স্থগিত রাখা হইবে, জনাব ফজলুল হককে মুখ্যমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত করা হইবে এবং মন্ত্রী সভায় পঞ্চাশ-পঞ্চাশ ভিত্তিতে হক সাহেবের দলীয় সদস্য গ্রহণ করা হইবে। কিন্তু দুইটি কারণে এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইল। প্রথম কারণ, মুখ্যমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিলেন। তাঁর বক্তব্য, কেন্দ্রীয় শাসনচক্রের আদেশ নির্দেশ পালন করিতে গিয়াই তিনি প্রদেশে অপ্রিয়ভাজন হইয়াছেন, তার নিজের দোষত্রুটির জন্য নয়, সুতরাং এই অবমাননাকর পন্থায় কেন তাকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ হইতে অপসারণ করা হইবে? দ্বিতীয় কারণ, এই ষড়যন্ত্র যুক্তফ্রন্ট মহলে ফাঁস হইয়া যায়। 'দৈনিক সংবাদ' এর সম্পাদক বন্ধুবর জহুর হোসেন চৌধুরী এক রাতে টেলিফোন যোগে এই গোপন শলাপরামর্শের কথা আমাকে জানাইয়া দেন। ....অঙ্কুরেই এই ষড়যন্ত্র বিনাশ হইয়া যায়।

নির্বাচনে মুসলিম লীগ ভোটারদের ঘুষ দিয়ে বশীভুত করার চেষ্টা করেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এ প্রসংগে সোহরাওয়ার্দী যশোরে এক নির্বাচনী সভায় (২৩শে জানুয়ারী'৫৪) ঘোষণা করেন,

মোছলেম লীগ মনোনীত প্রার্থীরা যদি তোমাদিগকে টাকা দিতে চায় তাহা হইলে তাহা গ্রহণ করিও। কিন্তু তাহাদিগকে ভোট দিও না।[৮২]

৮। শেষ নির্বাচনী চিত্রঃ

৮. (ক) ঢাকা শহর

আজাদের ৪ঠা মার্চ সংখ্যায় শেষ নির্বাচনী চিত্রের বাস্তব বর্ণনা প্রকাশিত হয়েছিল। বর্ণনাটা নিম্নরূপঃ

.....নির্বাচনের আর ৩দিন মাত্র বাকী .....প্রচার কার্যের এই শেষ পর্যায়েও লক্ষ্যণীয়বস্তু এই যে, এক দলের সভা বা শোভাযাত্রায় অপর দল আর বাধা দিতেছে না। এক দলের কর্মী শিবিরের সম্মুখ দিয়া বিপক্ষ দলের কর্মীদের সমুন্নত শিরে গমনে আর বাধা নেই। এক দলের শিবিরের সম্মুখে নিরুপদ্রবে বিপক্ষ দলের সভা হইতেছে, শহরের পথি পার্শ্বস্থ গৃহসমূহের দেওয়ালগুলি বিচিত্র বর্ণের, বিচিত্র ভঙ্গীর নির্বাচনী আবেদনে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ভোটদাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রার্থীদের ব্যক্তিগত গুণকীর্তন হইতে শুরু করিয়া দলীয় পর্যায় "প্রতীকের" মহিমা কীর্তন প্রভৃতি কোন কৌশলই নির্বাচনী প্রাচীরপত্র ও প্রচারপত্র, কুশলী শিল্পী ও রচয়িতারা বাদ দেন নাই। লাল, নীল, সবুজ রং এর কালিতে মুদ্রিত হারিকেন, নৌকা, ছাতা, বন্দুক, দাড়িপাল্লা, ধানের শীষ, গরুর গাড়ীর চিত্র সম্বলিত পোষ্টারের সমারোহ দৃষ্টে মনে হয় না যে, পূর্ববঙ্গে এই সেদিনও কাগজের অভাব ছিল না বা এখন আছে। প্রচার কার্য্যে

আরম্ভের শুরুতে লাগান যে পোষ্টারগুলি এতদিনের রোদে, শিশিরে ও বৃষ্টিতে মুছিয়া বা নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে সেগুলির উপর নুতন করিয়া তুলি বুলাইয়া আরও আকর্ষণীয় করিয়া তোলা হইতেছে। মুটের মাথায় রিক্সায় ও ঠেলাগাড়িতে করিয়া প্রত্যহ ছাপাখানা হইতে প্রচারপত্র বিলি হইতেছে। লীগ ও যুক্তফ্রন্ট ছাড়া অন্যান্য প্রার্থী বা সংখ্যালঘুদের তরফে প্রচার কার্যে তেমন উৎসাহ দেখা যায় নাই। কিন্তু নির্বাচনের দিন ঘনাইয়া আসায় আজ তাঁহারও তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন। 'পথি পার্শ্বস্থ গৃহগাত্রে এখন হারিকেনও নৌকার পাশে ছাতা, দাড়িপাল্লা বন্দুক, ধানের শীষ, গরুর গাড়ী প্রতীকও শোভা পাইতেছে।

'নৌকা ও 'হারিকেন' কে দর্শনীয় করিয়া তোলার চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। বাঁশ ও কাগজ সহযোগে বিরাটকায় হারিকেন তৈয়ার করিয়া বিদ্যুৎ সংযোগে তাহা আলোকিতও করা হইয়াছে। কয়েকস্থানে বুড়িগঙ্গার ঘাট হইতে আস্ত নৌকা আনিয়া রাস্তার এপার ওপার করিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

'নৌকা' ও 'হারিকেন' সমর্থক কর্মীগণ পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া যেসব ব্যঙ্গচিত্র আঁকিয়াছেন, সেগুলিও কম দর্শনীয় নয়।

নির্বাচনী প্রচারপত্র, প্রাচীরপত্র ও ব্যঙ্গচিত্রের উপরোক্ত দিক ছাড়াও রাস্তায়, অলিগলিতে অসংখ্য নির্বাচনী অফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন দলীয় প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও যথেষ্ট হইয়াছে। রাস্তায় একদলের অফিস প্রতিষ্ঠিত হইলে ঐ রাস্তায় অপরদলের অফিস প্রতিষ্ঠায় সামান্যতম বিলম্ব হয় নাই। প্রতি রাত্রে মহল্লায় মহল্লায় জনসভারও অনুষ্ঠান হইতেছে। গত ২৫ দিনে শহরের বহু স্থানে সন্ধ্যার পর হইতে রাত্র দুইটা পর্যন্ত রাস্তায় এমন বহু সভা হইয়া গিয়াছে।[৮৩]

৮। (খ) পল্লী এলাকাঃ

এ প্রসংগে আজাদে উল্লেখ করা হয়, পল্লী এলাকার নির্বাচন কেন্দ্রসমূহ হইতে যে খবর পাওয়া যাইতেছে তাহাতে প্রকাশ, সকল কেন্দ্র পুরোদমে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হইয়া গিয়াছে। সভা সমিতি ছাড়াও ভোটারদের বাড়ী বাড়ী গিয়া প্রার্থীদের পক্ষ হইতে ভোট প্রার্থনা শুরু হইয়াছে। হাটে, ঘাটে, মাঠে সর্বত্র চোঙ্গা ফুঁকিয়া ভোট চাওয়া হইতেছে।[৮৪]

৮। (গ) নির্বাচনের দিনঃ

ঢাকার নির্বাচন সম্পর্কে আজাদে লেখা হয়ঃ

.....সকালে শহরের অলিগলি, রাস্তায় বিভিন্ন প্রার্থীর ক্যানভাসাররা পায়ে হাঁটিয়া, রিক্সায়-ট্যাক্সিতে ও ঘোড়ার গাড়ীতে চাপিয়া ঘোরাঘুরি করিতে থাকে এবং বিভিন্ন ভোটারের নিকট নিজ নিজ প্রার্থীর যোগ্যতা শেষ বারের মত বর্ণনা করে। ট্যাক্সি,

রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ীতে আটা প্রচারপত্রেও ঐদিন শেষ বারের মত অভিনবত্ব আর চাকচিক্য দেখা যায়। বেলা বৃদ্ধি পাইবার সাথে সাথে বিভিন্ন প্রার্থীর ক্যানভাসাররা ভোটারগণকে ভোটকেন্দ্রে লইয়া যাইবার জন্য গৃহে গৃহে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং স্বীয় গাড়ীতে উঠাইবার জন্য ভোটারগণকে দল বাধিয়া অনুনয় বিনয় করে.....ভোট কেন্দ্রগুলির কাছাকাছি বিভিন্ন প্রার্থীর শিবিরে শিবিরে ভোটার আর ক্যানভাসারদের মধ্যে উৎসাহের আধিক্য বেশীই দেখা যায়। ক্যানভাসাররা ভোটারগণকে সেখানে পানীয় ও খাবার আপ্যায়ন করিয়া শেষবারের মত স্বীয় প্রার্থীর সমর্থনে ভোট দিবার জন্য অুননয় করেন। ভোটারকে আনিবার জন্য ক্যানভাসাররা এই সময় প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের পরিচয় দেয়। ভোট দিবার পূর্বে বিভিন্ন ভোটারকে আপ্যায়নের জন্য ক্যানভাসারদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা গেলেও বাম হাতের তর্জ্জনীতি লাল কালির দাগ লইয়া ভোটারেরা পোলিং বুথ হইতে বাহিরে আসিবার পর কেহ তাহাদিগকে আপ্যায়ন করে নাই। ভোট দিবার পূর্বে গাড়ীতে করিয়া ক্যানভাসাররা ভোটারকে ভোটকেন্দ্রে লইয়া আসিয়াছে অথচ ভোট দিবার পরে আর কেহ তাহাকে বাড়ীতে পৌছাইয়া দিতে চাহিতেছে না বলিয়া বহু ভোটারকে সাক্ষাতে অভিযোগ করিতে শোনা গিয়াছে।.....নির্বাচনের জন্য ঐদিন সকল সরকারী অফিস বন্ধ ছিল। ইহা ছাড়া শিক্ষায়তন সমূহ এবং আরও বহু বেসরকারী অফিস বন্ধ থাকে। .....ভোটকেন্দ্রগুলির বাহিরে ও ভিতরের প্রতিটি বুথের দরজায় পুলিশ প্রহরা মোতায়েন ছিল .....কেন্দ্রের ভিতর প্রিসাইডিং অফিসার পোলিং অফিসার আর প্রার্থীদের এজেন্ট ছাড়া কোনও ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন না। বুথে রক্ষিত বাক্সগুলিকে চটের পর্দা দ্বারা আড়াল করিয়া রাখা হয়।[৮৫]

নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আজাদ পত্রিকায় মন্তব্য করা হয় যে, 'নির্বাচনী দিবসের পূর্বে নানাজনে নানা প্রকার আশংকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু গতকল্য ঢাকা শহরের ভোটারগণ এবং নির্বাচনের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল দল ও ব্যক্তি বিস্ময়কর শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় দিয়া সকলকেই স্তব্ধ করিয়া দিয়াছেন .....পূর্ব পাকিস্তান গণতন্ত্রের প্রথম পরীক্ষায় সাফল্যজনকভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে"[৮৬]

আঙ্গুলে অনপনেয় কালি (Indelible ink) লাগানোর বিধান করায় এবং (East Bengal Electoral Offences Ofdinance জারী করায় নির্বাচনে জালভোট দেয়ার চেষ্টা হয়নি, কিংবা রিগিং হয়নি।[৮৭]

৯। নির্বাচনী ফলাফলঃ

নির্বাচনে মুসলমান আসনে ৩৭.৬০% ভোট পক্ষে।[৮৮ক] তখনকার যোগাযোগ ব্যবস্থার দুরাবস্থা, মহিলাদের ভোটকেন্দ্রে আসতে অনীহা[৮৮খ] প্রভৃতি কারণে ভোটদানের হার কম ছিল। নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা শুরু হয় ১৫ই মার্চ (১৯৫৪) থেকে। সরকারী ফলাফল ঘোষিত হয় ২রা এপ্রিল।

২৩৭টি মুসলমান আসনের ফলাফলঃ[৮৯]

যুক্তফ্রন্ট	=	২১৫টি আসন
মুসলিম লীগ	=	৯টি আসন
খেলাফতে রব্বানী পার্টি	=	১টি আসন
স্বতন্ত্র	=	১২ টি আসন
মোট	=	২৩৭টি আসন

৭২টি অমুসলমান আসনের ফলাফলঃ[৯০]

পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস	=	২৪টি	আসন
তফসিলী ফেডারেশন	=	২৭ টি	আসন (রসরাজমণ্ডল গ্রুপ)[৯১]
সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট	=	১৩ টি	আসন (এর মধ্যে গণতন্ত্রী দল=৩)
কম্যুনিষ্ট পার্টি	=	৪ টি	আসন
বৌদ্ধ	=	২ টি	আসন
খ্রীষ্টান	=	১ টি	আসন
স্বতন্ত্র	=	১ টি	আসন
মোট	=	৭২টি	আসন

মুসলমান আসনের স্বতন্ত্র সদস্যদের ৮ জন যুক্তফ্রন্টে যোগদেন, ফলে যুক্তফ্রন্টের সদস্য সংখ্যা ২২৩-এ উন্নীত হয়।[৯২] চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত একজন স্বতন্ত্র সদস্য মুসলিম লীগে যোগদান করলে ঐ দলের সদস্য সংখ্যা ১০ হয়।

সারণী ৩-এ মুসলমান আসনের জেলা ভিত্তিক ফলাফল দেয়া হলো। এতে দেখা যায় যে ৮টি জেলায় যুক্তফ্রন্ট একচেটিয়াভাবে সবগুলি আসন লাভ করে। মুসলিম লীগ কেবলমাত্র রংপুর, যশোর, সিলেট ও ত্রিপুরা জেলায় আসন পায়। খেলাফতে রব্বানী পার্টি যে আসনটি লাভ করে তা সিলেট জেলায়।

সারণী –৩ঃ মুসলমান আসনের জেলাভিত্তিক ফলাফল[৯৩]

জেলা	মোট আসন	যুক্তফ্রন্ট	লীগ	রব্বানী পার্টি	স্বতন্ত্র
১. দিনাজপুর	৬	৬	–	–	–
২. রংপুর	১৬	১১	৪	–	১
৩. বগুড়া	৮	৮	–	–	–
৪. রাজশাহী	১৩	১২	–	–	১
৫. পাবনা	৯	৯	–	–	–
৬. কুষ্টিয়া	৬	৬	–	–	–
৭. যশোর	৮	৭	১	–	–
৮. খুলনা	৮	৮	–	–	–
৯. বাখারগঞ্জ	২০	১৯	–	–	১
১০. ফরিদপুর	১৪	১৪	–	–	–
১১. ঢাকা	২৩	২৩	–	–	–
১২. মোমেনশাহী	৩৪	৩৪	–	–	–
১৩. সিলেট	১৫	১১	২	১	১
১৪. ত্রিপুরা	২২	১৫	২	–	৫
১৫. নোয়াখালী	১৩	১২	–	–	১
১৬. চট্টগ্রাম	১৩	১১	–	–	২
মহিলা	৯	৯	–	–	–
	২৩৭	২১৫	৯	১	১২

নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবী ঘটে। মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন এবং আরো চারজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী এবং কমপক্ষে ৫০ জন মুসলিম লীগ দলীয় প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। নুরুল আমীন নিজ আসনে খালেক নেওয়াজ খান নামক ২৫ বৎসর বয়সী এক আইনের ছাত্রের নিকট ৭০০০ এরও বেশী ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন।[৯৪] তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ফকির আব্দুল মান্নান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্র জনাব তাজউদ্দিন আহমদের নিকট প্রায় তের হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। মুসলিম লীগ সমর্থিত তফসিলী জাতি ফেডারেশন (বারুরী গ্রুপ) এরও ভরাডুবী ঘটে।

১০। মুসলিম লীগের অভিযোগঃ

নির্বাচনের শোচনীয় পরাজয় বরণ করে মুসলিম লীগ দল ও সরকার নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। স্বয়ং নুরুল আমিন সাংবাদিকদের নিকট বলেন, 'পূর্ববঙ্গের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি।[৯৫] পাকিস্তান মুসলিম লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারী জনাব গিয়াসুদ্দিন পাঠান ৯ই মার্চ (১৯৫৪) পূর্ববঙ্গের গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করে তাঁকে মুসলিম লীগের অভিযোগ জানান। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারী মঈন উদ্দিন আহমেদ এক বিবৃতিতে বলেন,

> লীগ মনোনীত প্রার্থী ও তাঁহাদের এজেন্টদের নিকট হইতে লীগ অফিসে এই মর্মে বহু লিখিত অভিযোগ আসিতেছে যে, অনেক প্রিসাইডিং অফিসার ও অনেক পোলিং অফিসার প্রাকাশ্যে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীদের পক্ষ অবলম্বন করিতেছেন। কতিপয় ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে বহু যুক্তফ্রন্ট কর্মীকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। তাহারা নিজেদের দলের জন্য ক্যানভাসও করে। উপরন্তু কয়েকজন মোছলেম লীগ ভোটারকেও টানা হেচড়া করেন।[৯৬]

নুরুল আমিন সাংবাদিক সম্মেলনে নিম্নলিখিত অভিযোগ জানান,

> একটি ভোট কেন্দ্রে বেশ কিছুক্ষণের জন্য মোছলেম লীগের হারিকেন মার্কা ব্যালট বাক্সই দেওয়া হয় নাই, পরে ইহা পোলিং অফিসারের গোচরে আনয়ন করা হইলে তিনি আবার ব্যালট বাক্স স্থাপন করেন। অধিকাংশ ভোটারই অশিক্ষিত, সেইজন্য তাহারা শীঘ্র এই সমস্ত ত্রুটি ধরিতে পারে নাই।[৯৭]

যে 'আজাদ' পত্রিকা ৯ই মার্চের সংখ্যায় নির্বাচন সুষ্ঠু হইয়াছে বলে মন্তব্য করেছিল, মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় বুঝতে পেরে ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার আগেই ঐ পত্রিকায় ১১ই মার্চ 'তদন্ত ও প্রতিকার' শীর্ষক এক সম্পাদকীয় লেখা হয়। ঐ সম্পাদকীয়তে বলা হয়,

> যে সব ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তাদের সুমহান দায়িত্ব পালন করেন নাই কিংবা ইচ্ছা করিয়া অন্যায় এবং পক্ষপাতিত্বপূর্ণ আচরণ করিয়াছেন তাদের প্রতি কঠোর শাস্তিদানেরও ব্যবস্থা করিতে হইবে।[৯৮]

১১। নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণঃ

নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের পিছনে অনেকগুলি কারণ ছিল। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্টে শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়ে দলের নেতৃবর্গ নিজেদের ভাগ্যগড়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তারা জনগণের সংগে যোগাযোগ বজায় রাখতে অবহেলা দেখান। ফলে দলটি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দলের অনেক পুরাতন এবং জনপ্রিয় নেতা ও সদস্য বিভিন্ন কারণে দলত্যাগ করেন এবং নতুন দল (যেমন আওয়ামী মুসলিম লীগ) গঠন করেন। ফলে দলের সাংগঠনিক শক্তি দূর্বল হয়ে পড়ে। তাছাড়া মুসলিম লীগ পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাধ্যে

যে বহুমুখী বৈষম্যের সৃষ্টি হয় সেজন্য পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ মুসলিম লীগকেই দায়ী করে এবং নির্বাচনে তার প্রভাব পড়ে। মুসলিম লীগের পূর্ব বাংলা শাখা এবং পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগ সরকার এই প্রদেশের অর্থনৈতিক অবনতি রোধ করতে ব্যর্থ হয়। লবণ, কেরোসিন ও সরিষার তেল প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় গৃহ বধুরাও মুসলিম লীগের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তারা মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ভোট দেয়। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীর প্রতি চরম বিরোধিতা করে ১৯৫২ সালের হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে দলের বিরুদ্ধে বাংলার আপামর জনসাধারণকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। দীর্ঘ ৭ বৎসর সংবিধান প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রদেশবাসীর নিকট দলের গ্রহণযোগ্যতা কমে যায়।[৯৯] ফলে নির্বাচনের প্রাক্কালে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের কোন বক্তব্যই জনগণকে খুশী করতে পারেনি। অপরপক্ষে, ফজলুল হক, ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দী এই তিনজনের নির্বাচনী প্রচারণার ফলে 'দেশময় যে প্রাণ চাঞ্চল্যের বন্যা আসিল, তাতে মুসলিম লীগের মত ক্ষমতাসীন দল ভাসিয়া গেল।'[১০০]

মুসলিম লীগের মুখপত্র আজাদ পত্রিকা এই দলের পরাজয়ের জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলো চিহ্নিত করেঃ

> সাধারণভাবে লীগের পরাজয়ের যেসব কারণ সর্বত্র আজ কাল আলোচিত হইতেছে, সে সবের ভিতর রহিয়াছে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের এবং লীগের কতিপয় নীতি ও কার্যের প্রতিবাদ..... লীগের পরাজয়ের কারণগুলি হইতেছেঃ (১) বাংলাভাষার দাবীর প্রতি অবিচার, ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে নুরুল আমিন সরকারের দমন-নীতি, (২) পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রের নীতি, সমদর্শিতার অভাব, অবিচার ও শোষণনীতি, (৩) লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলাকে স্বায়ত্বশাসন না দেওয়ার প্রস্তাব ও মনোভাব, (৪) পূর্ব বাংলার জনগণের আর্থিক দুর্দ্দশা, (৫) শাসনতন্ত্র রচনায় বিলম্ব, (৬) লীগের গণসংযোগের অভাব (৭) লীগ ও মন্ত্রীত্বের একীকরণ (৮) লীগের কর্মীর স্বল্পতা এবং লীগের প্রতি ছাত্র ও তরুণ সমাজের বিরূপ মনোভাব (৯) লীগের ভিতর বিপুল ব্যক্তিত্বশালী নেতৃত্বের অভাব (১০) দুর্নীতি দমনে সরকারী ব্যর্থতা এবং এইভাবে এই তালিকায় আরো কারণ যোগ করা যাইতে পারে।[১০১]

১২। নির্বাচনে বিজয়ী পরিষদ সদস্যবৃন্দের সামাজিক পটভূমিঃ

১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনে বিজয়ী পরিষদ সদস্যদের সামাজিক পটভূমি নির্ণয় বর্তমানে দুঃসাধ্য। উক্ত সদস্যদের অনেকেই এখন জীবিত নেই। তাঁদের অধিকাংশের কোন জীবনী গ্রন্থ লিখিত হয় নাই। এমতাবস্থায় মিসেস নাজমা চৌধুরীর গবেষণাগ্রন্থ[১০২] থেকে আমরা কিছু তথ্য পাই। মিসেস চৌধুরী ১৯৬৭-৬৯ সময়ে তাঁর পি এইচ ডি গবেষণা কর্মের অংশ হিসেবে '৫৪ এর নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট তাঁদের জীবনীর

বিভিন্ন তথ্য জানতে চেয়ে একটি প্রশ্নমালা প্রেরণ করেন। ৩২২ জন নির্বাচিত প্রতিনিধির[১০৩] নিকট প্রশ্নমালা প্রেরিত হলেও মাত্র ১২৩ জন (৩৮.২%) প্রশ্নমালা পূরণ করে ফেরত পাঠান। উক্ত ১২৩ জনের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে মিসেস চৌধুরী তাঁদের সামাজিক পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন তা সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ অধিকাংশই ছিলেন বেশ বয়স্ক। ৬০ এর বেশী বয়স্ক সদস্যের সংখ্যা যেখানে ছিল ১৭%, ৩০ এর কম বয়স্ক সদস্য সংখ্যা সেখানে মাত্র ৮%। ৪৫ এর অধিক বয়স্ক সদস্য সংখ্যা ছিল ৫১%।[১০৪]

নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ অধিকাংশই ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত। আইন পাশ সদস্য সংখ্যা ছিল লক্ষ্যণীয় (৪৫%)। ডাক্তারী পাশ ছিলেন ৫%। স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী ১৮%। মাট্রিক পাশ করেননি এমন সদস্য সংখ্যা ৬%, মাট্রিক পাশ ৬% এবং ইন্টারমিডিয়েট পাশ ৮%। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ননগ্রাজুয়েট সদস্য সংখ্যা ২০% (২৪ জন)। এদের মধ্যে ২ জন ধনী জমিদার পরিবারের সদস্য, ২ জন বড় জোতদার, ২ জন এমন পরিবারের সদস্য যে পরিবার থেকে ইতিপূর্বে পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, ৫ জন মোক্তার, ৩ জন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত থাকায় পড়াশুনা করতে পারেননি, ১ জন বড় ব্যবসায়ী, ১ জন দীর্ঘদিন স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সংগে জড়িত ছিলেন, ১ জন বিপ্লবী কর্মী। এরা সকলেই নিজ নিজ এলাকায় সুপরিচিত হওয়ায় কম লেখাপড়া তাদের নির্বাচনে বিঘ্ন সৃষ্টি করেনি। নির্বাচিত সদস্যদের ৬% (৭ জন) ছিলেন ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত। লক্ষ্যণীয় যে, ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিতরা যে সকলেই কোন ধর্মীয় সংগঠনের বা দলের সদস্য ছিলেন এমন নয়। উক্ত ৭ জনের ১ জন নির্বাচিত হয়েছিলেন নিজামে ইসলামী থেকে, ৩ জন মুসলিম লীগ থেকে এবং ২জন আওয়ামী লীগ থেকে, ১ জনের দলীয় পরিচয় জানা যায়নি। আওয়ামী লীগের সদস্যদ্বয় '৪৭ এর পূর্বে মুসলিম লীগ দলের সদস্য ছিলেন।[১০৫]

নির্বাচিত সদস্যদের পেশার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে যে, আইন পেশার সংগে সংশ্লিষ্টদের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক ৫১%। জমিদার-ভূস্বামী ১১%, শিক্ষাবিদ ৯%, সাংবাদিক ৩%, ডাক্তার ৬%, 'অন্যান্য' ৯%। কেউই শিল্পপতি হিসেবে নিজেকে পরিচয় দেননি। 'অন্যান্য' বলতে ধর্ম প্রচারকরা, সার্বক্ষণিক রাজনীতি করা, সার্বক্ষণিক জনসেবা করা প্রভৃতি উল্লেখ করেছেন।[১০৬] ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যদের মাত্র ১৪% এর ইতিপূর্বে কোন না কোন আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল।[১০৭] এই তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, '৫৪ সালে গঠিত ব্যবস্থাপক পরিষদ পার্লামেন্টারী ব্যবস্থায় অনভিজ্ঞদের দ্বারা পূর্ণ ছিল।[১০৮] তবে

অন্ততঃ ২৫% সদস্যের স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে (ইউনিয়ন বোর্ড, লোকাল বোর্ড, ডিষ্ট্রিক বোর্ড) সংশ্লিষ্ট থাকার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল।

উপসংহারঃ

১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনের গুরুত্ব অত্যাধিক। পূর্ব বাংলায় ইহা ছিল প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচন ছিল অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ। নির্বাচনে সরকারী দলের এমন শোচনীয় পরাজয় ছিল যা বিরল ঘটনা। পূর্ব বাংলার তৎকালীন সরকার নির্বাচনে পরাজয়ের সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য নির্বাচন পিছিয়ে দেন, কিন্তু নির্বাচনে কারচুপির প্রচেষ্টা করেননি। এই নির্বাচনে জনগণ স্বর্তঃস্ফূর্তভাবে ব্যালটের মাধ্যমে তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ লাভ করেছিল এবং তারা উক্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার দাবীর স্বপক্ষে ভোট দিয়ে জনগণ পূর্ব বাংলার স্বায়ত্বশাসনের দাবীকে সমর্থন জানিয়েছিল। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের ফলে পাকিস্তান গণপরিষদে উক্ত দলের সদস্য সংখ্যা হ্রাস পায়। ফলে পাকিস্তানের কোয়ালিশন সরকার গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। পূর্ব বাংলায় সেই যে মুসলিম লীগের পতন ঘটলো এরপর আর কখনো এখানে মুসলিম লীগ দল শক্তিশালী হতে পারেনি।[১০৯]

টীকা ও তথ্য নির্দেশঃ

১. এই উপ-নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয় টাংগাইলে। একই আসনে এটি ছিল দ্বিতীয় উপ-নির্বাচন। প্রথমবার উপ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে। তখন মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী মুসলিম লীগ প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে জয় লাভ করেন। কিন্তু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বি জনাব খুররম খান পন্নী নামক টাংগাইলের এক জমিদার-নির্বাচন ট্রাইবুনালের নিকট এই মর্মে আবেদন করেন যে, টাংগাইলের রিটানিং অফিসার অন্যায়ভাবে তাঁর নমিনেশন পত্র বাতিল করেছিলেন। ট্রাইবুনাল ঐ অভিযোগ গ্রহণ করেন এবং নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করেন এবং নির্বাচনে অনিয়ম করার অভিযোগে ভাসানী ও পন্নীকে ১৯৫৩ সালের মার্চ পর্যন্ত কোন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে অযোগ্য ঘোষণা করে। পরবর্তীতে পন্নীর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয় এবং ১৯৪৯ এর এপ্রিলে ঐ আসনের উপ নির্বাচনে পন্নীকেই মুসলিম লীগের প্রার্থী মনোনয়ন দেয়া হয়। মওলানা ভাসানী তখন জনাব শামসুল হককে পন্নীর বিরুদ্ধে ভোটে দাড় করিয়ে দেন। পন্নীকে বিজয়ী করার জন্য স্বয়ং নুরুল আমীন (তখন মুখ্যমন্ত্রী) এবং অপর পাঁচ জন মন্ত্রী নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু নির্বাচনে ভাসানীর প্রার্থী শামসুল হকই জয়লাভ করেন। এই পরাজয়ে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক সরকার ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। ফলে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদে ৩৪টি আসন (মোট আসনের প্রায় $\frac{১}{৫}$ অংশ) শূন্য থাকলেও আর কোন উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত করা হয়নি। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য *Najma Chowdhury, The Legislative Process in Bangladesh: Politics and Functioning of the East Bengal Legislature, 1947-58* (Dacca: University of Dacca, 1980) PP 85-88

২. তৎকালীন মুখ্য সচিব আজিজ আহমেদ মন্ত্রীদের নামে স্বতন্ত্র গোপন ফাইল রাখতেন। দেখুন, Golam Morshed, "East Bengal Provincial Elections of March 1954 and Germination of Separatist movement in East Pakistan", *The Rajshahi University Studies*, Vol. VII, 1976, P. 78.

৩. বশীর আল হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫) পৃঃ ৪১।

৪. Talukder Maniruzzaman, *The Politics of Development: The case of Pakistan, 1947-58* (Dacca: Green Book House Ltd., 1971), P.43.

৫. Golam Morshed, *Op, Cit.* P. 81

৬. Talukder Maniruzzaman, *Op, Cit.* PP. 42-43

৭. বশীর আল-হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ.৪০

৮ক. ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচন তৎকালীন পূর্ববাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে অনুষ্ঠিত হয়। সে সময় উক্ত নির্বাচনের উপরে নির্বাচন পরিচালনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। ১৯৫৬ সালে তৎকালীন পূর্ববাংলা স্বরাষ্ট্র দফতর কর্তৃক একটি রিপোর্ট প্রণীত হলেও তা প্রকাশিত হয়নি। সৌভাগ্যবশত উক্ত রিপোর্টের নামবিহীন একটি টাইপ করা কপি বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

অফিসে পাওয়া যায়। ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃপক্ষ রিপোর্টটি প্রকাশ করেন। দেখুন, Election Commission of Bangladesh, *Report on the Election to East Bengal Legislative Assembly, 1954* (Dhaka: secretary, Bangladesh Election Commission.May, 1977.)

৮খ. পূর্ববাংলার প্রথম প্রাদেশিক পরিষদের (১৯৪৭-১৯৫৪) সদস্য সংখ্যা ছিল ১৭১ জন। এর মধ্যে ১৪১ জন ছিলেন অবিভক্ত বাংলার আইন পরিষদের যে সকল সদস্য পূর্ব বাংলা এলাকা থেকে নির্বাচিত তারা এবং সিলেট জেলা পূর্ব বাংলাভুক্ত হওয়ার কারণে সিলেট জেলা থেকে আসাম আইন পরিষদে নির্বাচিত ৩০ জন। দেখুন Najma Chowdhury, *Op. Cit.* pp 17-19;

৯. নির্বাচিত এলাকার তালিকা (Constituency) এবং Constituency ভিত্তিক রিটানিং অফিসারদের তালিকার জন্য দেখুন, Govt. of East Bengal (Home Dept.: Constitutions and Elections) *Election Manual Vol. I, Rules* (Dacca: East Bengal Govt Press, 1953), PP 76-111; *ibid*, Vol. II. Appendices, PP. 84-108.

১০. Najma Chowdhury, *Op. Cit*, P. 167: Kamal Uddin Ahmed "1954 Elections: Issues of Autonomy", in S. Islam (ed), *History of Bangladesh, 1704 - 1971, Vol. I, Political History* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1992), P. 471; *Report on the Election to East Bengal Legislative Assembly, 1954, op cit*, p22

১১. দেখুন, *আজাদ*, ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৪ঃ মহিলাদের নির্বাচনী এলাকা ছিল নিম্নরূপঃ

(ক) মুসলিম মহিলা নির্বাচনী এলাকা

১. দিনাজপুর কাম-রংপুর-কাম-বগুড়া, ২ রাজশাহী-কাম- পাবনা, ৩. ফরিদপুর-কাম-কুষ্টিয়া-কাম-যশোর-কাম-খুলনা, ৪. বাকেরগঞ্জ, ৫. ঢাকা সিটি পশ্চিম, ৬. ঢাকা কাম-নারায়নগঞ্জ, ৭. মোমেনশাহী, ৮. ত্রিপুরা-কাম-সিলেট, ৯. চট্টগ্রাম-কাম-নোয়াখালী।

(খ) মহিলা তফসিলী নির্বাচন কেন্দ্রঃ

১. রাজশাহী বিভাগ, ২. ঢাকা-কাম-চট্টগ্রাম বিভাগ দেখুন, *আজাদ*, ৪. জানুয়ারী ১৯৫৪

১২. ভোটার তালিকা প্রণয়ন পদ্ধতি বিষয়ে দেখুন, "The East Bengal Legislative Assembly Electoral (Preparation, Revision and publication of Electoral Rolls) Rules, 1953"; এবং *Report on the Election to East Bengal Legislative Assembly, 1954, op cit, pp 4-9.*

১৩. *আজাদ*, ৩১ অক্টোবর ১৯৫৩,

১৪. *তদেব*, ১ নভেম্বর ১৯৫৩; ১১ নভেম্বর ১৯৫৩, ভোটার তালিকা সম্পর্কে ফজলুল হক এক বিবৃতিতে বলেন .... প্রকাশিত খসড়া তালিকায় শতকরা ৫০ জনের নাম স্থান পাইয়াছে, যাহাদের নাম বাদ পড়িয়াছে, তাহাদের একভাগ আপত্তি দাখিল করিয়াছেন। অতএব এখনও প্রায় শতকরা ৪৯ জন ভোটারের নাম তালিকার বাহিরে রহিয়াছেন।", দেখুন, তদেব ১২ নভেম্বর ১৯৫৩।

১৫. সারণী-১; *Pakistan 1953-1954* (Karachi: Pak Publications) n.d.

১৬. দেখুন, Keith Callard, *Pakistan- A Political Study* (London: George Allen & Unwin Lid., 1958), p. 58.

১৭. নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দলের সাংগঠনিক পরিচয় ও ইতিহাস বিষয়ে দ্রষ্টব্যঃ Najma Chowdhury. op cit, pp 65-165.

১৮. যুক্তফ্রন্ট গঠনের ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, Rangalal Sen, *Political Elites in Bangladesh* (Dhaka: University Press Lid, 1986)pp. 118-211.

১৯. আওয়ামী লীগের উক্ত কাউন্সিল সভায় সভাপতিত্ব করেন পার্টির সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। সভায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, *আজাদ* পাকিস্তান পার্টি নেতা মিয়া মোহাম্মদ ইফতেখার উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। দেখুন আজাদ ১৭ নভেম্বর' ১৯৫৩।

২০. ১৯৫২ সালে পূর্ব বংগে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হওয়ায় তিনি 'প্রজা' শব্দটি পার্টির নাম থেকে বাদ দেন এবং তদস্থলে 'শ্রমিক' শব্দ গ্রহণ করেন। তিনি নতুন দলটির জন্য নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণা করেনঃ সভাপতি জনাব এ. কে. ফজলুল হক, সহ-সভাপতি (ক) জনাব কফিউ উদ্দিন চৌধুরী, এ্যাডভোকেট, (খ) মওলানা রোকন উদ্দীন, এম. এল. এ (গ) গিয়াস উদ্দীন আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক-জনাব আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, এ্যাডভোকেট, যুগ্ম-সম্পাদক (ক) জনাব বি. ডি. হাবিবুল্লাহ বি. এল. ,(খ) জনাব মোহাম্মদ সোলায়মান, সংগঠন সম্পাদক-জনাব মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, বি. এ.; অফিস সম্পাদক-জনাব মোঃ তাফাজ্জল হোসেন, যুগ্ম-কোষাধ্যক্ষ- (ক) *জনাব* গোলাম কাদের, (খ) জনাব এস. ই. কবির, বি. এ. দেখুন আজাদ, ৪ ডিসেম্বর ১৯৫৩।

২১. দেখুন *আজাদ*, ২৭ নভেম্বর ১৯৫৩, ২৯ নভেম্বর ১৯৫৩।

২২. *তদেব*, ২৭ নভেম্বর, ১৯৫৩।

২৩. এ প্রসংগে বঙ্গলাল সেন মন্তব্য করেছেন, "However, as the political situation developed infavour of the UF, the Conservative party, the NIP Which was led by Mawlana Atahar Ali, Some how nanaged to enter the said alliance".দেখুন, Rangalal Sen, *Op. Cit*, P. 118.

২৪. এ বিষয়ে মওলানা ভাসানী ও ফজলুল হকের যুক্ত বিবৃতি দেখুন, আজাদ ৫ ডিসেম্বর, ১৯৫৩; হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল পত্রঃ প্রথম খন্ড, ১৯০৫-১৯৫৮* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২), গ. ৩৭২ হক-ভাসানী-সোহরাওয়াদী যুক্তফ্রন্টকে নেতৃত্ব দেন। ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দী নির্বাচনে প্রার্থী হননি। ভাসানী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনকে অগ্রাধিকার দিতে চেয়েছেন, আর সোহরাওয়াদী জাতীয় পর্যায়ে রাজনীতি করবেন হেতু প্রাদেশিক নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেননি। ফলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, নির্বাচনে জয়লাভ করলে হক সাহেব যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারী বোর্ডের নেতা নির্বাচিত হবেন।

২৫. Rangalal Sen, *Op, Cit*, P. 119;

২৬. Keith Callard, *Op. Cit*. P. 58, f-n. 1.

২৭. *Ibid*, P 125 ; তাদের মধ্যে যুব লীগের ও গণতন্ত্রী দলের সকলেই এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির ৪ জন নির্বাচনে জয় লাভ করেন। *Ibid*.

২৮. Najma Chowdhury, *Op, Cit*, P 169.

২৯. এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, *আজাদ*, ২১ ডিসেম্বর, ১৯৫৩। শেষ পর্যন্ত এই পার্টি থেকে পাঁচজন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন; দেখুন, Najma Chowdhury, *Op, Cit*, P 169.

৩০. নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট সমর্থিত ছাত্রদের ভূমিকা সম্পর্কে তৎকালীন ঢাকাস্থ Anglo-American 'Friends Centre' এর ভারপ্রাপ্ত অফিসার মন্তব্য করেছিলেন, Nurul Amin, the Chief Minister, was tumbled down from power largely through the help given by the Students of the Province. They are king makers, constitutes a political force.'উদ্ধৃতি দেখুন, Rangalal Sen, *Op. Cit*, P 126.

৩১. *আজাদ*, ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৩

৩২. *তদেব* ৫ জানুয়ারী, ১৯৫৪

৩৩. *তদেব*, ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪

৩৪. *তদেব*, ২১ জানুয়ারী, ১৯৫৪

৩৫. *তদেব*, ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৩; ৮ জানুয়ারী, ১৯৫৪

৩৬. *তদেব*, ৮ ডিসেম্বর, ১৯৫৩

৩৭. *তদেব*, ২৮ নভেম্বর, ১৯৫৩

৩৮. *তদেব*, ৩১ জানুয়ারী, ১৯৫৪

৩৯. *তদেব*, ৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪

৪০. *তদেব* ৪ মার্চ, ১৯৫৪

৪১. *তদেব*, ২৮ নভেম্বর, ১৯৫৩

৪২. বিস্তারিত দেখুন, Najma Chowdhury, *Op, Cit*, PP 118-120.

৪৩. *Ibid*, PP 132 -138

৪৪. নির্বাচনে বিভিন্ন দল ও জোটের প্রার্থী সংখ্যা বিভিন্ন Source এ বিভিন্ন রকম উল্লেখিত হয়েছে। সবগুলো Source বিশ্লেষণ করে আমি এখানে উল্লেখিত সংখ্যাটা কিছুটা সঠিক বলে মনে করি।

৪৫. যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলোর প্রার্থী সংখ্যা ছিল নিম্নরূপঃ

আওয়ামী লীগ	=	১৭৫ (এর মধ্যে	আওয়ামী লীগ	=	১৪০
কৃষক শ্রমিক পার্টি	=	৩৫	যুবলীগ	=	১৫
নিজামে এছলামী	=	২০	গণতন্ত্রী দল	=	১০
			কম্যুনিষ্ট পার্টি	=	১০

দেখুন Rangalal Sen, *Op, Cit*, P. 125; যুক্তফ্রন্টের নমিনেশন বোর্ড গঠন নিয়ে বেশ জটিলতার সৃষ্টি হয়। হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী এই বোর্ডের সদস্য মনোনীত হওয়ার

কথা। কিন্তু তাতে আওয়ামী লীগের সদস্যসংখ্যা হয় দুই–ফলে কৃষক শ্রমিক পার্টির কিছু উপনেতা গোলযোগ সৃষ্টি করেন। এ প্রসঙ্গে আবুল মনসুর আহমদ উল্লেখ করেছেন, মনকষাকষি দুই প্রধান নেতা হক সাহেব ও ভাসানী সাহেবের মধ্যে সংক্রামিত হইল। ফলে যুক্তফ্রন্টের ভিত্তি পাকা হইতে অযথা বিলম্ব হইল, যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গিয়া যায় যায় আর কি? শহীদ সাহেব এ অবস্থার অবসান ঘটালেন। তিনি নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিয়ে হক ও ভাসানী এই দু' সদস্য বিশিষ্ট নমিনেটিং বোর্ড গঠন করেন। তবে এই বোর্ডের নমিনেশন নিজামে এছলামীর মনঃপুত হয়নি। তাই তারা নিজামে এছলামীর ৩৭ জন প্রার্থীকে যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে দাড় করিয়ে দেন। বিস্তারিত দেখুন, আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর* (ঢাকাঃ সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড, ১৯৮৯) পৃঃ ৪৬–৪৭; Najma Chowdhury, *Op, Cit*, P 162.

৪৬. সাধারণ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত = ৩ জন
সাধারণ আসনে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী = ২৫ জন
তফসিলী আসনে = ১১ জন
মোট ৩৯ জন

৪৭. বর্ণ হিন্দু আসনে ৯ এবং তফসিলী আসনে ১ জন। প্রার্থীদের নামের তালিকা দ্রষ্টব্যঃ *আজাদ*, ১ এবং ১১ জানুয়ারী ১৯৫৪

৪৮. গণতন্ত্রীদলের প্রার্থী সংখ্যা কত ছিল তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি; আনুমানিক ১০ বা ১৫ হতে পারে– অবশিষ্ট হবে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সংখ্যা।

৪৯. Najma Chowdhury, *Op, Cit*, P. 170.' মোট ১৭৯৪ জন প্রার্থী নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছিলেন; ৯৪ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়–বাকীরা প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করেন। দেখুন আজাদ ২৪ জানুয়ারী ১৯৫৪। নির্বাচন কমিশন রিপোর্ট অনুযায়ী ১৭৮৬ জন প্রার্থী মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছিলেন; এর মধ্যে ১০০টি মনোনয়ন পত্র বাতিল হয়, ৩৯৬ জন মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করে নেন। বিস্তারিত দেখুন *Report on the Election to East Bengal Legislative Assembly, 1954, Op, Cit*, P.14 কেন্দ্র অনুসারে প্রার্থীদের নামের তালিকা দেখুন। *আজাদ*, ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৪ থেকে পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে। যে পাঁচজন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন তাদের নামের তালিকা দেখুন তদেব, ২৬ জানুয়ারী ১৯৫৪।

৫০. এটা লক্ষণীয় যে, আজ থেকে৪২ বৎসর পূর্বে ৯টি মুসলমান মহিলা আসনের জন্য ৩২ জন মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

৫১. বিস্তারিত দেখুন, Najma Chowdhury, *Op, Cit*, PP 168-169.

৫২. *আজাদ*, ১ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৪

৫৩. *তদেব*, ২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪

৫৪. নির্বাচন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীবর্গ এবং মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ঘন ঘন পূর্ববাংলা সফরে আসেন এবং প্রদেশের আনাচে কানাচে জনসভায় অংশ গ্রহণ করেন। এমন কি মিস ফাতেমা জিন্নাহ ও পক্ষকাল ব্যাপী পূর্ববাংলা সফর করেন এবং মুসলিম লীগকে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান। বগুড়ার মোহাম্মদ আলী ছিলেন তখন পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী।

নির্বাচনী সভা করতে তিনি চারবার পূর্ববাংলায় আসেন। এ প্রসঙ্গে তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) লিখেছেনঃ

পশ্চিম পাকিস্তানে বৃহৎ পুঁজিপতিরা প্রকাশ্যে ক্ষমতাসীন দলকে অর্থ যোগাইতে লাগিলেন ..... প্রধানমন্ত্রী হোমরা চোমরা নেতৃবৃন্দ সমভিব্যাহারে স্পেশাল ট্রেন আর চার্টার্ড স্টিমারে নির্বাচনী অভিযান শুরু করেছিলেন। দেশের সংবাদপত্রগুলোও প্রায় একচেটিয়া মুসলিম লীগকে সমর্থন দিতে লাগিলেন। দৈনিক ইত্তেফাকের বয়স তখন সবেমাত্র ১ মাস। চার পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পত্রিকা 'দৈনিক মিল্লাত' নির্বাচনের পূর্বে মুসলিমলীগের সমর্থক ছিল। কিন্তু মোহন মিয়ার লীগ হইতে বহিষ্কার এবং যুক্তফ্রন্টে যোগদানের পর এই পত্রিকাটি যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন দিতে লাগিল।

দেখুন, তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), *পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর*, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল লিঃ ১৯৮১) পৃঃ ৪৮-৪৯। মানিক মিয়া উল্লেখ করেছেন যে, 'দৈনিক সংবাদ' তখন মুসলিম লীগের পত্রিকা ছিল। দেখুন, তদেব, পৃঃ ৪৯।

৫৫. *আজাদ*, ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৫৩

৫৬. ইশতেহারটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২৭শে জানুয়ারী ১৯৫৪ তারিখে। ৮ই মার্চ পর্যন্ত তা মাঝে মধ্যেই ছাপানো হয়।

৫৭. এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, আবুল মনসুর আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬-৪৭; Rangalal Sen, *Op, Cit*, P. 120;

৫৮. যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারণা সংক্রান্ত 'জালিম-শাহীর ছয় বৎসর' শীর্ষক প্রচার পুস্তিকা দেখুন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধঃ দলিলপত্র* প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭৬-৩৮৬; 'সোহরাওয়ার্দ্দীর নির্বাচনী সার্কুলার', তদেব, পৃঃ ৩৭৫; 'যুক্তফ্রন্টের প্রচার কার্য শুরু', 'জনগণের সাড়া' প্রভৃতি আলোচনা দেখুন, আবুল মনসুর আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০-৫৪।

৫৯. *আজাদ*, ১৮ নভেম্বর, ১৯৫৩

৬০. তদেব, ২৮ নভেম্বর, ১৯৫৩

৬১. তদেব, ১ ডিসেম্বর, ১৯৫৩

৬২. তদেব, ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৩

৬৩. তদেব, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৫৩; কেউ ইচ্ছে করলে ভোটার তালিকা কিনতে পারতেন। ভোটার তালিকার প্রতি পৃষ্ঠার মূল্য চার আনা নির্ধারিত হয়। একটি নির্বাচনী এলাকার পুরো ভোটার তালিকার মূল্য নিম্ন ১৮/=টাকা উর্ধ্বে ৩১৮/- টাকা নির্ধারিত হয়। বিস্তারিত দেখুন *Report on the Election to East Bengal Legislative Assembly, 1954, Op, Cit*, P.8, para-18.

৬৪. উক্ত নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা, নমিনেশন পত্র জমা দেওয়ার পদ্ধতি, নির্বাচন গ্রহণের পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ের জন্য দেখুন, "The East Bengal Legislative Assembly Electoral (Conduct of Elections) Rules, 1953".

৬৫. *আজাদ*, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৫৩

৬৬. প্রতীকগুলো ছিলঃ নৌকা, গরুরগাড়ী, ফুল, হারিকেন, দাঁড়িপাল্লা, ছাতা, পুস্তক, সাইকেল, হুকা, খেজুরগাছ, ধানের শীষ, দোয়াত কলম, ঘড়ি, কাঠের চেয়ার, আম, টেবিল, আনারস,

রাইফেল, তলোয়ার, তালা চাবি, কুড়াল, কাঁচি, হাঁস ও ঢোল। তদেব, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৫৩; আরও দ্রষ্টব্য; Govt of East Bengal (Home Dept.: Constitution and Election), *Election Manual* vol. I; *Rules* (Dacca: East Bengal Govt. Press, 1953), p.56.

৬৭. *আজাদ*, ২ ডিসেম্বর, ১৯৫৩

৬৮. তদেব, ৮ মার্চ, ১৯৫৪; বিস্তারিত দেখুন *Report on the Election to East Bengal Legislative Assembly*, 1954, *Op, Cit*, P.10.

৬৯. নির্বাচন গ্রহণের কেন্দ্রভিত্তিক তারিখ দ্রষ্টব্যঃ আজাদ, ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৪ থেকে পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে।

৭০. তদেব, ৬ মার্চ, ১৯৫৪; বিস্তারিত দেখুন, *Report on the Election to East Bengal Legislative Assembly*, 1954, *Op, Cit*, P.16-19.

৭১. *আজাদ*, ১৪ জানুয়ারী, ১৯৫৪

৭২. *তদেব*, ১৪ নভেম্বর, ১৯৫৩

৭৩. *তদেব*,

৭৪. *তদেব*, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৫৩

৭৫. *তদেব*. ২৭ নভেম্বর, ১৯৫৩

৭৬. এই বাহিনীর কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে বাহিনীর সেক্রেটারী জেনারেল ও কেন্দ্রীয় অর্থ ষ্টেটমন্ত্রী মি মোর্তজা রেজা চৌধুরী ঘোষণা করেন, লীগ প্রার্থীদের পক্ষে প্রচারকার্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাহায্য দানের জন্য যতদূর সম্ভব দ্রুত প্রদেশের যে কোন স্থানে যাইতে সবুজকোর্তাদলের স্বেচ্ছাসেবক ও বক্তাগণ তৈরী হইয়া আছেন। যাহাদের এই সাহায্যের প্রয়োজন আছে–তাহারা যেন অবিলম্বে কেন্দ্রীয় মোছলেম লীগ অফিসে সেক্রেটারী জেনারেল দফতরের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন। স্বেচ্ছাসেবকগণ যথাসম্ভব দ্রুত প্রার্থীদের আহ্বানে সাড়া দিবেন। তদেব, ২৯ জানুয়ারী ১৯৫৪।

৭৭. *তদেব*, ২১ জানুয়ারী ১৯৫৪

৭৮. *তদেব*, ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪

৭৯. *তদেব*, ৪ মার্চ ১৯৫৪; বংগলাল সেনের মতে প্রায় ১২০০ প্রগতিবাদী ব্যক্তিকে আটক করা হয়–এরা প্রায় অধিকাংশই ছিলেন কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য। এর ফলে এই দলের অনেক নেতাকর্মী আন্ডারগ্রাউণ্ডে চলে যান। দেখুন, Rangalal Sen, *Op, Cit*, P. 121; মানিক মিয়ার মতে সাত–আটশো কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, দেখুন তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৫০

৮০. *আজাদ*, ২ মার্চ, ১৯৫৪

৮১. তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪৯

৮২. *আজাদ*, ২৪ জানুয়ারী ১৯৫৪; প্রত্যেক প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় ধার্য করা হয়েছিল নির্বাচনী এলাকায় ভোটার প্রতি তিন আনা হিসেবে মোট যা হয়। কিন্তু এ নিয়ম কেউ মেনেছিলেন বলে মনে হয় না।

৮৩. *তদেব*, ৪ মার্চ, ১৯৫৪

৮৪. *তদেব*, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪

৮৫. *তদেব*, ৯ মার্চ, ১৯৫৪

৮৬. *তদেব*

৮৭. Kamal Uddib Ahmed, *Op, Cit*, P 472

৮৮ক. *Ibid*

৮৮খ. মহিলা আসনের নির্বাচনে মহিলা ভোটারের উপস্থিতির হার ছিল নিম্নরূপঃ মুসলমান মহিলা = ৩৭.৪৮% তফসিলী মহিলা = ৩৫.৬২% সাধারণ আসনে, মুসলমান মহিলা = ৬.০৬% সাধারণ হিন্দু মহিলা = ২১.৭৩% তফসিলী হিন্দু মহিলা = ১২.৬৪%, বৌদ্ধ মহিলা = ১০.৯৭%, বিস্তারিত দেখুন, *Report on the Election to East Bengal Legislative Assembly*, 1954, *Op, Cit*, P.16, Para-8.

৮৯. Rangalal Sen, *Op, Cit*, P. 124; Keith callard, *Op, Cit*, P. 57.

৯০. Najma Chowdhury, *Op, Cit*, P. 171; *আজাদ* ২রা এপ্রিল সংখ্যায় ফলাফল. একটু ভিন্নরকম দেখানো হয়েছে। দ্রষ্টব্যঃ *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ; দলিলপত্র* প্রথম খন্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩৮৯।

৯১. *আজাদ*, ৪ এপ্রিল ১৯৫৪

৯২. Keith callard এই সংখ্যা ২২ বলে অভিহিত করেছেন। যুক্তফ্রন্টের শরিকদলগুলোর আসনসংখ্যা নিম্নরূপ ছিল বলে ক্যালার্ড মন্তব্য করেছেনঃ

আওয়ামী লীগ	=	১৪২
কৃষক শ্রমিক পার্টি	=	৪৮
নিজামে এছলামী	=	১৯
গণতন্ত্রী দল	=	১৩

দেখুন Keith callard, *Op, Cit*, P. 59, f-n-3; ক্যালার্ডের এই সংখ্যা ৪৫ নং টিকায় উল্লেখিত সংখ্যার সঙ্গে মিলছে না। নির্বাচনে জয়লাভের পর কিছু সদস্য হয়তো KSP-র সমর্থক হন।

৯৩. *আজাদ*, ২৪ মার্চ, ১৯৫৪; ২৫ মার্চ ১৯৫৪; ২ এপ্রিল ১৯৫৪।

৯৪. খালেক নেওয়াজ খান এবং নূরুল আমীনের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৮০৮৬ ও ১১,৪৭৯। দেখুন তাদের ১৭ মার্চ ১৯৫৪; *Report on the Election to East Bengal Legislative Assembly*, 1954, *Op, Cit*, P.49.

৯৫. *তদেব*, ১৪ মার্চ ১৯৫৪

৯৬. *তদেব*, ১০ মার্চ ১৯৫৪

৯৭. *তদেব*, ১৪ মার্চ ১৯৫৪

৯৮. *তদেব*, ১১ মার্চ ১৯৫৪

৯৯. *তদেব*, ২২ মার্চ ১৯৫৪। এ প্রসঙ্গে কামরুদ্দিন আহমদ ও অলি আহাদের মূল্যায়ন দেখুন, কামরুদ্দীন আহমদ, *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি* (ঢাকাঃ স্টুডেন্ট পাবলিকেশন্স, ১৩৭৬) পৃঃ ১২৩–১২৪। অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫–১৯৭৫* (ঢাকাঃ অলি আহাদ, তারিখ নেই), পৃঃ ২০৮–২১০

১০০. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত* পৃ-৫৪

১০১. *আজাদ*, ২২ মার্চ, ১৯৫৪

১০২. Najma Chowdhury, *Op, Cit*, PP 309-323.

১০৩. ফজলুল হক দুটি আসনে নির্বাচিত হয়ে ১টি ছেড়ে দেন, ফলে '৫৪ সালে নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ৩০৮ এবং পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে নির্বাচিত ১৪ জন এই মোট ৩২২ জন।

১০৪. Najma Chowdhury, *Op, Cit*, PP 309-311.

১০৫. বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ *Ibid*, PP 313-316.

১০৬. *Ibid*, PP 317-320.

১০৭. *Ibid*, PP 320-321.

১০৮. এই হার কম হওয়ার কারণ এই যে, তৎকালীন পার্লামেন্ট সদস্যরা অধিকাংশই মুসলিম লীগের টিকেটে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন এবং পরাজিত হন। অপরপক্ষে যুক্তফ্রন্টের অধিকাংশ সদস্য ছিলেন জাতীয় রাজনীতিতে নবীন-যারা এর পূর্বে জেলা কিংবা থানা পর্যায়ের রাজনীতিবিদ ছিলেন।

১০৯. নির্বাচনের সুফল পূর্ববাংলার জনগণ ভোগ করতে পেরেছিলেন কি-না, তাদের আশা আকাঙ্খার কতটুক বাস্তবায়িত হয়েছিল, ২১ দফা দাবীসমূহের পরিণতিই বা কি ঘটেছিল, পাকিস্তানের রাজনীতিতে এই নির্বাচনের প্রভাব কি হয়েছিল ইত্যাদি প্রশ্ন গবেষণার দাবী রাখে। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধের কলেবর সীমিত রাখার চেষ্টার কারণে উক্ত বিষয়সমূহ এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে যুক্তফ্রন্ট সরকারের কার্যকলাপে তাদের সফলতা-ব্যর্থতা এবং ১৯৫৪ পরবর্তী রাজনীতিতে তার প্রভাব নিয়ে স্বতন্ত্র গবেষণা হওয়া আবশ্যক।

পরিশিষ্ট - 'ক'

যুক্তফ্রন্টের ২১- দফা, যুক্তফ্রন্ট প্রচার দপ্তর। জানুয়ারী, ১৯৫৪।

একুশ দফা

নীতিঃ কোরান ও সুন্নার মৌলিক নীতির খেলাফ কোন আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবন ধারনের ব্যবস্থা করা হইবে।

১। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হইবে।

২। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করিয়া ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হইবে এবং উচ্চ হারের খাজনা ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হইবে এবং সার্টিফিকেটযোগে খাজনা আদায়ের প্রথা রহিত করা হইবে।

৩। পাট ব্যবসায়কে জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্যে তাকে পূর্ববংগ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনয়ন করিয়া পাটচাষীদের পাটের মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে এবং লীগ মন্ত্রীসভার আমলের পাট কেলেংকারী তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৪। কৃষি উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রর্বতন করা হইবে ও সরকারী সাহায্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা হইবে।

৫। পূর্ববংগকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য সমুদ্র উপকূলে কুটির শিল্প ও বৃহৎ শিল্পে লবণ তৈয়ারীর কারখানা স্থাপন করা হইবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভার আমলের লবণের কেলেংকারী সম্পর্কে তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৬। শিল্প ও কারিগরি শ্রেণীর গরীব মোহাজেরদের কাজের আশু ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হইবে।

৭। খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

৮। পূর্ববংগকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করিয়া ও কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা হইবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

৯। দেশের সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হইবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সংগত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১০। শিক্ষা ব্যবস্থার আমুল সংস্কার করিয়া শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকরী করিয়া কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে এবং সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহের বর্তমান ভেদাভেদ উঠাইয়া দিয়া একই পর্যায়ভুক্ত করিয়া সকল বিদ্যালয়সমূহকে সরকারী সাহায্যপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১১। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কানুন বাতিল রহিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া উচ্চশিক্ষাকে সস্তা ও সহজলভ্য করা হইবে এবং ছাত্রাবাসের অল্প ব্যয়সাধ্য ও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করা হবে।

১২। শাসন ব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে উচ্চ বেতনভোগীদের বেতন কমাইয়া ও নিম্ন বেতনভোগীদের বেতন বাড়াইয়া তাহাদের আয়ের একটি সুসংগা সামঞ্জস্য বিধান করা হইবে। যুক্তফ্রন্টের কোন মন্ত্রী এক হাজারের বেশী বেতন গ্রহণ করিবেন না।

১৩। দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, ঘুষ রিশওয়াত বন্ধ করার কার্যকরী ব্যবস্থা করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী পদাধিকারীর ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সময়ের আয় ব্যয়ের হিসাব- নিকাশ লওয়া হইবে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে না পারিলে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

১৪। জন নিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালাকানুন রদ ও রহিত করত বিনা বিচারে আটক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইবে ও রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হইবে এবং সংবাদপত্র ও সভা-সমিতি করিবার অধিকার অবাধ ও নিরংকুশ করা হইবে।

১৫। বিচার বিভাগকে শাসন-বিভাগ হইতে পৃথক করা হইবে।

১৬। যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাড়ীতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিবেন এবং বর্ধমান হাউসকে আপাততঃ ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষা গবেষণাগারে পরিণত করা হইবে।

১৭। বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবীতে যাহারা মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার গুলিতে শহীদ হইয়াছেন তাহাদের পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হইবে এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

১৮। ২২শে ফেব্রুয়ারীকে শহীদ দিবস ঘোষণা করিয়া উহাকে সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করা হইবে।

১৯। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববংগকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌমিক করা হইবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয় (অবশিষ্টাত্মক ক্ষমতাসমূহ) পূর্ববংগ সরকারের হাতে আনয়ন করা হইবে এবং দেশরক্ষা বিভাগের স্থল-বাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তান ও নৌবাহিনীর হেড-কোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হইবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণের কারখানা নির্মাণ করতঃ পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হইবে। আনসার -বাহিনীকে সশস্ত্রবাহিনীতে পরিণত করা হইবে।

২০। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা কোন অজুহাতেই আইন পরিষদের আয়ু বাড়াইবে না। আইন পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ছয় মাস পূর্বেই মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করিয়া নির্বাচন কমিশনের মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন।

২১। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার আমলে যখন যে আসন শূন্য হইবে, তিন মাসের মধ্যে তাহা পূরণের জন্য উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে এবং পর পর তিনটি উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হইলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিবেন।

সূত্রঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র প্রথম খণ্ড, ১৯০৫-১৯৫৮, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭৩-৩৭৪।

প্রাবন্ধিক-এর বিশ্ববীক্ষাঃ প্রেক্ষিৎ - বাংলাদেশ

(ইং ১৯৭২ - ইং ১৯৯৩)

সন্দীপক মল্লিক

দৃকপাৎ - ১

বিষয় – অবগাহণের প্রাক্‌লগ্নেই 'বিশ্ববীক্ষা' এই সুবদ্ধ এবং চিন্তান্বিত পদটি সঞ্জীবিত হোক প্রাণ–প্রাণান্তরেঃ

ক. বিশ্ব = বিশ্ (প্রবেশ করা + ব (বিশেষ্য)। জগৎ।[১]

খ. বীক্ষণ = বি – ইক্ষ্ + অনট। (বিশেষ্য) নিরীক্ষণ।[২]

গ. বীক্ষা = দর্শন।[৩]

তাহলে 'বিশ্ববীক্ষা' বলতে জগৎ অর্থাৎ বিশ্ব–নিরীক্ষণই বুঝায়। আরও পরিচ্ছন্ন হয় 'বিশ্ব–সম্পর্কিত সম্যক ধারণা' এই কথা বললে।

ঘ. 'বিশ্ববীক্ষা'কে বাঙালী বুদ্ধিজীবী বহুল প্রচারিত জর্মন শব্দ 'Weltanschauung' এর সমান্তরালেই দাঁড় করান্। 'Weltanschauung' এর প্রণিধানযোগ্য ত্রিবিধ অর্থ[৪] আমরা পাইঃ

i) 'a conception of the course of events in and of the purpose of the world as a whole forming a philosophical view or apprehension of the universe: the idea embodied in a cosmology: outlook of the world-called also world view.

ii) Philosophy of the life: IDEOLOGY.

iii) The cosmologic conception of society and its institutions held by its members.

দৃকপাৎ-২

মানুষের স্বসম্মুখ ান–বিষয়ক বিতর্কসহ বিশ্বপটের অন্যান্য প্রাণী–উদ্ভিদ তথা বস্তুনিচয়ের উৎপত্তি, চরিত্র ও উপযোগিতা বিচার প্রাচ্য–প্রতীচ্যে হরহামেশাই গতিমান। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় এমন অনুশীলনীয় বিষয় উজ্জ্বল ভূমিকা সুদূর এবং অদূর অতীতেও রেখেছে। তবে, নবরস (আদি,

হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত)-সিঞ্চিত মানবীয় বিচিত্র অনুভাবনাই জীবনীয় হয়েছে বেশী। আর্থ-ব্যক্তিক-পারিবারিক-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আবর্তনে অস্থির হয়েও মানুষ সস্থিরতার কল্পনা করেছে সর্বক্ষণেই। ভৌগোলিক পরিবেশ বিচিত্র হলেও এই ইহজাগতিক চিন্তাকর্মসূত্রকে তারা হারিয়ে ফেলেনি। এই পৃথিবীর কোন্ গোলার্ধে, কোন্ দেশে মানুষ কী ভাবছে? অতীত সঞ্চয়িত বর্তমান তৃষ্ণায় ভবিষ্যৎ কোন্ রূপমায় সেজে গুজে উঠবে, উঠতে পারে বা ওঠা উচিৎ এমন ধ্যানের প্রসার আধুনিক এইকালের communicative enlightenment এর কারণে পৃথিবীর প্রত্যন্ত দেশের সনিষ্ঠ বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর অন্তঃঅবয়বে আবরণ হয়ে দীপ্ত হচ্ছে। Satelite অভিনিবেশেও এক দেশের অনুভাবনা, মনস্বিতা, বিজ্ঞাননিষ্ঠা প্রযুক্তি কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দীপান্বিত হচ্ছে সমগ্র পৃথিবীর মানবীয় প্রাণ-বলয়ে। বস্তুতঃই 'আধুনিক মানুষ এবং তার সভ্যতা একদেশীয় নয়, এর ভিত্তি প্রসারিত সারা বিশ্বে।'[৫] সংগতকারণেই, 'আধুনিক সাহিত্যের যুগে প্রতিটি সাহিত্য ....গূঢ় অর্থে ভূগোল-নিরপেক্ষ। দেশ ও সমাজ কৃষ্টি ও কালের বিচারে বহুদেশদর্শী।'[৬]

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ইং ১৯৭১-এ 'বাংলাদেশ'-এর অভ্যুদয় তথা বাঙালী মানবগোষ্ঠীর স্বভাবজ সম্মুখ ান একটা আঞ্চলিক প্রক্রিয়া হয়েও তা বিশ্বমানব অন্তরেরই একটা প্রদীপ্ত প্রসারণা। দক্ষিণ এশিয়ার এই অঞ্চলের মানবগোষ্ঠীর ধ্যান, জিজ্ঞাসা তথা সাহিত্য সাংস্কৃতিকবোধ বিশ্বায়তনিক পরিধিতেই সমজ্ঞীবিত আজ।

দৃকপাৎ-৩

বাংলা ভাষাদ্যুতিঃ লোকায়ত 'চর্যাপদ' অতি প্রাকৃত হয়েও এর জীবনশাসনিক সুশ্রী, নারী-নিসর্গের লাবণ্য আধুনিকায়ত। বলাই বাহুল্য যে, রসনৈবেদ্য দেশ-কাল-ভেদে নির্বিকারই থাকে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যেও ব্যক্তি সত্তাকে উর্বর করবার অনুশীলন প্রত্যক্ষ করা গেছে। পদাবলী অভিনিবেশে ব্যক্তিতে সার্বভৌম অভিব্যক্তিই সমুজ্জ্বল। তা উপাদেয়ও বটে। তবে, বেনিয়া ইংরেজ গোষ্ঠীই বাঙালীর মনস্বিতাকে সমৃদ্ধ করে। বাঙালীর বিশ্ববীক্ষাকে পরিশীলিত করে। ইং ১৮০০-তে ইংরেজ মিশনারী গোষ্ঠী অভিষিক্ত হয় বাঙালীর মননে। গদ্যায়তনিক প্রাণাবেগে আপ্লুত হয় বাঙালী, যাতে মূলতঃই ছিলো ইউরো-সঞ্চিত আধুনিকতার আবেশ। এই আবেশ নিয়েই ব্যক্তিক অন্তঃরসকে বাক্যান্বিত করেন বঙ্কিমচন্দ্র। যা ছিলো তাঁর বিশ্ববীক্ষানিষ্যন্দী একটা প্রক্রিয়া। তবে, সার্বভৌম সার্বজনীন অনুভূতির লীলাময় ধারক রবীন্দ্রনাথই বাঙালী তথা সমগ্র দক্ষিণ এশিয়াবাসীর বিশ্ববীক্ষার চিরন্তনী ফোয়ারাকে আত্মঃস্থ করেন। তাঁর সৃজনীশক্তিতে বিশ্বমানবেরই আত্যন্তিক অভিপ্রায় সংবদ্ধ হয়েছিলো।

ত্রিশের দশকে, কিংবা তার পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথের অনুগমন শৈলী ও প্রকরণে প্রগাঢ় না হলেও চিন্তা সমুন্নতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন ছিলো। তাছাড়া, ইং ১৯৪৭-এ বাঙালীর মানসবিপ্লব ছিলো

অপরিচ্ছন্ন। কিন্তু, ঐ অপরিচ্ছন্নতার কারণেই বাঙালী বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিকে এবং সাংস্কৃতিক অভীজ্ঞাকে বিশ্বপটাশ্রয়ী করতে সাহসী হন। আর, এই সাহসিকতারই ফলশ্রুতি পঞ্চাশ দশকের সত্তাসম্পোষণা, ষাট দশকের স্বাধিকারদীপ্তি এবং সত্তর দশকের সুসম্মুখান, মূলতঃ যা মানবতানন্দিত বিশ্বশ্রীমণ্ডিত এক পরাপায়ণ।

দৃকপাৎ-৪

অনুভাবনায় পোক্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর প্রবন্ধধারা, যা যুগপৎ স্বদেশ-আদৃত এবং কালরঞ্জিত হয়েও বিশ্বভাবনান্বিত। কবি-সমালোচক আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর নিরীক্ষাধর্মী একটি 'ছক'[৭] এখানে উপস্থাপনযোগ্য। তিনি তাঁর ছক-এ এইভাবে স্বাধীনতা উত্তর প্রবন্ধধারাকে বিভক্ত করেছেনঃ

ক. প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যচর্চা;
খ. আধুনিক সাহিত্য চর্চা;
গ. রবীন্দ্রচর্চা;
ঘ. নজরুলচর্চা;
ঙ. লোকসাহিত্য চর্চা;
চ. ভাষাচর্চা;
ছ. ভাষা-আন্দোলন-বিষয়ক প্রবন্ধ ও গবেষণা;
জ. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রবন্ধ ও গবেষণা;
ঝ. প্রবন্ধ ও গবেষণা-বিষয়ক প্রবন্ধচর্চা ও
ঞ. সম্পাদনা ও সাহিত্যকর্ম।

তবে, সাম্প্রতিক দশকগুলোতে প্রবন্ধচর্চার ক্ষেত্রে 'উপযোগবাদী ও আর্থ-সামাজিক সাহিত্য বিচার পদ্ধতি এমন প্রবল হয়ে উঠেছে যে সাহিত্যের চিরন্তন যে অন্তর্মূল্য ও অন্তর্বস্তু, তাতে আমরা অনেক সময় বিস্মৃত হয়েছি।'[৮] তাতে, ফল হয়েছে এইঃ 'সাহিত্য যে শেষ পর্যন্ত চিন্ময় ব্যাপার, সাহিত্য যে মানব সংস্কৃতিরই একটি অংশ এই সবই ভুলে যেতে হয়।'[৯] তবে, এ-কথা স্মরণে রেখেও বলা যায় যে, পূর্বে উল্লিখিত 'ছক'-এ প্রদত্ত বিষয়াবলীতে বস্তুতঃ ভৌগোলিক সীমানাবদ্ধ বাঙালীদের সত্তাজাগৃতির বিচিত্র-ভাব-প্রযুক্তিকে প্রাসংগিক করা হয়েছে, যাতে মূলতঃই বিশ্ববীক্ষণের প্রকরণ সংবদ্ধ। এ প্রসংগে বিশ্ববীক্ষাদীপ্ত একজন প্রাবন্ধিকের দু'টি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যাকঃ

ক. তিনি স্বকালের বিশ্বপটের অতীতায়ত কর্মভাবৈশ্বর্য্যের ধারক হয়েও বিশ্বপটের বিজ্ঞাননিষ্ঠ কল্যাণী বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের সহযোগী;

খ. তিনি স্বদেশের অতীত-ঐতিহ্য-সংস্কৃতির সংবাহক হয়েও স্বদেশের বিজ্ঞাননিষ্ঠ কল্যাণী বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে শপথবদ্ধ।

বলাবাহুল্য যে, আর্থ-ব্যক্তিক-পারিবারিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাতাবরণ ঐ বুদ্ধিজীবীর বিচিন্তার ভূমিস্বরূপ সুস্থিত হয়ই। আবার, নান্দনিক তৃষ্ণা, জীবনজিজ্ঞাসা তথা জীবনের অন্তর্বস্তু-নিরীক্ষণের আত্যন্তিকতাও সুমিশ্রিত হয়ে থাকে তাঁর বর্ণ-পদ-বাক্যসমন্বিত চিন্তাস্রোতে।

দৃকপাৎ-৫

পূর্বোক্ত বিশ্লেষণী পটানুসারে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তরকাল (ইং ১৯৭২- ইং ১৯৯২)-এর বিশ্ববীক্ষাদীপ্ত প্রাবন্ধিক হিসেবে অনেকেই সমুজ্জ্বল। যেমনঃ আবুল ফজল, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, আহমদ শরীফ, সৈয়দ আলী আহসান, আবদুল হক, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, বদরুদ্দীন উমর, মাহমুদ শাহ কোরেশী, আহমদ ছফা, আবুল কাসেম ফজলুল হক প্রমুখ।

আবুল ফজল এর চিন্তাচেতনা ছিলো মানবীয় গুণদীপনারই আধার। আয়ুষ্কালে তিনি ঋজু গদ্যেরই সংবাহক ছিলেন। তাঁর বিশ্ববীক্ষাঃ

'শিল্প ও শিল্পী স্বধর্ম হারালে সমাজও স্বধর্ম তথা মানবধর্ম না হারিয়ে পারে না। সাহিত্যের প্রাণবায়ু ও তার বিচিত্র অনুভূতি থেকে যে সমাজ বঞ্চিত, সে সমাজ অপরিণত মানুষের সমাজ-তথা 'ছোটলোকের সমাজ'।[১০]

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী-র মনন জন্মভূমির মাটি আর মানুষের অলঙ্করণে সজীব। তাঁর দেশপ্রেমদীপ্ত অনুভব যেন বিশ্বভৌমিক মমতার সুঘ্রাণ ছড়ায়। তাঁর অনুভবঃ

'বাংলাদেশে, আমাদের সংগ্রামের দিনগুলিতে, এবং আমাদের স্বাধীনতার জন্মলগ্নে আমরা অতি দ্রুত এবং অত্যন্ত চড়া রঙে, আমাদের কল্পনার বাংলাদেশের একটি ছবি এঁকেছিলাম। এই ছবি আঁকায় এমন কিছু নতুনত্ব ছিলো না। আমেরিকার বৃটিশ কলোনীর জনগণ, ফরাসী বিপ্লবের সময়ের ফরাসী জনগণ, রুশ বিপ্লবের কালে ওদেশের বিপ্লবীরা, স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যারা প্রাণপাত করেছে তারা সবাই এভাবেই স্বপ্ন দেখেছে, এভাবেই ছবি এঁকেছে'।[১১]

সৈয়দ আলী আহসান-এর অনুভাবনায় অখণ্ড মানবসত্তারই উজ্জীবনী অভিব্যক্ত। বিশ্বসাহিত্যের অলিন্দে তাঁর অবাধ যাতায়াত। নোবেল লরিয়েট ডেরেক ওয়ালকট-এর বিশ্বভাবনা সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে তিনি যেন সুসম্মুখিত হয়েছেন। তাঁর উচ্চারণঃ

'ওয়ালকটের কবিতার ব্যপকতা অনেক। তিনি সমুদ্রের কল্লোলের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীকে আনতে চেয়েছেন। কেননা সমুদ্র তো শুধু ক্যারীবীয় দ্বীপপুঞ্জে নেই, সমুদ্র তো পৃথিবীকে বেষ্টন করে

আছে। তাঁর নিজস্ব চৈতন্যের সাড়া সমুদ্র তরংগ দ্বারা বাহিত হয়ে পৃথিবীর সকল দেশকেই স্পর্শ করছে এটা তিনি ভাবছেন।[১২]

আহমদ শরীফ-এর ধ্যানে সম্পৃক্ত বাঙালী সত্তার উৎস অভিজ্ঞান। তবে, তাঁর বোধের অন্তঃপটে এই সত্যই প্রোজ্জ্বল যে, তাঁর ঐ উৎসমুখী অন্বেষা অখণ্ড মানব সংস্কৃতি উজ্জীবনেরই সহায়ক একটা প্রক্রিয়া।

তাঁর মননায়ত উদ্ভাসনাঃ

ক. 'দেশ কাল প্রতিবেশের ছাঁচে গড়ে ওঠে জীবন। সেই জীবনের শিকড় থাকে অতীতে এবং আলো হাওয়া থাকে সমকালে।'[১৩]

জীবিকা সম্পৃক্ত জীবনের সার্বক্ষণিক ও বহুধা অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি। জীবন জীবিকাগত নয় কেবল, স্থান ও গোষ্ঠীগতও। মানবসংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য, বিভিন্নতা, বিবর্তন ও বৈষম্য ঘটে এ কারণেই।'[১৪]

আবদুল হক বাংলাদেশের প্রবন্ধ-সাহিত্যের প্রস্তুতি-পর্বকেই সমৃদ্ধ করেছেন।[১৫] তাঁর গদ্যে স্বদেশের সংস্কৃতি ও সমাজনীতি যুগপৎ দ্যুতিময় হলেও তাতে বিশ্বমানবীয় ভাবানুভূতির অলঙ্করণ প্রদীপ্ত। তাঁর উক্তিঃ

'সাহিত্যের মূল্যমান নিয়ত পরিবর্তনশীল, শুধু নিজের অন্তর্নিহিত কারণে নয়। সাহিত্যের সংগে নূতন সাহিত্য এবং তারপর আরও নতুন সাহিত্য নিরন্তর সংযুক্ত। এই কারণে শুধু একটা বিশেষ মানবগোষ্ঠীর মধ্যে, একটি সাহিত্যের চিন্তা-অনুভব-প্রকৌশল অন্য সাহিত্যের চিন্তা-অনুভব-প্রকৌশলের ওপর ছায়াপাত করছে।'[১৬]

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী মাতৃভূমি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল নিরীক্ষায় সর্বদাই ব্যস্ত। তাঁর বোধের আয়তনে কর্তব্যোজ্জ্বল সুস্থিরতা। তাঁর পঠন-পাঠনের বিস্তৃতিও বহুধা। প্রতীচ্যের অন্তঃসম্পদও তাঁর সৃজন-কল্পনায় অভিষিক্ত। তিনি বৈশ্বিক। 'প্রবন্ধ' বিষয়ে তাঁর উক্তিঃ

'প্রবন্ধকার সাহিত্যকে কোনদিক দিয়ে জীবনবিচ্ছিন্ন বলে মনে করেন না। স্থান ও কালকে অতিক্রম করে যায় বটে, কিন্তু সাহিত্য বিশেষ স্থানেই রচিত হয়।'[১৭]

আলাউদ্দিন আল আজাদ-এর চেতনায় প্রতীচ্যের উজ্জীবনী সংরাগ। তিনি বিশ্বশিক্ষা-দীপান্বিত। তাঁর দীপ্ত উচ্চারণঃ

'আমাদের নিজেদের মুক্তি ও বিকাশের স্বার্থেই আমাদের বিশ্বসাহিত্যকে দেখা চাই; বোঝা চাই; কারণ অতীতে যেমন ছিলো আজকের দিনে বিশেষ করে, মানবশিল্পধারা একই অবিচ্ছিন্ন নন্দনতাত্ত্বিক গতিবেগ।'[১৮]

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান স্বদেশ-সমুত্থিত এক সব্যসাচী সাহিত্যিক হয়েও বৈশ্বিক অনুভাবনায় সম্পন্ন। কবি বিষ্ণুদে-র সমালোচনায় সেই অনুভাবনাই উচ্চকিত। তাঁর বিশ্বাসী শব্দমালাঃ

'কবি বিষ্ণুদে-র সৃষ্টি-সম্ভার বিপুল। স্মরণীয়, তিনি এলিয়ট, পাউণ্ড, অডেন, স্পেণ্ডার, বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো, মালার্মে, আরাগঁ, এলুয়ার এবং আরো অনেক বিদেশী কবির আত্মীয়। তবু দ্রুত তিনি স্বভূমি পেয়েছেন; হননি স্বদেশে উদ্বাস্তু, দেখেছেন তাঁর দেশের পরিপ্রেক্ষিত থেকে। ..... উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা এবং পরবর্তী সকল সংকটের মধ্যে আশাবাদের প্রবল শিখা জ্বালিয়ে ..... প্রত্যাশার অভিমাত্রায়।'[১৯]

আবু হেনা মোস্তফা কামাল ছিলেন 'কল্লোলিত শব্দরাজি'র[২০] সংবাহক, যে শব্দরাজিতে অন্তঃশিল্পেরই দ্যোতনা, যা বিশ্বমানসদীপ্তিরই আধার। তাঁর উচ্চারণঃ

"একজন সৎ কবিকে ফিরে আসতেই হয় তাঁর নিজস্ব শেকড়ে; মৃত্তিকায়, বাসভূমে ..... কখনো অন্বিষ্ট তাকে হাতছানি দেয় দূরে-যেখানে মোহন চোরাবালি, কখনো সেই ভূগোলে-যার অপরিচিত রহস্যময় জলবায়ু, তরুলতার সংগে কথোপকথনের ভাষা খুঁজে পেতে রক্তাক্ত হয়ে যান।"[২১]

বদরুদ্দীন উমর সচকিত বাঙালীত্বের অন্তঃঅবয়ব পরিস্ফুটনে। আর, সেকারণেই বাঙালীর আর্থ-সামাজিক ঐতিহ্য অন্বীক্ষায় নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। বাঙালী জাতিকে বিশ্বদীপ্ত করার চিন্তানিরীক্ষাতেও তিনি সজীব, প্রাণবন্ত। তাঁর একটি উক্তিঃ

'একজন বাঙালীর পক্ষে মৎস্য-ভোজী, সংগীতামোদী এবং বিশ্বশান্তিকামী হওয়ার পথে কোনো বাধা-বিপত্তি নেই।....মৎস্যভোজন, সংগীতশ্রবণ এবং বিশ্বশান্তিকামনার দ্বারা তার বাঙালীত্বের খর্ব হয় না। এটা হয়না তার কারণ এ কাজগুলির মধ্যে কোনো অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব অথবা বিরোধ নেই।'[২২]

মাহমুদ শাহ্ কোরেশী'র প্রবন্ধে বিশ্ববীক্ষণের অন্তঃশৈলীই যেন জীবন্ত। বিশ্ব-লোকজ 'মটিফ' সন্ধানী কোরেশী স্বদেশাত্মার গতি প্রকৃতি নির্ণয়েও ধ্যানী। তাঁর উচ্চারণঃ

'আধুনিককালের সাহিত্যে, চিত্রকর্মে, থিয়েটার, সিনেমা ও নৃত্যে বহু মানুষের আশা ও আশাভংগের ইতিবৃত্ত অবশ্যই বর্ণিত ও চিত্রিত। কিন্তু যুগ-যুগান্তের যে ঐতিহ্যবাহী ধারা যা শুধু ব্যক্তি-মানুষ নয়, ব্যক্তি ও পরিবার, পরিবার ও সমাজ, সমাজ ও অঞ্চল, অঞ্চল ও সমগ্র দেশ, দেশ ও বহির্বিশ্ব ছাড়িয়ে তার বিবিধ সম্পর্কের সূত্র ধরে অর্থাৎ আদি-অন্তের এক মানবগোষ্ঠীর বিচিত্র জীবনপ্রবাহ ও কর্মকাণ্ডের আসল রূপ হিসেবে ফুটে ওঠে তখন তাকেই বলি ফোকলোর।'[২৩]

আহমদ ছফা ন্যায়তঃই বিশ্বমানবতার সংগুপ্ত আবরণকে আভরণ- হিসেবেই পরিচিত করাতে আগ্রহী। তাঁর বিশ্বাসী গদ্যায়তনে কর্মশ্রীই দীপ্ত। তাঁর সংলাপঃ

'মানবজাতি এক, তাদের স্বার্থ, কল্যাণ এক এবং অবিচ্ছিন্ন। .....মানুষের ভবিষ্যৎ ভালোবাসায় এবং ভালোবাসার নব নব সূত্র এবং ক্ষেত্র উদ্ভাবনের মধ্যেই কল্যাণশীল শিক্ষার অঙ্কুর সুপ্ত রয়েছে।'[২৪]

আবুল কাসেম ফজলুল হক বাঙালী বুদ্ধিজীবীর জীবনজিজ্ঞাসা ও বিশ্ববীক্ষা–সম্পর্কে চিন্তান্বিত। তাঁর বাক্যের শরীরে শৈল্পিক লাবণ্য এবং বিশ্ববৌদ্ধিক অলংকারেরই সমন্বয়। তাঁর কথকতাঃ 'চৈতন্যহীন, হৃদয়হীন, বুদ্ধিহীন, আবেগ–অনুভূতিহীন, চরিত্রহীন, পদলেহী, উচ্ছিষ্টলোভী, সুবিধালোভী, মেরুদণ্ডহীন, আত্মবিক্রীত, অন্তঃসারশূন্য, তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের জন্য সাহিত্য রচনা করতে গেলে লেখককেও অবশ্যই চৈতন্যহীন, হৃদয়হীন, বুদ্ধিহীন হতে হবে এবং সকল প্রকার সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা জীবনজিজ্ঞাসা ও মূল্যবোধ মন থেকে মুছে ফেলে দিয়ে 'শিল্প শিল্পের জন্যই' এই শ্লোগান তুলতে হবে।'[২৫]

আন্তঃকথা

এ–কথা স্বীকার্যঃ সনিষ্ঠ প্রাবন্ধিক–মাত্রেই দেশ, কাল এবং বিশ্বায়ত ভাবৈশ্বর্য্যকে প্রবন্ধের বিষয়বস্তুরূপে উজ্জ্বল করেন। এই সূত্রে ইং ১৯৭২–ইং ১৯৯৩ কালপটে আরও অনেক প্রাবন্ধিকই সমুজ্জ্বল। তাঁদের মধ্যে আবু জাফর শামসুদ্দীন, কবীর চৌধুরী, শাহাবুদ্দীন আহমদ, আতাউর রহমান, সনজীদা খাতুন, আনিসুজ্জামান, মোস্তফা নূরউল ইসলাম, যতীন সরকার, আবদুল মান্নান সৈয়দ, সনৎকুমার সাহা, আলী আনোয়ার, সৈয়দ আকরম হোসেন, নরেন বিশ্বাস, সারোয়ার জাহান, সাঈদ–উর রহমান, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, বেগম আকতার কামাল এবং সিদ্দিকা মাহমুদার নাম উল্লেখ করা যায়। অনেক তরুণ প্রাবন্ধিকও ইতোমধ্যে প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রেখেছেন।

তথ্যপঞ্জী

১। কাজী আবদুল ওদুদ (সংকলক), *ব্যবহারিক শব্দকোষ (২য় খণ্ড)*, বহুল পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতাঃ ডি. কে. প্রেস, পৃঃ ৭৩৯

২। ঐ, পৃ. ৭৪৪

৩। ঐ

৪। N. Webster, *Webster's third new International Dictionary*, Chicago: William Benton, 1966, p. 2596

৫। সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, 'বিশ্বসাহিত্যের প্রেক্ষাপটে বাংলা সাহিত্য', 'একুশের প্রবন্ধ' ৯০, প্রথম প্রকাশ; ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯০, পৃঃ ৮৩

৬। ঐ, পৃ. ১৭-১৮

৭। আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'স্বাধীনতা উত্তর বাংলা সাহিত্যের রূপান্তর; বিষয় ও প্রকরণ প্রসংগ প্রবন্ধ ও গবেষণা' একুশের প্রবন্ধ ১৯৮৮, প্রথম প্রকাশ, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮. পৃ. ১৭-১৮

৮। ঐ, পৃ. ১৯

৯। ঐ

১০। আবুল ফজল, 'শিল্পীর স্বাধীনতা', *নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন*, প্রথম প্রকাশ; ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮১, পৃ. ১২৮

১১। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, 'অমর একুশে বক্তৃতা', *একুশের প্রবন্ধ*, প্রথম প্রকাশ; ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯০, পৃ. ৫ - ৬

১২। সৈয়দ আলী আহসান, 'ডেরেক ওয়ালকটের কবিতা', *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ই নভেম্বর, ১৯৯৩, পৃ. ৬

১৩। আহমদ শরীফ, 'উপক্রমণিকা', *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, প্রথম প্রকাশ; ঢাকাঃ বর্ণমিছিল, ১৯৭৮, পৃ. ১

১৪। আহমদ শরীফ, 'বাঙালীর সংস্কৃতির উৎস ও ভিত্তি', ঐ, পৃ. ১৪

১৫। বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'বাংলাদেশের সমালোচনা-সাহিত্য গদ্যশৈলী', *বাংলাদেশের সাহিত্য*, প্রথম, প্রকাশ; ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯১, পৃ. ১২৯

১৬। আবদুল হক, 'মূল্যায়নের মরীচিকা', *নিঃসংগ চেতনা ও অন্যান্য*, প্রথম প্রকাশ; ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪, পৃ. ৬

১৭। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'প্রসংগ-কথা', দ্বিতীয় *ভূবন*, প্রথম প্রকাশ; ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪

১৮। আলাউদ্দিন আল আজাদ, 'বিশ্বকাব্যের মহাবিস্ময়ঃ জাঁ আর্তুর র‍্যাঁবো', *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২১শে অক্টোবর, ১৯৯৩, পৃ. ৫

১৯। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *আধুনিক বাংলা কবিতাঃ প্রাসংগিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত*, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১৭৪-১৭৫

২০। বিশ্বজিৎ ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫

২১। আবু হেনা মোস্তফা কামাল,'প্রত্যাবর্তন নিজ বাসভূমে', *কথা ও কবিতা*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা মুক্তধারা, ১৯৮১, পৃ. ১৪৬

২২। বদরুদ্দীর উমর, 'বাঙালীর সংস্কৃতির সংকট', *সংস্কৃতির সংকট*, প্রথম প্রকাশ; ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭৪, পৃ. ৩ - ৪

২৩। মাহমুদ শাহ কোরেশী, 'মার্কিন ফোকলোর' *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ই নভেম্বর, ১৯৯৩, পৃ.৫

২৪। আহমদ ছফা, 'শিক্ষার দর্শন', *বাঙালী মুসলমানদের মন*, প্রথম প্রকাশ; ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮১; পৃ. ৪২

২৫। আবুল কাসেম ফজলুল হক *কালের যাত্রার ধ্বনি*, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ৭০

বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা এবং শিল্পী রশীদ চৌধুরী

আবু তাহের বাবু

সারসংক্ষেপঃ

বর্তমানে সারা বিশ্বে আধুনিক চিত্রকলা বিকাশের সাথে সাথে বাংলাদেশেও আধুনিক চিত্রকলা বিস্তৃতি লাভ করেছে। ১৯৪৭-এর দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে ঢাকার আর্ট স্কুলকে কেন্দ্র করে চিত্রকলা চর্চার যে পটভূমি তৈরী হয়, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পরে তা যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করেছে। এ সময় শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা বাংলাদেশের চিত্রকলাকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিচিত এবং সমমানে দাঁড় করিয়েছেন তাঁদের মধ্যে শিল্পী রশীদ চৌধুরী উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর ছবিতে যেসব মাধ্যম, বিষয় এবং আঙ্গিকের সমাবেশ ঘটিয়েছেন তার মধ্যে আপন দেশীয় স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। অবশ্য স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি বঙ্গদেশে গোড়া থেকেই পরিলক্ষিত হয়। আমরা দেখি, শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে বাংলা চিত্রকলার ঘরানা সৃষ্টির প্রয়াস শুরু হয়েছিল। তাঁর প্রচেষ্টা ছিল পরম্পরার শিকড় অন্বেষণে অতীতের দর্শনে আত্মবলোকন। তথাপি একথা স্বীকার করতেই হয় যে, বাঙলা ঘরানা সে সময় শিল্পীদের মধ্যে এক সর্বব্যাপী দেশাত্মবোধের চেতনা গড়ে তুলতে সহায়ক হয়েছিল। বাংলাদেশের শিল্পীদের কাজেও এই চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। আজ যখন আমাদের চিত্রকলায় দেশীয় পরিচিতির কথা আসে তখন কিছু শিল্পী 'শিল্পের ভাষা আন্তর্জাতিক' এই ধুয়া তুলে জাতীয় পরিচয়ের প্রসংগটি অবান্তর করে ফেলার প্রয়াস পান। যদিও চিত্রকলা মাধ্যমটি দৃশ্যমান শিল্পের অন্তর্ভূক্ত এবং ভাষাগত দিক দিয়ে আন্তর্জাতিক, তবু শিল্পী হলেন দেশ প্রেমিক ও সমাজ সচেতন। চিত্রশিল্পীরা তাঁদের চিত্রকলায় দেশের মানুষ ও প্রকৃতি তথা বিশ্বের মানব জাতি ও প্রকৃতির কথাই তুলে ধরেন। অর্থাৎ চিত্রকলায় দেশীয় পরিচিতির মধ্যেই আন্তর্জাতিকতা রূপলাভ করে যা আমাদের দেশের আধুনিক চিত্রকলা আন্দোলনের শিল্পীদের কাজে সহজে প্রত্যক্ষ করা যায়।

ভূমিকাঃ

পঞ্চাশ দশকে বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা চর্চায় যে ক'জন উল্লেখযোগ্য চিত্রশিল্পীর আবির্ভাব ঘটে রশীদ চৌধুরী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সম্ভবত তিনি সেই বিশিষ্ট শিল্পী যাঁর মধ্যে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের মতাদর্শের সার্থক প্রতিফলন ঘটেছিল। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন বাংলাদেশে ঢাকায় চারুকলা চর্চার প্রথম প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা থেকে সোনারগাঁয়ে লোকশিল্প যাদুঘর প্রতিষ্ঠা ও কারুশিল্পীদের জন্য কারুপল্লী গঠনের পরিকল্পনা করে গেছেন, ঠিক তেমনি শিল্পী রশীদ চৌধুরী চট্রগ্রামে দু'টি চারুকলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়েছেন, একটি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় ও

দ্বিতীয়টি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ এবং সোনারগাঁর আদলে বয়ন-শিল্পীদের জন্য তাপিশ্রী-পল্লী নির্মাণের পরিকল্পনা করে গেছেন। পাশাপাশি চিত্রকলা চর্চাতেও দেখা যায় শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন যেমন মনে প্রাণে ছিলেন বাঙালী এবং গভীর মমত্ববোধ নিয়ে তিনি বাংলার গ্রামীণ মানুষ ও প্রকৃতির ছবি এঁকেছেন, গ্রামীণ লোক শিল্পের আঙ্গিক নিয়ে আধুনিক চিত্রকলায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, তেমনি শিল্পী রশীদ চৌধুরীর চিত্রকলাতেও দেখা যায় বাঙালী মন ও বাংলার পল্লী জীবনের লোককথা, প্রাচীন সংস্কার, রূপকথা ও পুঁথির প্রতীক। চিত্রের মাধ্যম নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন দেশীয় ঐতিহ্য জলরং মাধ্যমে বেশী ছবি এঁকেছেন, অন্যদিকে শিল্পী রশীদ চৌধুরী দেশীয় ঐতিহ্যের মাধ্যম বয়ন-শিল্পের পথ ধরে এদেশে প্রথম ট্যাপেষ্ট্রি মাধ্যমে চিত্র রচনা করেছেন। এজন্যই যেমন রশীদ চৌধুরী আমাদের দেশের একজন প্রথম সারির চিত্রশিল্পী, ঠিক তেমনি "একজন আন্তর্জাতিক প্রতিভাবান শিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।"[১] তাঁর চিত্রকলার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিল্পীর সুহৃদ অধ্যাপক মাহমুদ শাহ কোরেশী লিখেছেন- "কল্পনা ও স্মৃতিজাত নিসর্গ এবং নরনারী - এ এক উদ্দাম কল্পনা যা মানুষী কোমলতায়, রঙ-রেখার প্রকৌশলী রহস্যময়তায় সুষম অভিব্যক্তিতে মূর্ত।... শিল্পী প্রায়শ উত্তীর্ণ হয়েছেন বাঙালি মরমীদের মতো এক সিদ্ধির জগতে।"[২] তাঁর চিত্রের এই বিষয় প্রকাশে, মাধ্যম ও আঙ্গিকের ব্যবহারে তিনি একজন আধুনিক শিল্পী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

বস্তুতঃ শিল্পকলায় 'আধুনিক' অধ্যায় শুরু হয়েছে 'রোমান্টিসিজম' শিল্প আন্দোলন থেকে। এই আধুনিক শিল্প আন্দোলনের মূল কথা হল, "বস্তুসত্তার উপকরণ বা বাস্তবতা শিল্পীর লক্ষ্য নয়, শিল্পীর লক্ষ্য হচ্ছে বিশেষ অনুভূতি যা প্রতিস্পন্দিত হয় তার শিল্পকর্মে"।[৩] অর্থাৎ "প্রকৃতির হুবহু প্রতিলিপি শিল্পে অনুকৃত হয় না। প্রকৃতির বাস্তবতা ও শিল্পের বাস্তবতা আলাদা। শিল্পে যা সৃষ্টি হয়, তা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যুক্তরূপ। শিল্প তাই যৌগিক।..... একটি অঙ্কিত রূপককে আমরা দু'ভাবে দেখি। একটি দেখা কনফিগারেটিভ বা আকারগত দেখা, অপর দেখা রিপ্রেজেনটেটিভ বা প্রতিনিধিমূলক দেখা। একটি গাছ যখন আঁকা হয় তখন প্রকৃতপক্ষে কিছু রেখা টানা হয় ও রঙ লাগানো হয়। গাছের রূপটিকে রেখায় রঙে অনুবাদ বা রূপান্তরিত করা হয়। এই রেখা রঙ প্রকৃত গাছ নয়। আকারগত দেখা হল রঙে রেখায় দেখা। সাধারণ দর্শক যখন গাছের ছবিটি দেখেন তখন রেখা রঙের গুণ আলাদা করে দেখেন না, দেখেন গাছটির প্রতিনিধিত্ব। সচেতন দর্শক প্রথম দেখা থেকে দ্বিতীয় দেখাকে বাদ দিয়ে দেখেন না।"[৪]

শিল্পী রশীদ চৌধুরী ও তাঁর চিত্রকর্মঃ

১৯৩২ সালের ১৩ই নভেম্বর ফরিদপুরের হারোয়া গ্রামে শিল্পী রশীদ চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে শিল্পী রশীদ ছিলেন বিদ্রোহী, প্রতিবাদী ও রোমান্টিক চরিত্রের। এসব দিক যেমন তাঁর শিল্পের মধ্যে কাজ করেছে তেমনিই কাজ করেছে তার আধুনিক মানসিকতা ও

দেশপ্রেম। ১৯৫২ সালে তিনি ভাষা আন্দোলনের পোষ্টার এঁকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন। তারপর তাঁর চিত্রকলায় বিষয় এসেছে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য ও দেশের খেটে খাওয়া মানুষের জীবনচিত্র। এরপর স্পেন ও ফ্রান্সের শিল্প শিক্ষা জ্ঞান তাঁকে একজন পুরোপুরি আধুনিক শিল্পী হিসাবে পরিপূর্ণতা দান করেছে। প্রথম পর্যায়ে শিল্পী মার্ক শাগালের প্রভাব তাঁর কাজে লক্ষ্যণীয়। এজন্য শিল্পী কামরুল হাসান বলেছেন–"রশীদ আসলেও মার্ক শাগালের মতোই রোমান্টিক ছিল। গ্রামীণ জীবন মানুষ গৃহপালিত পশু নিয়ে রশিদের মনে নানা রকম খেলা করত। পরবর্তীকালে তাঁর অতি আধুনিক চিত্রকলায় বাংলার লোকজ রঙ, রেখা এবং মূল আঙ্গিকের প্রতিফলন দেখা গিয়েছিলো। তাঁর ট্যাপেষ্ট্রিতেও সেই ধারা রূপ পেয়েছিল।"[৫] শিল্পী মার্ক শাগালের চিত্রের ভাষা ছিল 'স্যুররেয়ালিস্‌ম' বা পরাবাস্তববাদ। স্যুররেয়ালিস্ত শিল্পীরা অবচেতন মনের বা স্বপ্নের অনুভূতিকে ছবিতে প্রকাশ করে থাকেন। ফ্রান্সের কবি অঁদ্রে ব্রতোঁ প্রথম কবিতায় স্যুররেয়ালিস্‌ম চিন্তার প্রকাশ ঘটান, এরপর শিল্পকলার মধ্যে তার প্রসার ঘটে। সাইকোএনালিসিসস বা মনঃসমীক্ষণ স্বপ্নের বিচিত্র দৃশ্য অথবা উপলব্ধি স্যুররেয়ালিস্‌ত চিত্রকর্মে রূপ পায়। অর্থাৎ শিল্পীরা এসব চিত্রে অবচেতনকে মুক্ত করেছেন জীবনের বিচিত্র প্রতিবন্ধকতা থেকে। স্বপ্নের অনুভূতির একটা রূপ আছে। স্বপ্নের ভেতর বিভিন্ন বস্তু আকৃতির রূপ বদলে যায়, বিভিন্ন আকৃতি কখনো ধীরে ধীরে বড় হয়ে মিলিয়ে যায়, আবার তা কখনো ভেসে বেড়ায়, একটার সাথে আরেকটি সংযুক্ত হয়ে বা সমন্বয় হয়ে পড়ে, কখনো বা একটি আরেকটির সাথে জুড়ে গিয়ে একটি ভিন্ন আকৃতিতে রূপ নেয়। আর এ সমস্ত কল্পনার সাথে কোন না কোনভাবে বাস্তব জগতের মিল থাকে,কেননা– মানুষ তার চেনা জগৎ ও পরিবেশকে নিয়েই স্বপ্ন দেখে। শিল্পী মার্ক শাগাল তাঁর শৈশবের ছেড়ে আসা গ্রাম ও তার পরিবেশসহ স্মৃতিপটের সবকিছুকে স্বপ্নের অনুভূতিতে ছবিতে প্রকাশ করেছেন। যেমন, তাঁর আঁকা 'আই এ্যাণ্ড দা ভিলেজ' ছবিতে তাঁর রুশ দেশের নিজের গ্রাম ও তার পারিশার্শ্বিকতাকে প্রকাশ করেছেন। এই ছবিতে স্বপ্নের অনুভূতিতে মানুষ, ঘরবাড়ী কোথাও কোথাও শূন্যে ভেসে আছে বা উল্টে গেছে, আবার ছাগলের মাথার ভেতর ছাগলের দুধ দোয়ানো হচ্ছে দেখানো হয়েছে। তাঁর আরেকটি ছবি 'জন্মদিনে' যে রোমান্টিকতা দেখানো হয়েছে তাতে স্বপ্ন আবেশে ভাসমান এক প্রেমিক তার প্রেমিকাকে উলটো দিক থেকে এসে চুম্বন করছে। শিল্পী রশীদ চৌধুরীর মধ্যে এই ছবিটির প্রভাব তখনকার (ষাটের দশকের প্রথমভাগে) সময়ের ছবিতে দেখা যায়। কেননা শিল্পী রশীদ চৌধুরীও ছিলেন প্রকৃতিবাদী ও রোমান্টিক। তিনিও শৈশবে তাঁর দেখা গ্রামকে বারবার ছবিতে প্রকাশ করেছেন। রোমান্টিক মানসিকতার জন্য তাঁর স্বপ্নের মধ্যে ছবিতে কৃষাণী কখনো কলসি কাঁখে গ্রামের মধ্যে ভেসে যাচ্ছে, কখনো বা মাঠ থেকে গরু নিয়ে বাড়ী ফিরছে।

এরপরের অধ্যায়ে আমরা তাঁর চিত্রে এসে দেখবো বাংলার লোকজ জীবন ভিত্তিক বিষয়ের পাশাপাশি লোকশিল্পের আঙ্গিক এর প্রয়োগ। যেমন তাঁর 'ষড়ঋতু' ছবিতে দেখতে পাওয়া যায়

গ্রামীণ জীবনেরই একটি দিক– বিবাহ করে বর তার কনেকে সাথে করে পাল্কীতে চড়ে বাড়ী ফিরবে। পথে নৌকায় ঘাট পারাপার করতে হবে, নদীর পানিতে ভাসমান নৌকা আছে, স্বচ্ছ পানিতে মাছ আছে। ছবির পশ্চাৎপটে নকসী কাঁথায় যেরূপ বিভিন্ন মোটিফ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আঁকা হয়, সেরূপ বিভিন্ন বস্তু আকৃতি বিষয়ের সাথে সংগতি রেখে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এঁকেছেন। এইরূপে জীবনের বিভিন্ন দিকই তিনি এই ছবিতে প্রকাশ করেছেন। এই ছবির লম্বা আকারের কম্পোজিশনে দেখা যায় 'ন্যারেটিভ' বা বর্ণনা ভিত্তিক উপস্থাপনা যা আমাদের এই উপমহাদেশেরই শিল্পরীতি। রং ব্যবহারের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায় বাংলায় পটুয়া শিল্পীরা যেরুপ পট চিত্রে দ্বিমাত্রিক উজ্জ্বল রং ও বর্হিরেখা ব্যবহার করে, অনেকটা সেরূপ তিনিও ব্যবহার করেছেন, তবে এখানে রয়েছে তাঁর আধুনিক মেজাজ অর্থাৎ 'এ্যাবস্ট্রক্ট এক্সপ্রেশনিস্ম' ধারার প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়। ছবিটি ফ্রেসকো মাধ্যমে দেয়াল চিত্র, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আঁকা রয়েছে।

এরপর বাংলার লক্ষ্মীসড়া পটচিত্রের পটভূমিতে আঁকা 'আমার সোনার বাংলা' ছবিতে তিনি সড়াচিত্রের আকৃতিসহ 'ফ্লাট' বা সমতল উজ্জ্বল রং ব্যবহার করেছেন, তবে তাতে ত্রিমাত্রিকতার আঁধার এনেছেন। এতে তিনি বস্তু আকৃতিকে জ্যামিতিকভাবে সাজিয়ে তাকে নিজস্ব ঢংয়ে প্রকাশ করেছেন। এই ছবিটি তিনি প্যারিসে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১–এর পরে শুরু করেছিলেন। পরে রেশমে তৈরী ট্যাপেষ্ট্রিতে কাজটি করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্য। বঙ্গবন্ধু এই কাজটি খুবই পছন্দ করেছিলেন। শেরে বাংলা নগরে গণভবনে এটি রাখা ছিল, কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ কাজটি আর দেখা যায়না। ছবিটির রহস্যজনকভাবে অর্ন্তধান ঘটেছে। এই ছবিই আবার খয়েরী পশ্চাৎপটে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের জন্য তিনি তৈরী করেছেন আরেকটি। এই ছবিতে তিনি বাংলার প্রাচীন লোক–বিশ্বাসের শক্তির ও শান্তির প্রতীক দুর্গাকে এঁকেছেন, তাতে একহাতে দুর্গা যেমন বাংলার অসুরকে বধ করেছেন, অপর হাতে শান্তির প্রতীক শুভ্র পদ্ম ফুলকে ধরে আছে দেখিয়েছেন। এটা যেন প্রতীকি হিসাবেই একাত্তরের অত্যাচারী অসুর পাক–বাহিনীদের বধ করে বাংলাদেশে স্বাধীনতা ও শান্তি স্থাপনের দৃশ্যকেই এঁকেছেন। এতে তিনি রং ব্যবহার করেছেন বিদ্রোহের রং হিসাবে লাল ও হলুদ, শোকের রং হিসাবে কালো রং ও শান্তির রং হিসাবে সাদা রং দিয়ে।

তিনি বাংলার লোক–বিশ্বাসের পুঁথি ও প্রাচীন সংস্কারের বিভিন্ন বিষয়কে বেছে নিয়ে চিত্রকলা রচনা করেছেন। এটা তিনি করেছিলেন নিজের দেশকে নিজের সমাজকে একান্তভাবে আপন করে নিতে। ফলে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসহ দেশীয় ঐতিহ্য ও দেশীয় শিল্প রীতি ছবিতে প্রকাশ করেছেন, যাতে করে পাশ্চাত্য শিল্পীদের প্রভাবমুক্ত হতে পেরেছেন, চিত্রে সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিজস্ব ভূবন। এইসব বিষয়ের ভিতর তিনি ধর্মীয় আচার বিশ্বাস বা সংস্কারকে নিয়ে আমাদের প্রাচীন

আদিবাসীদের কল্পনা জগতের ধ্যান--ধারণাগুলোর সুন্দরের দিকটা প্রকাশ করেছেন, অর্থাৎ তাঁরা যে শক্তিকে, যে প্রেমকে বিশ্বাস করেছেন, সেই আদি শক্তি ও আদি প্রেমরসকে তিনি ছবিতে এনেছেন বারবার। এইরূপ প্রাচীন পর্যায়ের বিভিন্ন উৎস থেকেই ছবির উপাদান তিনি সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু তা তাঁর ছবিতে প্রকাশ করেছেন বর্তমানের প্রেক্ষাপটে ও সমসাময়িক চিত্ররীতি বা আধুনিক শিল্পধারার সাথে সংগতি রেখে। অর্থাৎ ছবিতে তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে এক করেছেন, এবং তাতে নিজস্ব ব্যক্তিত্বে প্রাচীন প্রাচ্য ও আধুনিক পাশ্চাত্যের শিল্পের উপাদানকে সম্পৃক্ত করেছেন। বিভিন্ন 'ফর্ম' বা আকৃতিকে ভেঙ্গে তাকে জ্যামিতিক ছকে বা কাব্যিক ঢংয়ে সাজিয়েছেন, আর এই কাব্যিক সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনায় মানুষের দেহে হিন্দোল বা নৃত্যের দোলা এনেছেন, যেমন দেখা যায় তাঁর তেল রংয়ে আঁকা 'কিষাণী', 'বেদিনী', 'ভয়', 'সোনাভান', ইত্যাদি ছবিতে। এসব ছবিতে তাঁর রোমান্টিকতাও আদি ও অকৃত্রিম প্রেমরসের প্রকাশ ঘটেছে এবং ছবির আঙ্গিকতায় বাংলার প্রাচীন পট, টেরাকোটা ও মূর্তিকলার প্রভাব রয়েছে। যেমন বাংলার প্রাচীন বিভিন্ন মূর্তিকলায় বা পুরাকীর্তিতে মানুষের দেহে যে নৃত্যের ভঙ্গিমা পাওয়া যায়, তা তাঁর এইসব ছবিতে আছে। 'কৃষাণী' ছবিতে তিনি বিভিন্ন আকৃতিকে সমন্বয় ঘটাতে এবং তরঙ্গের গতিকে প্রকাশ করতে গিয়ে তেল রং এর দ্বারা জলরং প্রলেপ এর মতো কাজ করেছেন। 'বেদিনী' ছবিতে নমনীয় নারীদেহ নৃত্যের ভঙ্গিমায় সামনের দিকে এগিয়ে আসছে দেখানো হয়েছে। মানব দেহের এই ভঙ্গিমাকে তিনি ভেঙ্গে রং ও রেখার সাহায্যে দুই মাত্রাতে আঁকলেও তাতে তিনমাত্রার সাদৃশ্য এনেছেন এবং বক্র নারী দেহের ভঙ্গিমা ও কোমলতাকে প্রকাশ করেছেন। 'ভয়' ছবিতে তিনি কালীমূর্তিকে এঁকেছেন। তাঁর ছোট বেলায় দেখা বট গাছের নীচে কালীর থান বা পোড়ামন্দিরে কালী মূর্তি এবং কাহিনীতে শোনা কালীর ক্ষমতা সম্পর্কে যে ধারণা তিনি পেয়েছিলেন, তাঁর প্রকাশ ঘটাবার প্রয়াস করেছেন এই চিত্রে। ধূসর কালো রং এর প্রাধান্যের মধ্যে সামান্য লাল ও অন্যান্য রং কিছু ব্যবহার করে লোকশিল্পের আঙ্গিকতায় তিনি এই বিষয়বস্তুকে নিয়ে বাংলাদেশের সামাজিক জীবনের এক লোকজ বিশ্বাসের স্মৃতিকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন। এরপর তাঁর ছবিতে এসেছে প্রাকৃতিক বিভিন্ন পশুপাখী, যা নানা সময় নানারকমভাবে তিনি এঁকেছেন। এসবের মধ্যে রয়েছে তাঁর প্রকৃতি প্রেম, যে প্রেম তাঁকে সব সময় চঞ্চল করেছে। যেমন, রাধা-কৃষ্ণের তৃষ্ণার্ত প্রেমের অনুভূতি থেকে এসেছে তাঁর গুয়াশ মাধ্যমে আঁকা 'যুগল', 'অভিসারে' ইত্যাদি ছবি, অন্যদিকে প্রেমের উগ্র রূপ দেখা যায় সাপের মধ্যে। আরেকটি বড়ো নাজুক প্রেম, বৃহদাকৃতি প্রাণী হস্তীর মধ্যে যে নিগূঢ় রহস্যময় প্রেম, কেউ সহজে যা দেখতে পায় না, সেই 'প্রেমিক হাতি', 'বিয়ের হাতি', 'স্বপ্নের হাতি' এসব নাজুকতার প্রতীক হিসাবে তিনি এঁকেছেন। বাংলার লোকশিল্পের পোড়ামাটির তৈরী হাতি থেকেই তিনি এই ভাবকল্প পেয়েছেন। এরপর তাঁর 'শ্যামাংগীনী', 'মিথুন', 'জলকে চল', 'বসন্ত' ইত্যাদি ছবিতে তিনি বিষয়বস্তুকে সংক্ষিপ্তকরণ করেছেন, আবার সুরের ছন্দে তাঁর প্রকাশ ঘটাবার চেষ্টা

করেছেন। অধিকাংশ গুয়াশ মাধ্যমে আঁকা ছবি তিনি ট্যাপষ্ট্রিতে কাজ শুরু করার আগে লে-আউট হিসাবে এঁকেছেন। এইসব ছবিতে তিনি সরাসরি প্রাথমিক রং ব্যবহার করেছেন, যা সাধারণতঃ আমাদের লোকজ চিত্রকলায় ব্যবহার হয়ে থাকে। এসব ছবিতে তিনি বিভিন্ন ফর্ম বা আকৃতিগুলোকে ভেঙ্গে নিজের মতো ছড়িয়ে দিয়েছেন বা সাজিয়েছেন, অনেকটা বাংলার লোক কাহিনীগুলোর রঙ্গীন স্বপ্নের মতো। এখানে বলা যেতে পারে যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইমপ্রেশনিষ্ট শিল্পীরা যেভাবে আলোর পরিবর্তন এবং রংকে বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন, পরবর্তীতে ইউরোপের শিল্পীরা সেই রংকে একটি শুদ্ধ প্রতীক হিসাবে এবং নিজস্ব ব্যক্তিত্বে প্রকাশ করতে ব্যবহার করেছেন, শিল্পী রশীদ চৌধুরীও অনুরূপ তাঁর ছবিতে এই শুদ্ধ রং ব্যবহার করে প্রাচ্য দেশের প্রাকৃতিক কড়া সূর্যের আলোর যে গাঢ় উজ্জ্বল রং তা যেমন এনেছেন, তেমনি নিজস্ব ব্যক্তিত্বের প্রকাশও ঘটিয়েছেন।

শিল্পী রশিদ চৌধুরী তেলরং মাধ্যমে বেশী ছবি আঁকেননি, কেননা তিনি দেখেছিলেন প্রাচীন বাংলায় তেল রং মাধ্যমে কোন চিত্রকর্ম সৃষ্টি হয়নি বা এর তেমন কোন ঐতিহ্য নেই। তিনি ছবি আঁকতে চেয়েছিলেন দেশীয় মাধ্যমে, তাই তাঁর লেখা থেকে জানতে পারা যায়-"প্রচলিত তেল রং-এ আমার মন তেমন ভবতো না। .... তাই আমি এমন একটি মাধ্যম খুঁজছিলাম যার মাধ্যমে দেশ মাতৃকার নিসর্গ ও মানুষকে তুলে ধরতে পারি। আমার সন্ধান অবশেষে সার্থক হলো- ট্যাপেষ্ট্রিতে পেলাম আমার ঠিকানা"।[৬] এই ট্যাপেষ্ট্রির মাধ্যমে চিত্র রচনা করার পেছনে রয়েছে ফ্রান্সে এই মাধ্যমে শিক্ষা লাভের সুযোগ। তিনি সেখানেই এক শিক্ষকের কথায় উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তেলরং এর সাথে বাংলার ঐতিহ্যের কোন সংযোগ নেই, যেমন আছে পোড়ামাটির শিল্প ও বুনন চিত্রের। বয়ন শিল্পের ঐতিহ্য বাংলাদেশে সুপ্রাচীন, যেমন নকশী কাঁথা, জামদানী আর এক সময় জগৎ বিখ্যাত ছিল মসলিন। তাই তিনি নিজদেশে এই বয়ন শিল্পের মাধ্যম ধরে চিত্রকর্ম রচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এরপর প্যাঁরিস থেকে 'ট্যাপেষ্ট্রি'তে প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ফিরে এলেন তিনি এবং তাঁর চিত্র চর্চার শেষ অধ্যায়ে এই ট্যাপেষ্ট্রি মাধ্যমেই অধিকাংশ কাজ করে গেছেন। ইংরেজী শব্দ 'ট্যাপেষ্ট্রি'কে ফরাশিতে বলা হয় 'তাপিস্‌রী'। ফরাশিতে কার্পেটকে বলে 'তাপি', তাই শিল্পী রশীদ চৌধুরী ও তাঁর বন্ধু ডঃ মাহমুদ শাহ কোরেশী মিলে বাংলায় নামকরণ ঠিক করেছিলেন 'তাপিশ্রী'। কেননা 'মেঝের বদলে দেয়ালের জন্য যে 'শ্রী' যুক্ত 'তাপি', তাকে বলা যাবে 'তাপিশ্রী'।[৭]

ফরাশি দেশের উল্লেখযোগ্য ঐতিহ্য এই ট্যাপেষ্ট্রি শিল্প। সেখানকার প্রখ্যাত শিল্পী জঁ ল্যুরসা এই ট্যাপেষ্ট্রিকে নতুন পর্যায়ে এক শক্তিশালী শিল্প মাধ্যমে পরিণত করেন। যা পূর্বের ক্লান্তিকর কপি করা থেকে মুক্তি পেয়ে এক ভিন্ন আঙ্গিকে এবং ভিন্ন স্বাদে রসিকজন সমাদৃত হয়েছিল। শিল্পী রশীদ চৌধুরী প্যারিসে যখন শিল্পকলা শিক্ষা লাভ করছিলেন তখন প্যারিসের সকল শিল্পীরা শিল্পকলার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রবোধ নিয়ে ভাবছিলেন। এই স্বাতন্ত্র শুধু শিল্পের মাধ্যমগত দিক থেকেই

নয়, ব্যক্তি মানুষের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করেও কাজ হচ্ছিল। শিল্পকলার ইতিহাসে একেবারে শুরুতে দেখা যায় আদিমযুগের মানুষ প্রথম গুহা চিত্র রচনা করেছে, পরবর্তীতে ভাস্কর্য ও স্থাপত্য রচনা করেছে। ইউরোপের গথিক যুগের শিল্পকলায় আমরা দেখতে পাবো স্থাপত্যের কারণেই ভাস্কর্য ও চিত্রকলা রচনা করা হয়েছে, বা একসাথে মিশে গেছে। যেমন, স্থাপত্যের পিলার বা কলামগুলোই এক একটা ভাস্কর্য এবং দেয়ালগুলোর শ্রীবর্ধনের জন্য চিত্রকলা রচনা করা হয়েছে, যার বেশীরভাগই মোজাইক বা ফ্রেসকোতে। পরে রনেসঁস যুগেও আমরা দা ভিঞ্চির অপূর্ব কীর্তি 'লাষ্ট সাপার' ছবিটি দেখতে পাই ফ্রেসকো মাধ্যমে দেয়ালচিত্রে। যে ছবিটি অনেক পরে সরকারীভাবে ঐ অট্টালিকা থেকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানান্তরিত করে যাদুঘরে নিয়ে যাবার চিন্তাভাবনা করা হয়েছিল। কিন্তু যা ছিল অসম্ভব, কেননা তাতে পুরো দেয়ালটিকে তুলে নিয়ে যেতে গেলে ছবিটির অস্তিত্ব আর খুঁজে পাওয়া যেতো না। রনেসঁস উত্তর শিল্পকলা চর্চায় চিত্রশিল্পীরা চিত্রকলাকে আবার স্বাধীন সত্তায় ফিরিয়ে আনেন, যা দা ভিঞ্চি থেকে শুরু হয়েছিল, পরে বিংশ শতাব্দীতে এসে পিয়েত মনদ্রিয়ান তাঁর কনষ্ট্রাকশন চিত্রকলায় স্থাপত্যের মুল সত্তাকে ধরে সম্পূর্ণ আলাদা করেন। এতে যেমন নিজস্ব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এলো, তেমনি চিত্রকলার দ্বারা স্থাপত্যকে আধুনিকতার পথে একধাপ এগিয়ে দেওয়া হলো। এইরূপ আধুনিক যুগে প্রায় সকল শিল্পীই তাঁদের শিল্পচর্চায় নিত্যনতুন মাধ্যমে সংযোজন ঘটিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। তেমনি ফরাশি চিত্রশিল্পী জঁ ল্যুরসা ট্যাপেষ্ট্রি মাধ্যমে বিশাল দেয়াল চিত্রকলার মাধ্যমে ভিন্নতর স্বাদ নিয়ে আনেন, যা দেয়ালচিত্র হিসাবে একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তর করা সম্ভব। ইটালির রনেসঁস এর প্রথম যুগের শিল্পী ইয়ান ভান এয়ক্ যেমন তেলরং আবিষ্কার করে চিত্র শিল্পের উন্নতি ঘটিয়েছিলেন, যা ইউরোপসহ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে, তেমনি শিল্পী জঁ ল্যুরসা ট্যাপেষ্ট্রিকে ইউরোপের শিল্পধারায় বিশেষ তাৎপর্যে পুণর্বাসিত করেছিলেন। বাংলাদেশে প্রথম শিল্পী রশীদ চৌধুরী, শিল্পী ল্যুরসার পথ ধরে ট্যাপেষ্ট্রি মাধ্যমে পশমের পরিবর্তে আমাদের দেশীয় পাট ব্যবহার করে এবং দেশীয় বিষয়বস্তুতে চিত্রকর্ম নির্মাণ করেছেন। এইসব ট্যাপেষ্ট্রি চিত্রকলা তিনি বিভিন্ন মাপের এঁকেছেন, কখনো ছোট আকারের কখনো বা বিশাল আকৃতির দেয়াল চিত্রকলা হিসাবে। তাঁর ট্যাপেষ্ট্রি চিত্রকলায় লক্ষ্য করা যায় বিষয়বস্তু ও বিভিন্ন জ্যামিতিক বস্তুর আকৃতি গাঢ় অন্ধকার থেকে আলোকিত হয়ে সামনের দিকে বেড়িয়ে আসছে। এইসব ছবির পশ্চাৎপট বা ছবির বিভিন্ন আকৃতির পিছনে গাঢ় রং এবং সম্মুখে উজ্জ্বল হালকা রং ব্যবহার করেছেন। ইমপ্রেশনিষ্ট থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের পাশ্চাত্য শিল্পীরা আলোর আকৃতিকে রূপ দিতে যেভাবে জাপানী কাঠ খোদাই ছবির দৃষ্টান্ত দেখে আলোকে ভেঙ্গে ব্যবহার করেছেন, তেমনি শিল্পী রশীদ চৌধুরী তাঁর নিজস্ব ধারায় আলোর গতিকে ভেঙ্গে ছবিতে রূপ দিয়েছেন। এসব ছবিতে তিনি বিষয় হিসাবে আমাদের ধর্মীয় পূরানের ঘটনাবলী নিয়েছেন এবং উপস্থাপনায় মনুষ্য অবয়বগুলিকে লোকজ চিত্রের ভাবমূর্তিতে জ্যামিতিক ছকে ফেলে বা কাব্যিক সংক্ষিপ্তকরণ করে এঁকেছেন। যেমন

'ইভ', ও 'আদম' ইত্যাদি। এই ধারার ছবিতে তিনি মনুষ্য আকৃতিকে ভেঙ্গে চুর্ণবিচুর্ণ করে রং ও রেখায় প্রকাশ করেছেন, অনেকটা ক্যালিগ্রাফিক পদ্ধতিতে। 'আদম' ছবিতে তিনি দেহকে পোশাকবিহীনভাবে উপস্থাপন করে আদিম মানব সভ্যতার প্রাথমিক অবস্থাকে বুঝিয়েছেন এবং তাতেও তৃষ্ণার্তযুগল মানব প্রেমের প্রকাশ ঘটিয়ে মানব সভ্যতার ধারাকেই উজ্জীবিত করেছেন। 'ইভ' চিত্রকলায় তিনি আদমের সাথে ইভকে যুগল অবস্থায় এঁকেছেন। তাঁরা স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হচ্ছেন এবং অন্যায়ের জন্য অনুতপ্ত, ছবিতে দুজনেরই মাথা একটু ঝুঁকে আছে সেই ভাবটি এখানে এনেছেন। রংঙের ব্যবহার হয়েছে অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং আকৃতিগুলো দেখলে মনে হবে একেকটা মোটা তুলির আঁচড়, যাতে সামগ্রিকভাবে যুগল দেহ অবয়বকে প্রকাশ ঘটানো হয়েছে।

এরপরে বিষয়বস্তু হিসাবে তিনি আরবি ক্যালিগ্রাফিক বিষয় নিয়ে ঢাকার পদ্মা গেষ্ট হাউজের জন্য 'আল্লাহ' ট্যাপেষ্ট্রি করেছেন এবং সংসদ ভবনের জন্য 'বিসমিল্লাহের রাহমানির রাহিম' ট্যাপেষ্ট্রি চিত্রকলা করেছেন। আবার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী নিয়ে অপূর্ব সুন্দর ট্যাপেষ্ট্রি চিত্র রচনা করেছেন 'সোনার বাংলা' যা ঢাকায় ওসমানী মিলনায়তনে রয়েছে। এই ট্যাপেষ্ট্রিতে তিনি আবহমান বাংলার যে অপূর্ব গ্রামীণ প্রাকৃতিক দৃশ্য, যাতে বিভিন্ন গাছপালাসহ লতা-গুল্ম ও বিভিন্ন পশুপাখীকে এঁকেছেন। বাংলার প্রাকৃতিক রং সবুজ, হলুদ, লাল, নীল বিভিন্ন উজ্জ্বল রং এবং তার বিভিন্ন 'টোন' বা আধার এই ট্যাপেষ্ট্রির গাঁথুনিতে এনেছেন। সবকিছু মিলে বাংলাদেশের অপূর্ব সজীব প্রাকৃতিক দৃশ্যকে বয়ন-শিল্পের মাধ্যমে এঁকে তিনি আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন।

উপসংহারঃ

শিল্পী রশীদ চৌধুরীর চিত্রকলায় আমরা পাশ্চাত্যের আঙ্গিকের প্রভাব দেখলেও তাতে এদেশের রসসাধনার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্য খুঁজে পাই। তাঁর আধুনিক ট্যাপেষ্ট্রির কাজে এদেশের রেখা-প্রধান চিত্রের বৈশিষ্ট্য থাকলেও সেই রেখার রঙে এসেছে পাশ্চাত্য আধুনিক বিমূর্ত চিত্রের ফ্লাট বা সমতল সত্তা। চিত্রের বিষয়বস্তুতে মনুষ্য অবয়ব থাকলেও সেসব বিষয় হলো বিমূর্ত 'নন অবজেকটিভ' বা অদেখা বিষয়, যেমন আদম, ইভ, কালী ইত্যাদি বিষয়। ছবি আঁকার সময় তিনি বারবার বিষয়ে পরিবর্তন এনেছেন, অর্থাৎ একভাবে নির্দিষ্ট কোন বিষয়কে ধরে বেশিদিন আঁকেননি। এটা তাঁর চারিত্রিক গুণাবলি, সবসময় পরিবর্তনটাকে খুব বেশী পছন্দ করতেন, সদা চঞ্চল থাকতেন, নিত্য নতুন ভাবনা নিয়ে। কেননা তিনি ছিলেন জীবনী শক্তিতে ভরপুর, প্রগতিশীল বেগবান ব্যক্তি। তিনি তাঁর চিত্রকলায় আমাদের ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য ইসলাম, হিন্দু-বৌদ্ধ বা অন্য ধর্মের এমন কি বিভিন্ন লৌকিক সংস্কারের ধ্যান-ধারণাকে ভিত্তি করেও ছবি এঁকেছেন। অর্থাৎ চিত্রকলায় যেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন অক্লান্তভাবে, তেমনি এইসব বিষয়ের মধ্যে তিনি ধর্ম বা সংস্কারকে প্রকাশ করেননি, করেছেন প্রাচীন ধ্যান-ধারণার সাথে আধুনিক চিন্তা চেতনার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন সৌন্দর্যবোধের সৃষ্টি ও বিশ্ব মানবতার প্রকাশ। এছাড়া শিল্পকলা চর্চায় আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি এক সময় নিজেই লিখে গেছেন-

> "যদি আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির স্বরূপ আমরা দেখতে চাই, তবে আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামো আমাদের ভৌগোলিক সীমানায় সুদৃঢ় করতে হবে। তা যদি জনগণের অর্থনীতি হয়, শিল্প সাহিত্য তাহলে জনগণেরই হবে। নইলে রোমান্টিকতার আবরণে ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্মানুভূতির বহিঃপ্রকাশ হয়ে শুধুমাত্র এক শ্রেণীর স্বার্থের কালচারই হবে। তা দেশী বিদেশী কোনটাই নয়"।[৮]

তাঁর এই বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে বলা যেতে পারে যে দেশীয় অর্থনীতিকে আরো সবল ও উন্নততর করার নিমিত্তে আমাদের চিত্রকলা চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কেননা, একটি দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজন বলিষ্ঠ অর্থনীতি, তেমনি এই অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্রশিল্পের মানগত উন্নতি ঘটিয়ে আমাদের দেশে কারুপল্লী ও তাপিশ্রী পল্লী গড়ে তোলার একান্ত প্রয়োজন। বিষয়টি দু'টি দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রণিধানযোগ্য; এক– শিল্পচর্চায় দেশীয় পণ্যের মানগত উন্নতির ফলে ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেমন তার কদর বাড়বে, তেমনি দেশের অর্থনীতিও সবল হবে, দুই–বিশ্ব সংস্কৃতিতে বাংলাদেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠা পাবে।

তথ্য ও বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত গ্রন্থাবলী ও সাময়িকীঃ

১। আবদুর রাজ্জাক। "রশীদ চৌধুরী" *মীজানুর রহমান, ত্রৈমাসিক পত্রিকা।* তৃতীয় বর্ষ/ দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা, ঢাকাঃ ইডেন প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯৮৮, পৃঃ ৩১-৩২।

২। মাহমুদ শাহ কোরেশী। "রশীদ চৌধুরীঃ শিল্প ও শিল্পী"। *মীজানুর রহমান ত্রৈমাসিক পত্রিকা।* প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

৩। সৈয়দ আলী আহসান। *শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য।* ঢাকাঃ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৩।

৪। শোভন সোম। *তিন শিল্পী।* কলিকাতাঃ বাণীশিল্প, ১৯৮৫।

৫। কামরুল হাসান। "রসমণ্ডিত রশীদ চৌধুরী"। *মীজানুর রহমান ত্রৈমাসিক পত্রিকা।* প্রগুক্ত পৃ. ৩-৪।

৬। মীজানুর রহমান সম্পাদিত। "রশীদ চরিত-কথা"। *মীজানুর রহমান ত্রৈমাসিক পত্রিকা।* প্রাগুক্ত পৃ. ৩৮-৩৯।

৭। মাহমুদ শাহ কোরেশী। "রশীদ চৌধুরীঃ শিল্প ও শিল্পী"। *মীজানুর রহমান ত্রৈমাসিক পত্রিকা।* প্রাগুক্ত পৃ. ১০।

৮। রশীদ চৌধুরী। "শিল্পকলাঃ স্বদেশ-বিদেশ"। চট্টগ্রামঃ *সরকারী চারুকলা কলেজ বার্ষিক প্রদর্শনী স্মারক,* ১৯৮১।

টোটেমবাদঃ আদিম সমাজের একটি বিশ্বাস

এম. ফয়জার রহমান

সারসংক্ষেপ

প্রত্যেক সমাজেই বিভিন্ন আচার, প্রথা, রীতি-নীতি, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, বিধি-নিষেধ বিদ্যমান এবং এসবকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে সামাজিক প্রতিষ্ঠান। আদিম মানুষের বিশ্বাস হচ্ছে তাদের গোত্রের পূর্ব পুরুষ ও গোত্রের প্রতীক, যা গোত্রকে বিপদে-আপদে নানাভাবে সাহায্য করে ও বিপদ হতে উদ্ধার করে। গোত্রের সঙ্গে টোটেমের এই সম্পর্ক হতেই আদিম সমাজে পূর্ব পুরুষের (টোটেমের) পুজার সূচনা এবং অন্যান্য সামাজিক আচার, প্রথা, রীতি-নীতি, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, বিধি-নিষেধ, ইত্যাদির উদ্ভব এবং এসব কিছুকে কেন্দ্র করে এক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব, যা টোটেমবাদ নামে পরিচিত। টোটেমকে কেন্দ্র করে আদিম সমাজে উদ্ভুত এসব আচার, প্রথা, রীতি-নীতি, বিধি-নিষেধ সর্বত্র একই রূপে বিকশিত না হয়ে তা গোত্র ও অঞ্চল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিদ্যমান। এসব কিছুর উৎপত্তি ও বিকাশের যেমন সঠিক কোন প্রক্রিয়া নেই, তেমনি নেই কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ। তবুও গোত্র সদস্যদের মধ্যে টোটেমবাদের ভিত্তি অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ ধর্মীয়, বৈবাহিক, অর্থনৈতিক, ব্যবহারিক, ইত্যাদি ক্ষেত্রে টোটেমবাদ ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে আসছে। এই প্রবন্ধে সেই বিষয়টিই আলোচিত হয়েছে।

ভূমিকাঃ

আদিম উপজাতি সমাজের গোত্র জীবনে টোটেমকে কেন্দ্র করে নানাবিধ আচার- আচরণ, রীতি-নীতি বিকাশ লাভ করে সামাজিক প্রতিষ্ঠানে রূপ নিয়েছে। টোটেমকে কেন্দ্র করে আদিমসমাজে উদ্ভুত এই প্রতিষ্ঠানকে নৃতাত্ত্বিকগণ টোটেমবাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন (*Encylopaedia of the Social Sciences*, 1954:14:657)। আদিম উপজাতির গোত্র সদস্যগণ পরস্পর যে সম্পর্কের দ্বারা পরিচিত তা তাদের রক্তের সম্পর্কের পরিবর্তে তাদের সাধারণ নামের উপর প্রতিষ্ঠিত। গোত্রের প্রত্যেক সদস্যই একই সাধারণ নামের মাধ্যমে পরিচিত এবং প্রত্যেক গোত্রের আলাদা আলাদা সাধারণ নাম আছে। গোত্রের এই সাধারণ নামটি গৃহীত হয় কোন জীব-জন্তু, উদ্ভিদ বা বস্তুর নাম হতে। উক্ত জীব-জন্তু, উদ্ভিদ বা বস্তু উক্ত গোত্রের টোটেম বলে পরিচিত।

বিভিন্ন আদিম উপজাতি সমাজে টোটেমকে কেন্দ্র করে একই ধরণের আচার-আচরণ ও রীতি-নীতির বিকাশ না হয়ে উপলক্ষ ও অঞ্চল বিশেষে তা বিভিন্ন রূপ লাভ করেছে। বিভিন্ন গোত্রের

মধ্যে অভিনব ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের টোটেমীয় ব্যবহারবিধি লক্ষ্য করা যায়। টোটেম সাধারণত বংশানুক্রমিক হয়ে থকে এবং বংশ পরম্পরায় তা গোত্রের সদস্যগণ গ্রহণ করে কিন্তু মধ্য অষ্ট্রেলিয়ার অরুন্তা উপজাতির টোটেম নির্ধারিত হয়ে থাকে এবং এটা এক অভিনব ব্যতিক্রম (Service, 1978: 26; Freud, 1965: 114)। গোত্রের সাধারণতঃ একটিই টোটেম থাকে কিন্তু কোন কোন উপজাতির গোত্রে আবার একাধিক টোটেম বিদ্যমান থাকতে পারে। ফিজির তিকোপিয়া দ্বীপের ও দক্ষিণ-পূর্ব নিউগিনির উপজাতির মধ্যে এরূপ যুক্ত টোটেম লক্ষ্যণীয় (*Encyclopaedia of the Social Sciences*, 1954:14: 658)। এসব উপজাতিতে পাখী, মাছ, উদ্ভিদ ও সাপ একত্রে মুক্ত টোটেমরূপে পরিচিত। অবশ্য পাখী হচ্ছে প্রধান টোটেম এবং পরবর্তী তিনটি প্রথমটির অধিনস্ত। এছাড়া ওসেনিয়া দ্বীপের কিছু উপজাতি, আফ্রিকা ও আমেরিকার কোন কোন উপজাতির এক অভিনব টোটেম লক্ষ্য করা যায়-যা অঙ্গ টোটেম নামে পরিচিত (*Ibid.* P. 658)। এসব উপজাতিতে বিশেষ কোন জীব-জন্তুর শিং, লেজ বা কান অথবা অন্যকোন অঙ্গ টোটেম বলে পরিচিত।

বিভিন্ন গোত্র তাদের টোটেম গ্রহণকালে বিশেষ কোন জন্তু বা বস্তুকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অধিকাংশ গোত্রে জীব-জন্তুকেই টোটেমরূপে প্রাধান্য দেয়া হয় কিন্তু মেলানেশিয়ার উপজাতি শুধুমাত্র পাখীকেই টোটেমরূপে গ্রহণ করেছে। এসব প্রাণী ও বস্তুবাচক বিষয় ছাড়াও অনেক উপজাতি বিমূর্ত ধারণায় কোন কোন বিষয়কে টোটেমরূপে গ্রহণ করেছে। যেমন, মাদ্রাজের তাঁতী সম্প্রদায় 'গর্ববোধ' এবং ওমাহা উপজাতি 'লালরং' টোটেমরূপে গ্রহণ করেছে। (*Encyclopaedia Britannica* 1966: 22: 317)। প্রকৃতপক্ষে কত জীব-জন্তু, উদ্ভিদ ও বস্তু টোটেমরূপে গৃহীত হয়েছে তার সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। একমাত্র ভারতীয় উপমহাদেশের সাঁওতাল উপজাতির শতাধিক, হো উপজাতির ৫০টির বেশী, মুণ্ডাদের ৬৪টি, ভীল উপজাতির ২৪টি, নাগপুরের খারিয়াদের ৮টি এবং পশ্চিম বঙ্গের দৌড়ি উপজাতির ৪টি টোটেম আছে (Matubbar, 1993: 145)

টোটেম ও টোটেমবাদ প্রভাবিত উপজাতি সমূহ মোটামোটিভাবে পৃথিবীর নিম্নবর্ণিত অঞ্চল সমূহে বসবাস করেঃ উত্তর আমেরিকার উত্তর-পশ্চিমাংশে, পূর্বাঞ্চলের সমভূমি ও বনাঞ্চলে, দক্ষিণ-পূর্ব এলাকা এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম ক্যালিফোর্নিয়ার কিছু উপজাতিতে টোটেম লক্ষণীয়। ম্যাক্সিকোর ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও টোটেম বিদ্যমান। দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ আদিম অধিবাসীরা টোটেম গোত্রে বিভক্ত। আফ্রিকার সাহারা ও কালাহারী মরুভূমির মাঝে বসবাসকারী উপজাতির টোটেম আছে এবং মাদাগাস্কার দ্বীপেও টোটেম আছে। সম্ভবতঃ অধিকাংশ ভারত-উপমহাদেশের উপজাতি টোটেমভূক্ত। মেলানেশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব নিউগিনি, সলোমান দ্বীপপুঞ্জ ও অন্যান্য দ্বীপাঞ্চলে টোটেম বিদ্যমান। ইহা ছাড়া ফিজি ও অধিকতর পূর্ব পলিনেশিয়ার উপজাতিদের মধ্যেও টোটেম লক্ষণীয় (*Encyclopeadia of the Social Sciences*, 1954: 14: 657-58)

উপজাতি সমাজে সাধারণতঃ তিন প্রকার টোটেম দেখা যায়– (১) গোত্র টোটেম,– এই টোটেম সমগ্র গোত্রের জন্য সাধারণ বলে গণ্য হয় এবং তা বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে গোত্র সদস্যগণ পেয়ে থাকে; (২) লিঙ্গ টোটেম– এই টোটেম উপজাতির প্রত্যেক মহিলা বা পুরুষের জন্য সাধারণ বলে গণ্য; (৩) ব্যক্তিগত টোটেম– এই টোটেম একজন ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য কিন্তু তার উত্তরাধিকারীদের জন্য প্রযোজ্য হয় না (Freud, 1965:103)। অবশ্য শেষোক্ত টোটেমদ্বয় গুরুত্বের ক্ষেত্রে গোত্র টোটেমের চাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ।

আদিম উপজাতীয় গোত্র জীবনে টোটেম ও টোটেমবাদ এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং গোত্র ও টোটেম এক অনন্য বৈশিষ্ট্যর সম্পর্কে আবদ্ধ। এই সম্পর্ক একজন ব্যক্তির সঙ্গে একটি টোটেম জন্তু বা বস্তুর মধ্যে না হয়ে তা একদল ব্যক্তির সঙ্গে একদল টোটেম জন্তু বা বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান (*Encyclopaedia Britannica*, 1966: 22: 317)। অষ্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য টোটেমভুক্ত গোত্রগুলির ব্যবহৃত ভাষায় এই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। তারা তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ককে প্রকাশ করতে তা কোন দু'জন ব্যক্তির মধ্যকার এরূপ নির্দেশ না করে তা একজন ব্যক্তির সঙ্গে একটি দলের –এভাবে প্রকাশ করে। মর্গান (L. H. Morgan) ইহাকে 'আত্মীয়তার শ্রেণী বিভাগ পদ্ধতি' (Classificatory system of relationship) বলে উল্লেখ করেছেন (Freud, 1965:6)। এই পদ্ধতি অনুসারে এক ব্যক্তি 'বাবা' শব্দটি দ্বারা তার প্রকৃত জন্মদাতা ছাড়াও এমন অন্যান্য ব্যক্তিদেরকেও বুঝায় যারা তার মাকে বিয়ে করতে পারত গোত্রীয় আইন অনুযায়ী এবং ফলতঃ তারা তার জন্মদাতাও হতে পারত। অনুরূপ 'মা' শব্দটি দ্বারা প্রকৃত জন্মদাত্রী ছাড়াও অন্যান্য এমন সব মহিলাকেও বুঝায় যারা তার মা হতে পারত গোত্রীয় আইন লংঘন না করে। ভাই ও বোন শব্দ দুটি দ্বারা নিজ পিতা–মাতার সন্তান ছাড়াও এমন সব ব্যক্তির সন্তানদেরও বুঝায় যারা আত্মীয়তার শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী 'বাবা–মা' শ্রেণীভুক্ত বলে গণ্য হয় (*Ibid.* P. 6-7)। অনুরূপ শ্রেণীবাচক সম্বোধন আমাদের মাঝেও প্রচলিত আছে। আমরা আমাদের পিতা–মাতা বন্ধু–বান্ধবী ও তাদের স্বামী/স্ত্রীগণকে চাচা–চাচী ও খালা/খালু বলে থাকি এবং তাঁদের সন্তানদের ভাই/বোন (Cousin) বলে সম্বোধন করি।

টোটেমবাদের উৎপত্তি ও বিকাশঃ

সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়গুলির মত টোটেমবাদের উৎপত্তি ও বিকাশের ক্ষেত্রেও সর্বসম্মত কোন মতবাদ প্রতিষ্ঠা পায়নি। এক্ষেত্রে কয়েকজন প্রখ্যাত নৃবিজ্ঞানীর গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ফলাফল হতে গ্রহণযোগ্য মতবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ম্যাকলিনান

(Mclennan) টোটেমবাদ ও বর্হিবিবাহ ব্যবস্থার সন্ধান পেলেও তিনি ইহার উৎপত্তির বিষয়ে কোন মতামত ব্যক্ত করেননি। 'শরীরে উল্‌কি অঙ্কন প্রথা' থেকে টোটেমবাদের উৎপত্তি বলে অ্যান্ড্রিউ ল্যাং (Andrew Lang) মনে করেন (*Ibid.* P. 109)।

ইংরেজী ভাষায় টোটেম শব্দটির উদ্ভবের বিষয়ে *A Dictionary of the Social Sciences* (1964: 720), *Encyclopaedia Britannica* (1966: 22: 317) এবং Sigmund Freud এর Totem and Taboo (1965) গ্রন্থে একটা সমার্থক মতবাদ লক্ষ্য করা যায়। উক্ত মতবাদ অনুসারে টোটেম শব্দটি একজন ইংরেজ মনীষী অ্যান্ড্রিউ ল্যাং (Andrew Lang) উত্তর আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের অ্যালগোনকিন (Algonkin) উপজাতির অজিবাওয়া (Ojibwa) ভাষা হতে গ্রহণ করেন। শব্দটি Totem, Tatam, Dodaim, otem ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে প্রচলিত ছিল। (*A Dictionary of the Social Sciences*, 1964: 720)।

টোটেমবাদ আদিম সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশের ধারণার ন্যায় টোটেমবাদের উদ্ভব ও বিকাশের ধারণাও বহুলাংশে বিতর্কমূলক। ফ্রয়েড (Freud, 1965: 110) বিদ্যমান ধারণাগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।

১। নামবাদীতত্ত্ব (Nominalist theory):

টোটেমবাদের উৎপত্তি ও বিকাশের 'নামবাদী' তত্ত্বের প্রবক্তাগণ সকলেই 'টোটেম ও গোত্রের একই সাধারণ নাম' এই বিষয়টির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। Garcilasso de la Vega পেরুর ইন্‌কা উপজাতির বংশধর। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁর জাতি সম্পর্কে রচিত এক ইতিহাস গ্রন্থে দেখান যে ইন্‌কা উপজাতির মধ্যে বিদ্যমান টোটেমবাদ মূলত উপজাতির গোত্রগুলিকে পৃথক পৃথক সাধারণ নামের মাধ্যমে একগোত্র হতে অন্য গোত্রকে পৃথক করে। Keana (1899: 396; quoted in Freud, 1965: 110) টোটেমকে বংশ পরিচায়ক প্রতীক বলে মনে করেন – যার মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার ও গোত্র সমূহ নিজেদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। Max-Muller (1897: 1: 201; quoted in Freud, 1965: 110) অনুরূপ ধারণা থেকেই বলেন যে, টোটেম হচ্ছে গোত্রের প্রতীক, গোত্রের নাম, গোত্রের পূর্ব-পুরুষের নাম, এবং সবশেষে গোত্রের একটি পূজনীয় বিষয়। একইভাবে স্পেন্সার (Spencer, 1870, 1893; quoted in Freud, 1965: 110) টোটেমবাদের উৎপত্তির বিষয়ে নামকেই চূড়ান্ত উপাদান বলে স্বীকার করেছেন। তিনি যুক্তি দেখান যে, নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমূহই তাকে জীব-জন্তুর নামের সঙ্গে যুক্ত করার ধারণা বিকশিত করে এবং পরবর্তীতে তার বংশধরগণ উক্ত সম্মানসূচক উপনামটি অর্জন করে।

আদিম বক্তব্যের অস্পষ্ঠতা ও অবোধ্যতার ফলশ্রুতিস্বরূপ পরবর্তী বংশধরগণ নিজকে প্রকৃত জীব-জন্তুর উত্তরাধিকার হিসাবে প্রমাণ করতে উক্ত নামগুলিকে ব্যবহার করে। সুতরাং দেখা যায় যে টোটেমবাদ অনেকটা ভ্রান্তিবশত পূর্ব-পুরুষের পূজার ন্যায় বিকাশ লাভ করেছে।

অ্যান্ড্রিউ ল্যাং এর মতে প্রাথমিক স্তরে গোত্রে জীব-জন্তুর নামের উদ্ভব ঘটে তাদের উদাসীনতার জন্য। তারা কেন এরূপ নাম ব্যবহার করে- এর সঠিক মূল্যায়ন তারা করতে পারে না এবং এরূপ নামের উৎপত্তির বিষয়ও তারা অবগত নয়। তাঁর মতে আদিম মানুষ সচেতন হলে বুঝতে পারবে যে এরূপ নাম তাদের জন্য মর্যাদাজনক নয়। এ বিষয়ে সুস্পষ্ঠ ধারণার জন্য তারা চিন্তা করে তাদের নামের গুরুত্বের জন্য ইহাকে টোটেমীয় ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করে। আমাদের মত আদিম মানুষ নামকে নিরপেক্ষ ও প্রচলিত অর্থে গ্রহণ না করে তা এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও অপরিহার্য বিষয়রূপে গ্রহণ করে। তাদের মতে কারও নাম তার ব্যক্তিত্বের এক প্রধান উপাদান এবং সম্ভবতঃ তার আত্মারও অংশ বিশেষ। আদিম মানুষের জীব-জন্তুর নাম গ্রহণকে ল্যাং উক্ত জীব-জন্তু ও মানুষের মধ্যে বিদ্যমান এক রহস্যময় ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় বলে মনে করেন। এই নামের সম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গে রক্তের সম্পর্কের ধারণাও বিকাশ লাভ করে এবং তারা সর্বদাই সচেষ্ট থাকে যেন একই টোটেমভুক্ত নর-নারীর যৌন সম্পর্কের দ্বারা অজাচার সংঘটিত না হয়। ফলশ্রুতিতে টোটেমীয় গোত্রগুলিতে বহির্বিবাহ ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়।

২। মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব (Psychological theory):

টোটেমবাদের উৎপত্তির 'মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের' প্রথম প্রবক্তা হলেন জেমস ফ্রেজার (Frazer, J. G. , 1910; quoted in Freud, 1965: 116)। তাঁর মতে বহিরাগত আত্মার প্রতি বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে টোটেমবাদ প্রতিষ্ঠিত। এই ধারণানুযায়ী টোটেম হচ্ছে এক প্রতিনিধি যে মানুষের আশ্রিত আত্মার নিরাপদ স্থানরূপে আশ্রিত আত্মাকে যাবতীয় অনিষ্টকর হুমকির হাত হতে রক্ষা করে। আদিম মানুষ তাদের আত্মা টোটেমের কাছে জমা দিয়ে ধারণা করে যে তার আত্মা সব রকম অনিষ্ট ও বিপদ হতে মুক্ত এবং কেউ তার লুকায়িত আত্মার ক্ষতি করতে পারে এমন ধারণা তারা পরিহার করে চলে। কিন্তু তারা জানে না যে কোন জীব-জন্তুই এই বিশাল প্রজাতি মণ্ডলে তার নিজ আত্মাকে ন্যায়-সঙ্গতভাবেই যাবতীয় অনিষ্টের হাত হতে রক্ষা করতে সব সময় উদ্বিগ্ন।

পরবর্তীতে স্পেন্সার ও গিলিনের (Spencer, B.. and Gillen, F. J.) অরুন্তা উপজাতির উপর পর্যবেক্ষণের ফলাফল লক্ষ্য করে ফ্রেজার নিজ থেকে তাঁর ধারণা 'আত্মার প্রতি বিশ্বাস হতে টোটেমবাদের উৎপত্তি'-এই তত্ত্ব পরিত্যাগ করেন এবং টোটেমবাদের উৎপত্তি ও বিকাশের সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বকে গ্রহণ করেন।

৩। সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব (Sociological theory)ঃ

Reinach (1905 -12: 1: 41; quoted in Freud, 1965: 113) সর্ব প্রথম ধর্মীয় ও ব্যবহার বিধির মধ্যে টোটেমবাদের অস্তিত্ব সাফল্যজনকভাবে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু এসব কিছুই টোটেম কেন্দ্রীক এরূপ ধারণার প্রতি তিনি সর্বদা অধিক গুরুত্ব দেননি। বরং তাঁর মতে টোটেমবাদ 'Une hypertrophie de l'instinct social' ছাড়া অধিক কিছু না। দুর্খেইমও (Durkheim, 1912; quoted in Freud, 1965: 113) অনুরূপ ধারণা পোষণ করতেন। তাঁর মতে টোটেম হচ্ছে সমাজ ও ধর্ম বিষয়ক এক দৃশ্যমান প্রতিনিধি ও সত্যিকার পুজনীয় বস্তু – যার মাধ্যমে আদিম সম্প্রদায় মূর্ত হয়ে ওঠে। স্পেন্সার ও গিলিন (Spencer and Gillen, 1899; quoted in Freud, 1965: 114) অরুন্তা উপজাতির বেশ কিছু অভিনব ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের ধর্মীয় আচার, ব্যবহার বিধি ও বিশ্বাসের কথা বলেছেন। পরবর্তীতে ফ্রেজার তাদের সঙ্গে একমত হয়ে বলেন যে, এই অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলিই কোন মানব সম্প্রদায়ের আদিম অবস্থার পরিচায়ক এবং এগুলিই টোটেমবাদের মৌলিক ও প্রকৃত অর্থের নির্দেশক।

স্পেন্সার ও গিলিন অষ্ট্রেলিয়ার অরুন্তা উপজাতির যেসব অভিনব ও অনন্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন তার মোটামুটি সারাংশ হলঃ

ক) অরুন্তা উপজাতি টোটেম গোত্রে বিভক্ত, কিন্তু টোটেম বংশানুক্রমিক নয় বরং তা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত হয়।

খ) এই টোটেম গোত্রগুলিতে বহির্বিবাহ ব্যবস্থা চালু নেই – যা সচরাচর টোটেম গোত্রগুলির এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বিবাহের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিধি-নিষেধ এক অতি উন্নত 'বৈবাহিক শ্রেণীর' উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত – যার সঙ্গে টোটেমবাদের কোন সম্পর্ক নেই।

গ) 'Intichiuma' নামক এক প্রকার উৎসব টোটেমীয় গোত্রগুলি পালন করে, যার মুখ্য উদ্দেশ্য ভক্ষণযোগ্য টোটেমের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং এই উৎসব যাদুবিদ্যার পদ্ধতি দ্বারা সম্পন্ন করা হয়।

ঘ) অরুন্তা সমাজে গর্ভধারণ ও পুর্ণজন্ম নেয়ার ক্ষেত্রে একটি অভিন্ন ধারণা প্রচলিত আছে। তাদের বিশ্বাস 'টোটেম কেন্দ্র' (Totem centre) বলে পরিচিত কিছু স্থান ছড়িয়ে আছে সারা দেশে যেখানে মৃত কোন টোটেমের প্রেতাত্মা পুনর্জন্মের জন্য অপেক্ষা করে এবং যে কোন মহিলার গর্ভে প্রবেশ করে উক্ত টোটেম কেন্দ্রের পাশ দিয়ে পথ চলার সময়। সন্তান জন্ম নিলে মা উক্ত টোটেম কেন্দ্রগুলির কথা চিন্তা করে তার গর্ভধারণের স্থানের উল্লেখ করে এবং তার স্বীকারোক্তি মোতাবেক সন্তানের টোটেম নির্ধারিত হয়। তারা আরো বিশ্বাস করে যে, মৃত ও পুনর্জন্ম নেয়া

প্রেতাত্মা অন্তরঙ্গ সহচর রূপে একটি নির্দিষ্ট মাদুলিতে অবস্থান করে। এই মাদুলিটি চুরিঙ্গা (Churinga) নামে পরিচিত – যা উক্ত 'টোটেম কেন্দ্র' সমূহে দেখা যায়।

অরুন্তাদের ধর্মীয় আচার ব্যবস্থার দুটি উপাদান থেকে ফ্রেজার ধারণা করেন যে অরুন্তা উপজাতির টোটেমবাদ হচ্ছে প্রাচীনতম। প্রথমত, তাদের মাঝে এরূপ একটি কাল্পনিক ধারণা বিদ্যমান যে, তাদের পূর্ব পুরুষ নিয়মিতভাবে তাদের টোটেমকে ভক্ষণ করছে এবং সর্বদাই তাদের নিজ টোটেমভূক্ত মহিলাদের বিয়ে করছে। দ্বিতীয়ত, তাদের তত্ত্বানুসারে গর্ভধারণের জন্য যৌন মিলনের ভূমিকাকে কার্যত অস্বীকার করা হয়। 'গর্ভধারণ হচ্ছে যৌন মিলনের ফলশ্রুতি' – যে জনগোষ্ঠী আজও তা অনুধাবন করতে পারেনি, নিঃসন্দেহে তারা সবচেয়ে অনুন্নত ও আদিম পর্যায়ে বসবাস করছে (Freud, 1965: 115)।

Intichiuma উৎসবের ধারণা হতে ফ্রেজার টোটেমবাদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ একটি নতুন বিষয়ের সন্ধান পান – যা মানুষের সবচেয়ে বাস্তব প্রয়োজন পুরণ করে থাকে। এই উৎসবের মাধ্যমে আদিম মানুষ 'উৎপাদক' ও 'ভোক্তা' নামক দু'টি সমিতি গড়ে তুলুছে এবং প্রতিটি টোটেম গোত্র একটি নির্দিষ্ট খাদ্য বস্তুর পর্যাপ্ত যোগান নিশ্চিত করার ব্যবসা গ্রহণ করেছে। গোত্রগুলি নিজ নিজ টোটেম ভক্ষণ না করে তা অন্য গোত্রের সঙ্গে বিনিময় করছে – যা তারা উৎপাদন করে এই Intichiuma উৎসবের মাধ্যমে। সুতরাং নিজ টোটেম ভক্ষণের ক্ষেত্রে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা উক্ত টোটেম পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদনের জন্যও তাদেরকে অনুপ্রাণীত করে।

অতএব, বলা যায় যে, যে জনগোষ্ঠী যতবেশী অনুন্নত ও আদিম পর্যায়ে জীবন যাপন করছে, তাদের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন রীতি–নীতি ও আচার–আচরণ হতে সে সমাজের প্রথা–প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপত্তি ও বিকাশের ধারণা পাওয়া সহজ। সুতরাং, যেহেতু টোটেমবাদ আদিম সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং তাদের দৈনন্দিন জীবন টোটেমবাদ দ্বারা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত, সেহেতু টোটেমবাদের উৎপত্তি ও বিকাশের কারণ তাদের মাঝে প্রচলিত আচার আচরণ ও রীতি–নীতির মধ্যেই নিহিত আছে – এরূপ মনে করাই অধিকতর যুক্তি সঙ্গত।

টোটেমবাদ ও বিবাহ ব্যবস্থাঃ

বিবাহ ব্যবস্থা সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান এবং বিবাহ ব্যবস্থার আওতায় নর–নারীর একত্রে বসবাসকে সামাজিকভাবে স্বীকার করা হয় এবং তাদের সন্তান–সন্ততিরাও বৈধতার সামাজিক স্বীকৃতি পায়। বস্তুতঃ বিবাহ ব্যবস্থা একটি ব্যাপক আলোচ্য বিষয় হেতু এই স্বল্প পরিসরে তা পরিহার করে শুধুমাত্র এর একটি দিক– 'বহির্বিবাহ ব্যবস্থা' (System of exogamy) এর উৎপত্তি ও টোটেমবাদের সঙ্গে সম্পর্ক আলোচনা করা হল।

বহির্বিবাহ বলতে সাধারণত বুঝায় যে বিবাহের সময় ছেলের জন্য কণে ও মেয়ের জন্য বর নিজ নিজ গোত্রের বাইরে থেকে কিন্তু একই উপজাতির মধ্য হতে বর/কণে নির্বাচন করে বিবাহ দেওয়া। অর্থাৎ একই গোত্রভুক্ত ছেলে ও মেয়ের বিবাহ নিষিদ্ধ। সামগ্রিকভাবে বিবাহ ব্যবস্থা সব সমাজেই বিদ্যমান কিন্তু বহির্বিবাহ ব্যবস্থা বিশেষ কিছু সমাজে, বিশেষতঃ আদিম সমাজে বিদ্যমান। আবার এমন সমাজও আছে যেখানে একই সঙ্গে বহির্বিবাহ ও অন্তর্বিবাহ দু'টি প্রথাই বিদ্যমান। মানব সমাজে বিভিন্ন প্রকার বিবাহ ব্যবস্থার উৎপত্তি ও তার বিকাশে কোন মৌলিক ধারণা কাজ করছে কিনা তা বেশ বিতর্কমূলক ও এক জটিল বিষয়।

বহির্বিবাহ ব্যবস্থার উৎপত্তির ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী ও সামঞ্জস্যহীন দু'টি ধারণা প্রচলিত আছে। একটি হল বহির্বিবাহ টোটেমবাদের একটি সহজাত অংশ এবং অন্যটি হল বহির্বিবাহ একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান, টোটেমবাদের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। প্রথম মতের অন্যতম প্রবক্তা দুর্খেইম (Durkheim, 1899, 1902, 1905; quoted in Freud, 1965: 120) এর মতে বহির্বিবাহ হচ্ছে টোটেমবাদের মৌলিক নীতির অনিবার্য ফলশ্রুতি এবং টোটেমীয় বিধিনিষেধ অনুসারে একই টোটেমভুক্ত নর-নারীর যৌন মিলন নিষিদ্ধ। অ্যান্ড্রিউ ল্যাং (Lang, 1905: 125; quoted in Freud, 1965: 120) দুর্খেইমকে সমর্থন করে বলেন যে একই গোত্রের নর-নারীর যৌন মিলন কোন প্রকার 'রক্তের বিধিনিষেধ' ছাড়াই নিষিদ্ধ থাকা উচিৎ, কেননা তা অজাচারের নামান্তর। অতএব, এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, আদিম মানুষের মাঝে অজাচারের ভয় থেকেই বহির্বিবাহ ব্যবস্থার উৎপত্তি হয়েছে। এই অজাচারের ধারণা বিকাশ লাভ করে গোত্রের পূর্ব পুরুষের অর্থাৎ টোটেমবাদের ধারণা হতে। একই টোটেমভুক্ত নারী ও পুরুষের পূর্ব-পুরুষ হচ্ছে তাদের টোটেম, ফলে তারা স্বভাবতই পরস্পর একই রক্তের অধিকারী বলে মনে করে এবং তাদের মধ্যকার যৌন মিলন অজাচারের নামান্তর।

দ্বিতীয় মতের অন্যতম প্রবক্তা হচ্ছেন মনীষী ফ্রেজার (Frazer, 1910: 1: XII; quoted in Freud, 1965: 120)। তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে টোটেমবাদ ও বহির্বিবাহ হচ্ছে মৌলিক ও প্রকৃত অর্থে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সামাজিক প্রতিষ্ঠান, কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক উপজাতিতে এই বিষয় দু'টিকে এক করে দেখা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে মধ্য অষ্ট্রেলিয়ার অরুন্তা উপজাতি একাধিক টোটেম গোত্রে বিভক্ত হলেও গোত্রগুলিতে বহির্বিবাহ ব্যবস্থা প্রচলিত নেই। অনুরূপ আফ্রিকার অনেক উপজাতি টোটেম গোত্র বিভক্ত কিন্তু তাদের মধ্যেও বহির্বিবাহের পরিবর্তে অন্তর্বিবাহ প্রথা চালু রয়েছে (Encyclopaedia Britannica, 1966: 22: 317)। অনেকে বহির্বিবাহ উদ্ভবের অন্যান্য কারণও উল্লেখ করেছেন। ম্যাকলিনান (Mclennan, 1865; quoted in Freud, 1965: 121) বহির্বিবাহের উৎপত্তির ক্ষেত্রে সুস্পষ্ঠ করে বলেন যে ইহা প্রাচীন 'জোর পূর্বক বিয়ে' (Marriage by capture)

এর সংশোধিত রূপ। তিনি অনুমান করেন যে, পুরাকালে সাধারণ নিয়ম ছিল পুরুষ নিজ গোত্রের বাইরে অন্য গোত্রের মেয়েকে বিয়ে করবে এবং নিজ গোত্রের মেয়েকে বিয়ে করা এক ভ্রান্ত ধারণা, কারণ এটা ছিল অপ্রচলিত। তিনি আরো অনুমান করেন যে বহির্বিবাহ ব্যবস্থা প্রচলনের অন্যতম কারণ হচ্ছে আদিম সমাজে জন্ম মুহূর্তেই অধিকাংশ কন্যা সন্তানকে হত্যা করার ফলে নিজ গোত্রে বিবাহ যোগ্য মেয়ের অপ্রাচুর্যতা। বহির্বিবাহ ব্যবস্থার অন্যান্য প্রবক্তাগণও এই প্রতিষ্ঠানকে ন্যায়-নীতির ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলে মনে করেছেন অজাচার প্রতিরোধকল্পে।

বাংলাদেশের সাঁওতাল উপজাতি, বিশেষতঃ রাজশাহী জেলার সাঁওতালরা ১১টি টোটেম গোত্রে বিভক্ত এবং গোত্রগুলিতে বহির্বিবাহ ব্যবস্থা বিদ্যমান (Samad, 1984: 55-56)। এই সাঁওতাল উপজাতি ক্রিশ্চিয়ান মিশনারীদের প্রভাবে ক্রমাগত ধর্মান্তরীত হয়ে ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম গ্রহণ করলেও তারা তাদের পুরাতন আদর্শ মূল্যবোধগুলি পরিত্যাগ করেনি। এখনও তাদের মধ্যে বহির্বিবাহ ব্যবস্থা চালু আছে।

'অজাচার নিয়ন্ত্রণের জন্য বহির্বিবাহ প্রথার উদ্ভব' এ যুক্তি এখন আর গ্রহণযোগ্য নয়। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে সমাজে অজাচার অনুপস্থিত নয় এবং ইতিহাস প্রমাণ দেয় যে নিকট আত্মীয় নারী-পুরুষে বিয়ের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সমাজে সামাজিক রীতি-নীতি প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তাছাড়া 'টোটেমীয় বিধি-নিষেধ হতেই বহির্বিবাহ প্রথার উদ্ভব এবং অজাচার সংঘটনের পথে ইহা এক কার্যকরী প্রতিবন্ধক - এমতের প্রবক্তাদের যুক্তির অসারতা প্রমাণিত হয় যখন টোটেমবাদের অন্যান্য নীতিসমূহ এক্ষেত্রে স্ববিরোধী ভূমিকা পালন করে। যেহেতু গোত্র সদস্যগণ উত্তরাধিকার সূত্রে টোটেম লাভ করে এবং বৈবাহিক কারণে তা পরিবর্তীত হয় না, তাই টোটেমীয় বিধি-নিষেধগুলি অপরিবর্তিত থাকে এবং ফলতঃ অজাচার সংঘটিত হয় (Freud, 1965:5)। উদাহরণ স্বরূপ দেখা যায় যে, একটি মাতৃসুত্রীয় উপজাতির ক্যাঙ্গারু টোটেম গোত্রের পুরুষ ও ইমু টোটেম গোত্রের মেয়ের বৈবাহিক সূত্রে জন্ম নেয়া সন্তান ইমু টোটেম গোত্রভুক্ত হবে। এই সন্তানেরা ভাই-বোন, মাতা পুত্র বা ইমু টোটেম গোত্রের অন্য যে কোন নারী/পুরুষের সঙ্গে যৌনমিলন টোটেমীয় বিধিনিষেধ অনুযায়ী অজাচার। পক্ষান্তরে ক্যাঙ্গারু গোত্রের পিতা তার ইমু গোত্রের কন্যার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক উক্ত সংশ্লিষ্ট টোটেমীয় বিধি-নিষেধের আওতার বাইরে। আবার উপজাতিটি পিতৃ-সুত্রীয় হলে উক্ত বৈবাহিক সূত্রে জন্ম নেয়া সন্তানেরা ক্যাঙ্গারু টোটেম গোত্রভুক্ত হবে এবং এক্ষেত্রে টোটেমীয় বিধি-নিষেধ অনুসারে পিতা ও কন্যার যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ। কিন্তু একইভাবে পুত্ররা তাদের ইমু গোত্রীয় মায়ের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে উক্ত টোটেমীয় বিধি-নিষেধের আওতার বাইরে।

উপরোক্ত আলোচনায় বহির্বিবাহ ব্যবস্থা উৎপত্তির কোন একটি মতবাদ প্রতিষ্ঠিত ও গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হয় না কিছু বাস্তব অসুবিধার জন্য। তাছাড়া আদিম সমাজের রীতি-নীতি ও সমাজ

ব্যবস্থা কোন কোন ক্ষেত্রে এতবেশী জটিল ও দুর্বোধ্য যে সঠিক বিষয়টি সনাক্ত করা অসম্ভব হয়ে যায়। আবার অন্য কোন সমাজের সঙ্গে তুলনা করতে গেলে তা আরো জটিল আকার ধারণ করে। তবে একথা বলা যায় যে, উপরোক্ত টোটেমীয় বিধি-নিষেধ শুধুমাত্র বৈবাহিক শ্রেণীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে এমন ধারণা না করাই বাঞ্চনীয়। বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থে পিতা-কন্যা বা মাতা-পুত্রের মধ্যকার যৌনসম্পর্ক রোধ কল্পে এসব বিধি-নিষেধকে অধিকতর মাত্রায় প্রসারিত করা দরকার।

টোটেমবাদ ও ধর্মঃ

আদিম উপজাতির গোত্র জীবনে টোটেমবাদ বহুলাংশে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য দ্বারা পরিপূর্ণ। অথবা বলা যায় যে, টোটেমবাদ হচ্ছে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আধ্যাত্মিক প্রভাব আদিম মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসকে ছেয়ে রেখেছে এবং গোত্রগুলির সৃষ্টি ও পরিপোষণে এই আধ্যাত্মিক প্রভাবের ভূমিকা কম নয়। কাজেই এক্ষেত্রে একটি বিতর্কমূলক বিষয় হচ্ছে, ধর্মীয় বিশ্বাস হতে গোত্রের উৎপত্তি, না একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ গোত্রের উৎপত্তির ফলে ধর্মীয় বিশ্বাসের উদ্ভব? এ প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। কারণ সমাজ বিজ্ঞানী দুর্খেইমের মতে অষ্ট্রেলিয় উপজাতি সবচেয়ে প্রাচীনতম মানব সমাজ - যেখানে প্রথম ধর্মের উদ্ভব হয় এবং এই আদিম উপজাতি গোত্রগুলি টোটেম কেন্দ্রীক (Islam, 1984:47)। টোটেম গোত্রের শুধুমাত্র সাধারণ নাম নয়, গোত্রের পূর্ব-পুরুষ ও গোত্রের প্রতীক। যদিও গোত্রগুলি তাদের নিজ নিজ টোটেম অর্থাৎ পূর্ব-পুরুষের সঙ্গে তাদের বংশ তালিকা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে না তবুও উক্ত টোটেমের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের কোন সন্দেহ নেই। এর সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে টোটেমের প্রতি তাদের আধ্যাত্মিক বিশ্বাস। এই আধ্যাত্মিক বিশ্বাস থেকেই গোত্রের পূর্ব-পুরুষের (টোটেমের) পূজার সুচনা এবং এ থেকেই ধর্মের উৎপত্তি বলে মনে করা হয়।

টোটেম গোত্রের প্রতীক এবং এই প্রতীকটি আদিম সমাজে সবচেয়ে বেশী পবিত্র ও সম্মানিত এবং ইহার আধ্যাত্মিক মূল্যও ততোধিক। যেহেতু টোটেম গোত্রের পূর্ব-পুরুষ ও ত্রাণকর্তা সেহেতু টোটেমের প্রতীকটিও তাদের অনুরূপ নানা কাজে সাহায্য করে বলে তাদের বিশ্বাস। যুদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রে, তাঁবু, ঘরের দেয়াল, দরজা, নৌকা, বাসনপত্র, ইত্যাদিতে টোটেমের প্রতীক অঙ্কিত করা হয়। টোটেম গোত্রের অনেকেই নিজ দেহে টোটেমের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করে থাকে। মৃত ব্যক্তির সারা শরীরে টোটেমের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করা হয়। কোন ব্যক্তিকে ধর্মে দীক্ষা দেয়ার সময় তার সারা শরীরে টোটেমের প্রতিকৃতি আঁকা হয়। ধর্মীয় যে কোন আচার-অনুষ্ঠানে যোগদানকারী ব্যক্তিবর্গ নিজ নিজ শরীরে উক্ত প্রতিকৃতি অঙ্কন করে এবং উক্ত অনুষ্ঠানের পুরোহিত এমন পোষাক পরিধান করেন যাতে তাঁকে উক্ত গোত্রের টোটেম জন্তু, উদ্ভিদ বা বস্তুর ন্যায় দেখায়।

ফ্রেজারের মতে টোটেম গোত্রের সদস্যগণ নিজেদেরকে টোটেমের নামে পরিচিত করে এবং তাদের সাধারণ বিশ্বাস যে তারা উক্ত টোটেমের উত্তরাধিকারী (Freud, 1965: 104)। এই বিশ্বাস থেকেই টোটেম জন্তু শিকার করা, হত্যা করা, ভক্ষণ করা থেকে তারা বিরত থাকে। টোটেম প্রাণীবাচক না হয়ে অন্য কিছু হলে একই বিশ্বাসে তারা তা অন্য কোনভাবেই ব্যবহার করেনা। টোটেম গোত্রগুলিতে টোটেম হত্যা বা ভক্ষণ ছাড়াও তা ছোঁয়া, দেখা বা তার নাম ধরে ডাকা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বিধি-নিষেধ ভঙ্গকারী আপনা থেকেই কঠিন ব্যাধি বা মৃত্যুর শাস্তি ভোগ করে। টোটেম প্রাণীর মৃত্যুতে উক্ত টোটেম গোত্রের কোন সদস্যের মৃত্যুর ন্যায় শোক প্রকাশ ও মৃতের সৎকার করা অর্থাৎ কবর দিতে হয়।

গোত্রের বিভিন্ন আচার-পদ্ধতির জন্য কিছু পবিত্র বস্তুর প্রয়োজন হয় এবং এরূপ একটি পবিত্র বস্তু হচ্ছে 'চুরিঙ্গা' (Islam, 1984:48)। চুরিঙ্গা হচ্ছে গোত্রের টোটেমের প্রতিকৃতি অঙ্কিত ডিম্বাকৃতি এক টুকরা মসৃণ পাথর বা কাঠ, যার এক মাথা ছিদ্র করে মানুষের মাথার চুলের সুতা বাঁধা থাকে। উক্ত সুতার সাহায্যে চুরিঙ্গাটি বেগে ঘুরালে গুনগুন শব্দ করে। গোত্রের ধর্মীয় জীবনে এই চুরিঙ্গার চেয়ে অধিক গুরুত্ববহ আর কিছু নেই। স্ত্রীলোক, এমনকি ধর্মেদীক্ষাহীন যুবকও চুরিঙ্গা স্পর্শ করতে পারে না। চুরিঙ্গার নানাবিধ মাহাত্ম্যের মধ্যে মানুষের রোগ নিরাময়, ক্ষত আরোগ্য, শক্তি, সাহস ও অধ্যাবসায় যোগান ইত্যাদি প্রধান। চুরিঙ্গাটিকে বিশেষ যত্নের সঙ্গে রাখা এবং নানাবিধ পূজা-অর্চনা দেয়া হয়। প্রশ্ন হচ্ছে চুরিঙ্গারূপী একখন্ড কাঠ বা পাথরের এই উচ্চ ধর্মীয় মর্যাদার কারণ কি এবং অন্যান্য কাঠ বা পাথরের সঙ্গে এর পার্থক্য কি? এই মর্যাদা এবং পার্থক্যের একমাত্র কারণ হচ্ছে চুরিঙ্গাটিতে টোটেমের প্রতিকৃতি অঙ্কিত থাকা। অতএব দেখা যায় যে টোটেম একটি অতি পবিত্র প্রতীক এবং যে বস্তুতে উক্ত প্রতীক অঙ্কিত থাকে তাও পবিত্র। তাই যখন কোন দু'টি গোত্র কোন চুক্তি সম্পাদন করে তা টোটেমের প্রতিকৃতি দ্বারা শীলমোহর করে রাখে। টোটেম ও টোটেমের প্রতীক- এ দুটি বিষয়ের প্রতি আদিম মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বেশ অভিনব। টোটেমের প্রতীককে যে মর্যাদা দেয়া হয়, আসল টোটেমকে সে মর্যাদা দেয়া হয় না। চুরিঙ্গাটিকে বিশেষভাবে রক্ষা করা হয় এবং নানাবিধ পূজা-অর্চনাও করা হয় কিন্তু টোটেম যত্র-তত্র পড়ে থাকে বা ঘুরে বেড়ায় এবং তাকে কোন পূজা-অর্চনা করা হয় না। কাজেই দেখা যায় যে টোটেমের চেয়ে টোটেমের প্রতীকটির মূল্য বেশী, অধিক পবিত্র, পূজণীয় এবং গুরুত্ববহ (*Ibid*, P. 49)।

টোটেমকে পূজার পরিবর্তে তার প্রতিকৃতিকে পূজার সঙ্গত কারণ হচ্ছে প্রতিকৃতিটির এক নৈর্ব্যক্তিক শক্তি ও আধ্যাত্মিক প্রভাবের প্রতি বিশ্বাস। গোত্র সদস্যরা নিজেদেরকে এক একটি টোটেম জন্তু বা বস্তু মনে করে বলে টোটেমকে পূজা করা নিজেকে পূজা করার নামান্তর মাত্র। কাজেই টোটেমের প্রতীকটিকে পূজার প্রকৃত অর্থ ঐ নৈর্ব্যক্তিক শক্তির পূজা, যে গোত্রকে জীবনী

শক্তি যোগায়। ব্যক্তির মৃত্যু হয় কিন্তু এই শক্তি পুরুষাণুক্রমে একটি বাস্তব ও চিরন্তন শক্তিরূপে গোত্রকে প্রেরণা দেয়। অতীতে প্রেরণা দিয়েছে, বর্তমানে দেয় এবং ভবিষ্যতেরও অনুপ্রাণীত করবে। গোত্র সদস্যদের মধ্যে রক্ত সম্পর্ক নেই কিন্তু এই অজ্ঞাত নৈর্ব্যক্তিক শক্তিই গোত্রকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে এবং গোত্র সদস্যদের মধ্যে পুরুষাণুক্রমে একত্বের অনুভূতি সৃষ্টি করেছে। এই শক্তিই হচ্ছে টোটেমীয় গোত্রের ঈশ্বর, দুর্খেইম এর মতে 'টোটেমীর সত্য' (*Ibid*, P. 50)।

সুতরাং টোটেমের যে গুরুত্ব তা আসলে তার প্রতীক হিসাবে এবং প্রতীকটি একদিকে যেমন গোত্রের প্রতীক, অন্যদিকে আবার ঈশ্বরের প্রতীক অর্থাৎ টোটেমের প্রতীক একাধারে ঈশ্বরের ও গোত্রের প্রতীক। ফলে গোত্র ও ঈশ্বর এক এবং অভিন্ন, তা না হলে উভয়ের প্রতীক এক হতে পারে না। মানুষ ঈশ্বরে ভরসা করে শক্তি পেতে চায় এবং অধিকাংশ সময় তার মুখাপেক্ষী হয়। অনুরূপ তারা নানাভাবে গোত্রের উপর নির্ভরশীল এবং ব্যক্তি জীবনের প্রয়োজনে নানাভাবে গোত্রের করুনা প্রার্থী ও গোত্রের মুখাপেক্ষী। মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে ঈশ্বরের প্রভূত্বও স্বীকার করে, কারণ ঈশ্বর এক নৈর্ব্যক্তিক শক্তির ধারণ। ফলে ঈশ্বরের প্রভুত্ব স্বীকার করা গোত্রের প্রভুত্ব স্বীকার করার নামান্তর, কারণ গোত্র ও ঈশ্বর এক। গোত্রের কর্তৃত্ব ব্যক্তি তার প্রত্যাহিক জীবনে সমানভাবে অনুভব করছে। তার নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছা সবকিছুই গোত্রের আচরণ বিধির কাছে বিসর্জন দেয়। বিপদে-আপদে, সুদিনে-দুর্দিনে গোত্র ব্যক্তির পাশে এসে দাঁড়ায় এবং গোত্র সদস্যগণ ব্যক্তির বিপদে-আপদে সহায়তা, সাহস ও মনোবল দেয় এবং বিপদ থেকে উদ্ধার করে। গোত্রের সদস্যরূপে ব্যক্তি যা কিছুর অধিকারী তা সবই গোত্রের দান। ভাষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা, ইত্যাদি সবকিছুই ব্যক্তি পুরুষাণুক্রমে গোত্রের নিকট হতে লাভ করে। কাজেই ব্যক্তি প্রতি পদে পদে এক গোত্রীয় নৈর্ব্যক্তিক শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করে যা ব্যক্তির চেয়ে বড় এবং তার প্রতি সহানুভূতিশীল। কাজেই এই শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ও পূজার মানোভাব সৃষ্টি হওয়া ব্যক্তি জীবনে বিচিত্র কিছু নয়।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে গোত্র ঈশ্বরের ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। এই ধারণা মানব মনে প্রথম কিভাবে উদ্ভূত হয় তা জানতে পারলে আদিম সমাজে ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশের ধারা নির্ণয় করা সহজতর হবে। কারণ ধর্মের প্রতি বিশ্বাস ঈশ্বরের ধারণা থেকেই উদ্ভূত।

সমাজবিজ্ঞানী দুর্খেইমের মতে অষ্ট্রেলিয়ার আদিম সমাজ প্রাচীনতম মানব সমাজ এবং এই সমাজেই প্রথম ধর্মের আর্বিভাব। তাঁর মতে তাদের গোত্র জীবনে 'আর্থিক ও আনুষ্ঠানিক' দু'টি দিক আছে। জীবিকার প্রয়োজনে তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবিকা অন্বেষণ করে। এই আর্থিক জীবন বড় কঠোর বাস্তব এবং বৈচিত্রহীন যাতে কোন হাসি আনন্দ

নেই। কিন্তু এই কঠোর বাস্তব এবং বৈচিত্রহীন জীবনের মানুষগুলি বছরের কয়েকটি বিশেষ অনুষ্ঠানে[১] অল্প সময়ের জন্য হলেও সকল কর্মব্যস্ততা পরিহার করে একত্রে মিলিত হয়। এই মিলন তাদের মাঝে প্রাণচাঞ্চল্য ও আবেগের সৃষ্টি করে। আমাদের ন্যায় আদিম মানুষের তাদের আবেগের উপর কোন কার্যকর নিয়ন্ত্রণ না থাকায় তারা তাদের ভাবাবেগকে নির্দিষ্ট সীমায় বাঁধতে পারে না। ফলে তারা উক্ত অনুষ্ঠান সমূহে যাবতীয় দুঃখ যাতনা ভুলে গিয়ে আত্মসংযম হারিয়ে ফেলে এবং আনন্দে, স্ফুর্তিতে, হৈ হুল্লোড়ে গা ভাসিয়ে দেয়। তাদের হৃদয়ের বাঁধ ভেঙ্গে যায় এবং বাধা-বন্ধনহীন উন্মত্ত আনন্দ আর উদ্দামতায় তারা ফেটে পড়ে এবং তা প্রকাশ পায় তাদের নাচে, গানে, উচ্চ বাদনে ও প্রবল চিৎকারে। এই প্রাণ উচ্ছলতার চরম পর্যায়ে তারা অনেক নিষিদ্ধ ও গর্হিত কাজ করে। তারা পরস্পর স্ত্রী বদল করে, নিষিদ্ধ যৌন মিলনে রত হয় এবং প্রায় সকলেই নিষিদ্ধ অজাচারে লিপ্ত হয় (*Ibid.* P. 53)। এই পরিস্থিতিতে আদিম মানুষের আবেগ শুধু কল্পনা করা যায়, বর্ণনা করা যায় না।

ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে এমন প্রাণবন্ততা, এমন অজাচার অপ্রত্যাশিত ও অচিন্ত্যনীয়। ব্যক্তি তার নিজ সত্তাকে হারিয়ে ফেলে এক অব্যক্ত দুর্জ্ঞেয় নৈর্ব্যক্তিক শক্তির কাছে – যা তাকে এমন আচরণ করায়। এই শক্তি তাকে এমন এক জগতে নিয়ে যায় যে জগতের সঙ্গে তার গতানুগতিক জীবনের কোন মিল নেই। গোত্রের সম্মিলিত অনুষ্ঠানে সমবেত প্রাণবন্ততার মধ্যে ব্যক্তি এই নৈব্যক্তিক শক্তির ধারণা লাভ করে এবং এই ধারণা ঈশ্বরের ধারণায় পরিণত হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে টোটেমের প্রতীক কি করে ঈশ্বরের ধারণায় পরিণত হয়? উপজাতি গোত্রসমূহে টোটেম গোত্রের প্রতীকরূপে পরিচিত। গোত্র একটি বির্মূত ধারণা, এর পরিধি ব্যাপক এবং নানা শাখা-প্রশাখা, ব্যবস্থা ও অনুশাসনের জটিল জালে আবদ্ধ গোত্র সদস্যগণ। পক্ষান্তরে গোত্রের প্রতীকটি বাস্তব ও দৃষ্টিগ্রাহ্য। আদিম মানুষ তাদের সীমিত জ্ঞানের দ্বারা একটি বিমূর্ত ধারণার চেয়ে একটি মূর্ত ধারণাকে সহজে বুঝতে পারে এবং তা সহজেই গ্রহণ করে। অতএব তাদের মনে যে ঈশ্বরের অনুভূতি সৃষ্টি হয় তা বাস্তব ও দৃষ্টিগ্রাহ্য টোটেম প্রতীকটির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। যে অনুষ্ঠানে ধর্মের অনুভূতি জন্ম নেয় তাতে টোটেমের প্রতীকটি নানাভাবে উপস্থিত থাকে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকে নিজ নিজ দেহে টোটেমের প্রতিকৃতি অঙ্কন করে, যে সব পবিত্র বস্তু (চুরিঙ্গা) এসব অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয় তাতেও টোটেমের প্রতিকৃতি অঙ্কিত থাকে, চারদিকের সাজ-সজ্জায়ও টোটেমের প্রতিকৃতির ছাপ থাকে। এই পরিবেশে স্বভাবতঃই গোত্র সদস্যদের মনে টোটেমের প্রতীকটি নৈর্ব্যক্তিক শক্তির উৎসে পরিণত হয়। অনুষ্ঠান শেষে প্রাণচাঞ্চল্য ঝিমিয়ে পড়ে, সবাই জীবিকার অন্বেষণে ফিরে যায়, কিন্তু টোটেমের প্রতীকটির মাধ্যমে নৈর্ব্যক্তিক শক্তির ধারণা বেঁচে থাকে এক অনুষ্ঠান হতে অন্য অনুষ্ঠান পর্যন্ত। পুরুষাণুক্রমে মানুষ আসে, মানুষ যায়, কিন্তু টোটেম মৃত্যুহীন, টোটেম শাশ্বত। টোটেমই গোত্রের একমাত্র চিরস্থায়ী ও চিরায়ত শক্তি যা কখনো বিনষ্ট হয় না বা লোপ পায় না। কাজেই গোত্র জীবনে টোটেম এক ঐশ্বরিক শক্তিরূপে বিরাজমান থাকে।

টোটেম ও ট্যাবু (Totem and Taboo)ঃ

আদিম উপজাতি মানুষের জীবন বহুবিধ বিধি-নিষেধের জটিল জালে আবদ্ধ। এসব বিধি-নিষেধের মধ্যে ট্যাবুর ধারণা অন্যতম। ট্যাবু একটি পলিনেশিয়ান শব্দ-যা দুটি পৃথক ও বিপরীত মুখী অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমত পবিত্র ও উৎসর্গ করা, এবং দ্বিতীয়ত ভৌতিক, বিপদজনক, নিষিদ্ধ, নোংরা, ইত্যাদি অর্থে ট্যাবু শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ট্যাবুর প্রচলিত ধারণা হতে বলা যায় যে, ট্যাবু হল ব্যক্তির আয়ত্বাধীন নয় এমন জন্তু বা বস্তু যার প্রতি কিছু বিধি-নিষেধ বিদ্যমান (Freud, 1965:18)। যদিও ট্যাবুকে ধর্মীয় নিষেধ বলে মনে করা হয়, তবে প্রকৃত পক্ষে ইহা ধর্মীয় বা নৈতিক বিধি-নিষেধ হতে ভিন্ন। ইহা কোন ঐশ্বরিক অধ্যাদেশ নয় বরং নিজ স্বার্থেই এগুলি আরোপিত হয়েছে। এই বিধি-নিষেধগুলি আরোপের সঠিক প্রক্রিয়া ও যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ পাওয়া যায় না। ট্যাবু উদ্ভবের সত্যিকার কোন ভিত্তি নেই বরং ইহা সম্পূর্ণ এক অজানা উৎস হতে উদ্ভুত।

Wundt (1906: 308: quoted in Freud, 1965: 18-19) এর মতে ট্যাবু মানুষের প্রাচীন অলিখিত আইনের বিধানাবলী। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে ট্যাবু ঈশ্বরের চেয়েও প্রবীণ এবং যে কোন ধর্মের অস্তিত্বের পূর্বের বিষয়। ট্যাবুর ধারণার আওতাভুক্ত হল (ক) ব্যক্তি বা বস্তুর পবিত্র ধর্ম, (খ) এই ধর্ম হতে উদ্ভুত কিছু বিধি-নিষেধ এবং (গ) এই সব বিধি নিষেধ ভঙ্গের জন্য নির্ধারিত শুদ্ধি প্রক্রিয়া। ট্যাবু স্থায়ী ও অস্থায়ী হতে পারে। স্থায়ী ট্যাবু যাজক, গোত্র প্রধান, মৃত ব্যক্তি ও তার ব্যবহৃত সামগ্রীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অস্থায়ী ট্যাবু বিশেষ কিছু অবস্থায় বিদ্যমান, যেমন মহিলাদের মাসিক ও সন্তান জন্মের সময়, অথবা বিশেষ কিছু কাজের সময়, যেমন মাছ ধরা বা শিকার করা।

আদিম সমাজে ট্যাবু ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও সামাজিক, বৈবাহিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এসব ট্যাবুর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে টোটেম ও এর প্রতিকৃতি ধর্মেদীক্ষাহীন ব্যক্তি ধরতে বা স্পর্শ করতে পারবেনা, টোটেম জন্তুকে হত্যা করা বা খাওয়া নিষেধ, একই টোটেমভুক্ত গোত্রের নারী-পুরুষের বিয়ে হবে না। এছাড়াও সন্তান-জন্মের সময়, মৃতের সৎকারের সময়, মেয়েদের বয়ঃপ্রাপ্তীর সময়, ব্যক্তির ধর্মেদীক্ষা গ্রহণের সময় আদিম মানুষ নানাবিধ ট্যাবু মেনে চলে। আদিম সমাজ কঠোরভাবে এসব ট্যাবু গোত্র সদস্যদের উপর প্রয়োগ করে। কেউ পালন করতে অস্বীকার করলে বা কোন ত্রুটি করলে সমাজ শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং অপরাধীকে কঠোর শাস্তি দেয়। কেউ গোপনে ট্যাবু ভঙ্গ করলে এবং সমাজ কর্তৃক শাস্তি না পেলে টোটেম নিজেই অপরাধীর শাস্তি বিধান করে। কারণ টোটেম একাধারে গোত্রের পূর্ব-পুরুষ ও ঈশ্বর।

উল্লেখিত ট্যাবুগুলির অধিকাংশই আমরা আমাদের গ্রামীণ সমাজে লক্ষ্য করি। এছাড়াও আরো এমন কিছু ট্যাবু আছে যা বেশ দুর্বোধ্য এবং এসব অনেক ক্ষেত্রে উদ্ভট পাগলামী ও সকপোল

কল্পিত বলে মনে হয়। অনেক জড় বস্তুতেও ট্যাবু বিদ্যমান - যার ব্যবহার সমাজ জীবনে অনুপস্থিত। লোহা এরূপ একটি ট্যাবু ধাতু - যা আদিম সমাজের দৈনন্দিন জীবনের অনেক ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। অনেক সমাজে লোহার ব্যবহার থাকলেও তা আচার-অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত। যেমন আফ্রিকার হটেনটট ও পাউনি উপজাতি তাদের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মে লোহা পরিহার করে। প্রাচীন হিব্রু জাতি জেরুজালেম মন্দির নির্মাণে লোহার হাতিয়ার ব্যবহার করেনি। প্রাচীন মিশরে মৃতদেহ মমি করার সময় লোহার ব্যবহার ছিল নিষিদ্ধ। অনেক সমাজে প্রবল বিশ্বাস যে প্রেত জগৎ, বিশেষত জ্বীন ও পরী লোহা দেখে ভয় পায়। ইউরোপের লোক কাহিনীতে, বিশেষতঃ অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে আয়ারল্যাণ্ডের লোক কাহিনীতে জ্বীন পরীর লোহা ভীতির অনেক দৃষ্টান্ত আছে। (Islam, 1974: 128)।

আদিম সমাজে তিন ও সাত সংখ্যা দুটির প্রতি পক্ষপাত পোষণ করা হয় এবং কুসংস্কার বশতঃ তারা সংখ্যা দুটি এড়িয়ে চলে। আমাদের সভ্য সমাজেও তের সংখ্যাটিকে অশুভ বলে গণ্য করা হয়। এছাড়াও আদিম গোত্রগুলিতে কোন কোন খাদ্য বা পোষাকের ক্ষেত্রে ট্যাবু লক্ষ্যণীয়। আদিম উপজাতি মানুষের মাঝে এসব ট্যাবু কিভাবে বিকশিত হয়েছে তা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। অনেক নৃতাত্ত্বিক এসব ট্যাবুকে টোটেমবাদের সঙ্গে এক করে দেখেছেন। কিন্তু এসব ট্যাবু শুধুমাত্র টোটেমবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এমন ধারণা আজকাল প্রায় অচল। কত ব্যক্তি, বস্তু বা কাজের উপর সামাজিক বিধি-নিষেধ থাকতে পারে তার কোন ইয়াত্তা নেই। এমন অনেক সমাজ আছে যেখানে কোন টোটেমবাদের ধারণা নেই কিন্তু বিধি-নিষেধ আছে, আবার টোটেমবাদ বিদ্যমান কিন্তু একগোত্রে যা ট্যাবু অন্য গোত্রে তা ট্যাবু নয়। এমনও দেখা যায় যে টোটেমভুক্ত গোত্রগুলির ট্যাবু পরস্পর বিরোধী। যেমন মধ্য অষ্ট্রেলিয়ার অরুন্তা উপজাতি টোটেম গোত্রে বিভক্ত কিন্তু তাদের মাঝে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ নয় - যা প্রায় টোটেম গোত্রে নিষিদ্ধ। প্রায় সব টোটেম গোত্রই টোটেম জন্তুকে হত্যা করেনা বা খায় না কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার উপজাতিরা উৎসর্গের সময় টোটেম জন্তু উৎসর্গ করে এবং তা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে এবং গোত্র সদস্যরা সমবেতভাবে তার মাংস খায় (*Encyclopaedia Britannica*, 1966: 22: 318) আবার এমন সমাজও আছে যা টোটেমভুক্ত নয় কিন্তু ট্যাবু বিদ্যমান। যেমন মুসলমানগণ শুকরের মাংস খায় না, কারণ শুকর ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ কিন্তু শুকর ইসলাম ধর্মে টোটেম নয়। অনুরূপ গরু হিন্দু ধর্মে টোটেম নয় কিন্তু তারা গরুর দুধ ও দুগ্ধজাত অন্যান্য খাবার খেলেও গরুর মাংস খায় না।

আদিম সমাজ ব্যবস্থা যেমন জটিল ও দুর্বোধ্য তেমনি এর আচার-আচরণ ও বিধি-নিষেধগুলিও। তাই এই সমাজের প্রথা প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপত্তি ও বিকাশের ক্ষেত্রে সঠিক ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য কোন মতবাদ দেয়া সম্ভব নয়। অনুরূপ টোটেমবাদকে কেন্দ্র করে টোটেমীয় গোত্রগুলিতে ও টোটেম বহির্ভূত গোত্রগুলিতে প্রচলিত বিধি-নিষেধগুলির উদ্ভব ও বিকাশের একক কোন কারণ

চিহ্নিত করা যায় না। এসব বিধি-নিষেধের মূল কারণ যেমন আধ্যাত্মিক, তেমনি এর ব্যবহারিক কারণও তুচ্ছ নয়। উপজাতীয় গোত্র জীবনে আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক উপাদানের যে সমন্বয় ঘটেছে এসব বিধি-নিষেধ তার ব্যতিক্রম নয় বলে মনে করা হয়।

উপসংহারঃ

আদিম সমাজে গোত্র এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। গোত্রের এই প্রাধান্যের কারণ টোটেমবাদ। তাদের ধারণা প্রত্যেক গোত্রের একজন পূর্বপুরুষ আছে এবং গোত্রের টোটেম হচ্ছে সেই পূর্বপুরুষ। কিন্তু এটা সত্য যে প্রায় ক্ষেত্রেই তারা তাদের পূর্বপুরুষ টোটেমের সঙ্গে সঠিক বংশ তালিকা দেখাতে পারে না। তবুও গোত্রের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের কোন শৈথিল্য লক্ষ্য করা যায় না। গোত্র সদস্যরা বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করলেও তারা পরস্পরকে আপনজনদের ন্যায় সমমর্যাদা দেয় এবং প্রয়োজনে একে অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসে। আক্রমণকারী কোন গোত্রের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ গোত্রের সদস্যগণ প্রতিশোধ গ্রহণে একতাবদ্ধ প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় বংশ পরম্পরায়। তাদের এই সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় সম্পর্কের একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে টোটেমবাদের ধারণা।

টোটেম ও টোটেমবাদকে কেন্দ্র করে অদ্ভুত ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠান ও বিধি-নিষেধের উদ্ভব হয়েছে আদিম উপজাতি সমাজে। এসব আচার-অনুষ্ঠান ও বিধি-নিষেধ উদ্ভবের কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা ও প্রক্রিয়া নেই এবং এগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন অঞ্চল ও গোত্রভেদে। টোটেম গোত্রে টোটেম জন্তু শিকার, হত্যা ও তার মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ কিন্তু 'টোটেম ভোজ' (Totem meal) অনুষ্ঠানে গোত্র তাদের দেবতার উদ্দেশ্যে টোটেম জন্তু উৎসর্গ করে এবং তার মাংস তারা সমবেতভাবে খায় (Smith, 1894: 214; quoted in Freud, 1965: 132 -34)। গোত্র জীবনে উৎসর্গ একটি প্রধান অনুষ্ঠান এবং প্রতি উৎসর্গের সঙ্গে একটি সাধারণ ভোজের ব্যবস্থা থাকে। অর্থাৎ একটি সাধারণ ভোজের জন্যই উৎসর্গ করা হয়। টোটেম ভোজ একটি সাময়িক ও ক্ষণিকের বিষয় হলেও আদিম মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ঠ ভুলে আনন্দ সাগরে অবগাহন করে এসব অনুষ্ঠানে যোগদানের মাধ্যমে এবং তাদের মাঝে এক পারস্পরিক নির্ভরশীলতার অনুভূতি সৃষ্টি হয়।

'টোটেম ভোজ' অনুষ্ঠানে আদিম মানুষ তাদের টোটেম জন্তু বধ করে তাদের প্রচলিত নিয়ম-নীতির ব্যতিক্রম হিসাবে। গোত্র একত্রে এরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং যাবতীয় দায়-দায়িত্ব গোত্রই বহন করে। অনেক টোটেম গোত্রে টোটেম জন্তু বধ করার পর গোত্র সদস্যরা একত্রে শোক ও বিলাপ করে এবং টোটেমের চামড়া বা পালক (অভক্ষণযোগ্য বস্ত) সযত্নে সংরক্ষণ করে। ক্যালিফোর্নিয়ার ইণ্ডিয়ান উপজাতি তাদের পূর্ব-পুরুষ পাখীকে বধ করে শোক ও বিলাপ করে এবং তার পালক ও চামড়া সংরক্ষণ করে (Freud, 1965: 139)। নিউ মেক্সিকোর জুনি ইণ্ডিয়ানরাও এই একই পন্থায় তাদের পবিত্র কাছিমকে ঘিরে অনুরূপ অনুষ্ঠান করে থাকে।

আদিম সমাজে নিজ গোত্রের টোটেমকে বধ বা ভক্ষণ নিষিদ্ধ থাকলেও অন্য গোত্রের টোটেমের ক্ষেত্রে এরূপ বিধি-নিষেধ থাকে না। তবুও অনেক উপজাতিতে নিজ টোটেম ছাড়াও অন্য গোত্রের টোটেমের প্রতিও সম্মান দেখান হয়। দক্ষিণ-পূর্ব নিউগিনির উপজাতিরা মাতৃসুত্রীয় এবং উত্তরাধিকার সূত্রে মাতৃ গোত্রের টোটেমকে নিজ টোটেম হিসাবে গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে তাদের পিতৃ গোত্রের টোটেমও নিজ টোটেমের সমমর্যাদার বিধি-নিষেধের আওতাভূক্ত হয়। আফ্রিকার টোটেম গোত্রগুলিতে মহিলাদের জন্য সাধারণ নিয়ম হল, তারা সর্বদাই তাদের স্বামীর টোটেমকে পরিহার করে চলবে (*Encyclopaedia Britannica*, 1966: 22: 318)। এমনি আরো অসংখ্য উদাহরণ হতে দেখা যায় যে আদিম মানুষের জীবন নানাবিধ টোটেমীয় আচার-অনুষ্ঠান ও বিধি-নিষেধের জটিল জালে বাঁধা।

টোটেমবাদ হচ্ছে আদিম মানব সমাজের একটি অন্যতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মানব সমাজের অধিকাংশ প্রথা প্রতিষ্ঠান ও রীতি-নীতির বিকাশ ঘটেছে। ফলে আদিম সমাজ সম্পর্কে যে কোন আলোচনা টোটেমবাদকে বাদ দিয়ে সম্পন্ন হতে পারে না। আদিম সমাজ ছাড়াও বর্তমানের উন্নত সমাজের প্রথা-প্রতিষ্ঠান ও আচার-অনুষ্ঠানগুলির বিকাশ ধারা অনুসন্ধানের জন্যও এরূপ প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে। কারণ আধুনিক উন্নত সমাজের যাবতীয় প্রথা-প্রতিষ্ঠান ও রীতি-নীতি বিক্ষেপণ, গ্রহণ, উদ্ভাবন, বিবর্তন, ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এক সমাজ হতে অন্য সমাজে চলে আসছে। অতএব একথা বলা যায় যে, আধুনিক উন্নত সমাজের বিভিন্ন প্রথা-প্রতিষ্ঠান, রীতি-নীতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণার জন্য আদিম সমাজের আলোচনা বা বিশ্লেষণ অত্যাবশ্যক এবং তা করতে হলে টোটেমবাদের আলোচনা ছাড়া সম্ভব নয়।

গ্রন্থপঞ্জী

Ahmed, Nizam Uddin. 1970
Prithibeer Adim Samaj (Primitive Society of the World), Dhaka: Bangla Academy.

Durkheim, Emile. 1976
The Elementary Forms of the Religious life, translated by Joseph Ward Swain, London: George Allen & Unwin Ltd.

Freud, Sigmund. 1965
Totem and Taboo, translated by James strachey, London: Routledge & Kegan Paul.

Islam, Mahmuda. 1974
Nritatwer Sahaj Path (Bengali translation of ' Teach Yourself Anthropology' of J. Manchip White), Dhaka: Bangla Academy.

1984
Somaj-O-Dharma (Society and Religion), Dhaka: Bangla Academy

Matubbar, A. A. 1993
"Raboner Protibha" (Genius of Ravan), in Hossain (ed). *Collected Writings* of Aroj Ali Matubbar, Dhaka: Pathak Shamabesh.

Samad, A. G. 1984
"Notes on our Tribal Population" in Qureshi (ed.) *Tribal Cultures in Bangladesh*, Rajshahi: Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University.

Service, E. R. 1978
Profiles in Ethnology, London: Harper & Row Publications.

A Dictionary of the Social Sciences, USA: Tavistock Publishers, 1964.

Encyclopaedia Britannica, vol. 22, Chicago: Encyclopaedia Britannica Inc. William Benton Publishers, 1966.

Encyclopaedia of the Social Sciences, vol. 14, New York: The Macmillan Company, 1954.

নিঃশব্দ আততায়ীঃ মূল্যবোধ ও প্রথা প্রতিষ্ঠান

সুলতানা মোসতাফা খানম

সারসংক্ষেপঃ

সামাজিক মূল্যবোধ ও প্রচলিত প্রথা-প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির স্বরূপ অন্বেষণের এক অনুপম হাতিয়ার, যা একদিকে তাকে তার শেকড় সন্ধানে ব্রতী করে তোলে অন্যদিকে তার ঐতিহ্য লালনের শক্তি যোগায়। কিন্তু স্বার্থান্বেষী সুবিধাভোগী একটি শ্রেণী এই ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে রূপান্তরিত করে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের অন্যতম হাতিয়ারে। এই স্বার্থ শ্রেণীভিত্তিক ও লিঙ্গভিত্তিক উভয়ই। বক্ষমান নিবন্ধে মূল্যবোধ ও প্রথা প্রতিষ্ঠানের আবরণে নারীদের স্বাস্থ্য সেবা/চিকিৎসা লাভের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি উন্মোচিত করার একটি প্রয়াস নেয়া হয়েছে। নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়োজনে এই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীর ভূমিকাটিও আলোচিত হয়েছে।

ভূমিকাঃ

শিশু নির্যাতন ও নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে আজ বিশ্বব্যাপী ঝড় উঠেছে। শিশু শ্রম, আপত্তিজনক পেশায় শিশু নিয়োগ, যৌতুক ও ধর্ষণ ইত্যাদি শিশু ও নারী নির্যাতনের অন্যতম নির্ধারকরূপে চিহ্নিত হয়ে আসছে। কিন্তু এ সমস্ত কিছুর আড়ালে, অত্যন্ত নিভৃতে নির্যাতনের যে প্রক্রিয়াটি শিশু ও নারীর জীবনকে প্রতিনিয়ত ঝুঁকির সম্মুখীণ করে তুলছে তার স্বরূপ খুব কমই উদ্ঘাটিত হয়। এই প্রক্রিয়াটি হচ্ছে স্বাস্থ্য সেবা লাভের ক্ষেত্রে সুকৌশলে দাঁড় করিয়ে দেয়া কিছু প্রতিবন্ধকতা। এই প্রতিবন্ধকতাগুলো কখনও মূল্যবোধের মোহনীয় মোড়কে, কখনোও বা প্রথা প্রতিষ্ঠান তথা ঐতিহ্য রক্ষার অনিবার্য তাগিদের রূপ নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। আমরা, সুবিধাভোগী শ্রেণীর একটি অংশ হয় এগুলোকে কুসংস্কার, বর্বরতা বলে আখ্যায়িত করি, কিংবা সম্পূর্ণই অগ্রাহ্য করি। সুবিধাভোগী শ্রেণীর অন্য একটি অংশ, যে প্রকৃতপক্ষে এই মূল্যবোধ জনিত আচরণের কারণে লাভবান হয়, সে সচেষ্ট হয়ে এই প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখতে। বক্ষমান নিবন্ধে মূল্যবোধ ও প্রথা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নারী নির্যাতনের যে প্রক্রিয়াটি চলমান, তার কিছু দিক উন্মোচনের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে আমি চিকিৎসা বা স্বাস্থ্যসেবা লাভ এর প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে সম্যক আলোকপাত করব। তার পূর্বে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নারী যে প্রকৃত পক্ষেই বৈষম্যের শিকার, তার কিছু তথ্য উপস্থাপিত করা হবে।

নারী ও নারী শিশু স্বাস্থ্য - বৈষম্যমূলক অবস্থানঃ

বাংলাদেশে শিশু ও কিশোরের মোট জনসংখ্যা হচ্ছে ৫১.৫ মিলিয়ন। এই সংখ্যার একটি বিরাট অংশ নারী শিশু। কেননা মোট জনসংখ্যার ৪৮% ভাগই নারী। এই নারী বা নারী শিশু উভয়েরই একটি সার্বজনীন প্রতিচ্ছবি হচ্ছে অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতা। মায়ের অপুষ্টির অনিবার্য ফলশ্রুতি হচ্ছে শিশুর লঘু ওজন বিশিষ্টতা (Low birth weight) যা আনুপাতিক হারে ছেলে ও মেয়েদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৬.৮% এবং ৯.৫% (হোসেনঃ ১৯৯১)। ICDDR, B মতলব এলাকায় জরীপে দেখা গেছে যে ১-৪ বছরের মেয়ের ক্যালোরীভাগ একই বয়সের ছেলেদের চাইতে ১৬% কম এবং প্রোটিনের ভাগ ১২% শতাংশ কম (ICDDR, B, 1985)। এই লিঙ্গভিত্তিক খাদ্যবন্টন প্রক্রিয়া প্রচলিত থাকে নারীর সমগ্র জীবনব্যাপী। একজন গর্ভবর্তী মায়ের অপুষ্টি কেবল লঘু ওজন বিশিষ্ট শিশুর জন্মই দেয়না তা মাতৃ-মৃত্যুর ঝুঁকিও বাড়িয়ে তোলে। UNICEF (1993) এর এক রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে এই মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৬ জন এবং মহিলাদের মোট মৃত্যুর হারের ১৫% ভাগই গর্ভকালীন বা প্রসবজনিত মৃত্যু। এশিয়ায় প্রসবজনিত মৃত্যুর ঝুঁকি প্রতি ৫১ জনে ১ জন। বাংলাদেশে এর হার ৩০ঃ১ জন। এই মৃত্যুর অন্যতম কারণ হচ্ছে গর্ভপাত (২১%), একলাম্পসিয়া (১৬%), জটিলতর প্রসব সমস্যা (৮%), প্রসবোত্তর রক্তস্রোত (২৬%) এবং প্রসবোত্তর পচন (১১%)। এর প্রতিটি আধুনিক চিকিৎসার সাহায্যে প্রতিরোধ যোগ্য। অথচ দুর্ভাগ্যজনক সত্যিটি হচ্ছে মহিলারা এই আধুনিক চিকিৎসা বা যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা লাভ হতে বঞ্চিত থাকছেন হয় অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে, নয়তো প্রচলিত মূল্যবোধ ও প্রথা প্রতিষ্ঠানের চাপে।

স্বাস্থ্য সেবা ও চিকিৎসাঃ

জন্মলগ্ন থেকে যদিও মেয়ে শিশু বৈষম্যের শিকার হয়ে আসে, তথাপি ১ বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে মেয়ে শিশুদের মৃত্যুহার ছেলেদের চাইতে অনেক কম। এর কারণ হিসাবে বলা যায়, এই সময়টুকুতে শিশুকে বিকল্প খাবারের উপর নির্ভরশীল হতে হয় না এবং শিশুর নাজুক অবস্থানগত কারণে যত্নের প্রতি কোন তারতম্য হয় না। কিন্তু যেই মুহূর্তে শিশুটি পারিবারিক আয়ের একটি অংশে ভাগ বসাতে শুরু করে, তখনই অনিবার্যভাবে, বাবা মায়ের নিজেরও অজান্তে, অচেতন মনে শুরু হয়ে যায় 'লাভ ক্ষতির' (Cost benefit) জটিল অঙ্ক। ছেলে শিশু সর্বদাই বিবেচিত হয় ভবিষ্যৎ আশ্রয়স্থল বা উপার্জনের একটি যোগানদার হিসাবে। পক্ষান্তরে মেয়েটি বিবেচিত হয় ভবিষ্যতের দুর্ভাবনার শেকড় রূপে। এই দুর্ভাবনা মেয়ের ভবিষ্যৎ বয়োঃসন্ধিক্ষণের অসংযত আচরণ, যৌতুক, বন্ধ্যাত্ব, বৈধব্য ইত্যাদির শাখা প্রশাখা বাড়িয়ে চলে। ফলতঃ মেয়েটি পিতামাতার ভালবাসা, মমতা ও করুণা অর্জনে সক্ষম হলেও বাস্তবতার যোগ-বিয়োগের হিসাবে বিয়োগের ঘরেই তার অবস্থান। এই "বিয়োগ" শুরু হয় পারিবারিক আয়ের বন্টনের ক্ষেত্রেও। তার ভাগটুকু যুক্ত হয় ভাইটির ঘরে। ফলে সে বঞ্চিত হয় তার প্রাপ্য খাদ্য, যত্ন ও চিকিৎসা

লাভের সুযোগ হতে। এ কারণেই দেখা যায় প্রথম বছরটি পার হবার পর থেকেই মৃত্যুহারের পাশার ছকটি উল্টে যায়, যেমনঃ–

	(প্রতি ১০০০)	(প্রতি ১০০০)
	১ বছর	১–৪ বছর
মেয়ে	১০৫	৩১
ছেলে	১২০	১৮

উৎসঃ সেলিনা হোসেনঃ মেয়ে শিশু ১৯৯১, ৩৭।

এখানে লক্ষণীয় ১–৪ বছর বয়সী মেয়ে মৃত্যুর হার ছেলেদের চাইতে ২৭% বেশী। মতলব এলাকায় এক জরীপেও দেখা যায় যে ৫–৯ বছর এবং ১০–১৪ বছর বয়সী মেয়েদের মৃত্যু হার ছেলেদের চাইতে বেশী। এর অন্যতম কারণ চিকিৎসালাভের ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য। ICDDR, B এর অন্য একটি জরীপে দেখা গেছে যে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের স্বাস্থ্যকেন্দ্র হতে বিনামূল্যে চিকিৎসা গ্রহণের সুবিধার্থে বিনামূল্যে যানবাহন ও যাতায়াতের ব্যবস্থা করার পরও ছেলেদের তুলনায় মেয়ে শিশুদেরকে চিকিৎসার জন্য খুব কমই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নেয়া হয়েছে। অথচ ডায়রিয়ায় মৃত ছেলে ও মেয়ে শিশুর আনুপাতিক হার প্রতি ১০০০ জনে যথাক্রমে ৫০ এবং ৭৯ (Khalilullah, 1985) *The Report of the Committee for Health and Man Power Planning* (1984) এর তথ্যানুযায়ী প্রদত্ত স্বাস্থ্য সেবা লাভের মাত্রা পুরুষ ও মহিলা ভেদে যথাক্রমে ৪৭.০৯% এবং ৩২.৩২%। *Bangladesh Health Profile* (1977) অনুযায়ী THC এবং RHC এর প্রদত্ত সুবিধা মহিলার পুরুষদের চাইতে অর্ধেকেরও কম ব্যবহার করেন। UNICEF এর এক রিপোর্ট (১৯৯৪) অনুযায়ী ৮০% মা গর্ভকালীন প্রতিষেধক গ্রহণে সক্ষম হলেও মাত্র ৫% মা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দাইয়ের সাহায্যে সন্তান জন্মদানের সুবিধা পান।

এবার দেখা যাক এই বৈষম্য সৃষ্টিতে প্রচলিত মূল্যবোধ ও প্রথা প্রতিষ্ঠান কি ভূমিকা রাখে এবং কিভাবে সুবিধাভোগী শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের কৌশলরূপে ব্যবহৃত হয়।

মূল্যবোধ ও প্রথা প্রতিষ্ঠান - স্বার্থ সংরক্ষণে এক অনন্য কৌশলঃ

মূল্যবোধ ও প্রথা প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির জীবন যাপনের এক অপরিহার্য অংশ বিশেষ যা সমাজ ও কৃষ্টি ভেদে ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। মূলতঃ এই মূল্যবোধ ও প্রথা প্রতিষ্ঠানগত আচরণ ও তার প্রত্যাশা

একই কৃষ্টিভুক্ত মানব গোষ্ঠীর মধ্যেও ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতিভাত হয় (Khanum, 1994)। এই ভিন্নতাকে স্বীকার করে নিয়ে বর্তমান নিবন্ধের প্রয়োজনে সমাজের আপামর জনসাধারণের মাঝে প্রচলিত কিছু মূল্যবোধ ও তৎজনিত প্রত্যাশিত আচরণ, যা স্বাস্থ্যসেবালাভের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে তা সনাক্তকরণের প্রয়াস নেব। এই পর্যায়ে আমি একটি মূল্যবোধ "ভিন্নতর পরিমণ্ডলের ধারণা" (Different Sphere) এবং তা থেকে উদ্ভুত দুটি প্রথা প্রতিষ্ঠান 'পর্দা' এবং 'গর্ভ ও প্রসবোত্তরকালীন ট্যাবুকে' বেছে নেব।

ভিন্নতর পরিমণ্ডলের ধারণা (Different Sphere)ঃ

দক্ষিণ পূর্ব এশীয় সমাজে নারী ও পুরুষের ভূমিকা এবং তাদের নিকট প্রত্যাশিত আচরণের স্বরূপকে কেন্দ্র করে একটি সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টানা আছে যা নারী ও পুরুষের জগতকে সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী দুটি পরিমণ্ডলে বিন্যাস্ত করে দেয়। এই বিভক্তি আন্তঃ পারিবারিক এবং অন্তঃ পারিবারিক ক্ষেত্রসমূহেও বিদ্যমান। বিচার-সালিস, বাজার ব্যবস্থা, পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলো পুরুষ পরিমণ্ডল এবং চারদেয়ালের অন্তরালে সাংসারিক কাজকর্ম, সন্তান উৎপাদন ও লালন পালন এবং সেবাদান নারী পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত (Kabeer, 1985, Kotalova, 1993, Jeffery et al, 1989) এই ধারণার প্রেক্ষিতে সংসারের আয় নির্বাহের দায়-দায়িত্ব কেবলমাত্র পুরুষের। এই দৃষ্টিভঙ্গী সমাজে 'পুত্র পক্ষপাতীত্বের' (Son Preference) জন্ম দেয় (Mannan, 1988, Schainbery and Reed, 1974). বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশগুলোতে যেখানে রাষ্ট্র প্রদত্ত বেকারভাতা বা বৃদ্ধকালীন ভাতা নেই, পুত্র সন্তানরা সেখানে পিতামাতার ভবিষ্যতের অন্ন সংস্থানের প্রধানতম অবলম্বনরূপে বিবেচিত হয় (Caldwell, 1983; Cain, 1981) এ সমস্ত কারণে সন্তান প্রত্যাশা থেকে শুরু করে তার লালন পালনের ক্ষেত্রেও এই লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। ধরে নেয়া হয়, যেহেতু পুরুষ শ্রম ও মেধার জোরে অর্থ উপার্জনে সক্ষম হয় এ জন্য এ দুটোর উৎকর্ষতার প্রয়োজনে তার প্রয়োজন হয় অতিরিক্ত খাদ্যের, নারীর খাদ্যের প্রয়োজন কেবলমাত্র জীবন ধারনের জন্য (Khanum, 1994) । এর ফলশ্রুতি আমরা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে দেখেছি। এই ভিন্নতর পরিমণ্ডলের অন্যতম সুচক হল পর্দা, যা একটি প্রথা প্রতিষ্ঠানও বটে।

পর্দা প্রথাঃ

গ্রাম বাংলায় পর্দা একটি সামাজিক এবং ধর্মীয় অনুশাসনরূপে প্রচলিত। এই প্রথা নারীদেরকে সকল রকম বাহ্যিক কর্মকাণ্ড হতে বিরত রাখে বিধায় উৎপাদন উপকরণের নিয়ন্ত্রণ, এর সংগে সরাসরি সংশ্লিষ্টতা এবং বাজারজাতকরণের চূড়ান্ত পর্যায়ে তাদের উপস্থিতিকে নসাৎ করে দেয় (Sharma, 1987, Islam, 1985) । জীবন নির্বাহের প্রয়োজনে শ্রেণীভেদে এই প্রথার কঠোরতা ও শৈথিল্য পরিলক্ষিত হলেও (Ahmed, 1991, White, 1990) গ্রামীণ

সমাজে এটি একটি প্রত্যাশিত প্রথা। এই প্রথা কিভাবে শ্রেণী ও লিঙ্গ ভিত্তিক স্বার্থরক্ষার কৌশলরূপে স্বাস্থ্য সেবালাভের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবার আমি সে বিষয়ে আলোকপাত করব।

Sarder and Chen, 1981; Nichter, 1989 প্রমুখ এর গবেষণায় দেখা যায় মহিলারা হাতের কাছে পাওয়া যায়, এমন সহজলভ্য চিকিৎসার উপর মূলতঃ নির্ভরশীল। কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা এর জন্য দায়ী নয়। Islam (1985) মত প্রদান করেন যে অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম মহিলারাও আধুনিক চিকিৎসার চাইতে সনাতনী চিকিৎসা (অর্থাৎ কবিরাজী, টোটকা, তাবিজ, কবজ ইত্যাদি) গ্রহণে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। মূল্যবোধ ও প্রথা প্রতিষ্ঠান তথা পর্দার দৃষ্টিকোণ থেকে এর ব্যাখ্যা করা যায়। আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণের জন্য রোগীকে চিকিৎসকের সান্নিধ্যে আসতে হয়, ক্ষেত্র বিশেষে চিকিৎসককে রোগীর শরীর স্পর্শ করতে হয় যা চিরাচরিত পর্দা প্রথাকে লঙ্ঘন করে। পক্ষান্তরে সনাতনী চিকিৎসা পদ্ধতিতে রোগীর উপস্থিতির কোন প্রয়োজন হয় না। কেবলমাত্র উপসর্গ শুনে একজন সনাতনী চিকিৎসক রোগীর চিকিৎসা প্রদান করে থাকেন। এই 'পর্দা প্রথা' কে বর্ম স্বরূপ ব্যবহার করে ঘরের ভেতরে ও বাইরে পুরুষ শ্রেণীটি নিজ অর্থনৈতিক স্বার্থকে সুরক্ষিত করে। প্রথমে দৃষ্টি দেয়া যাক ঘরের ভেতরের অর্থনৈতিক স্বার্থের দিকে। Hoodfar (1984) এর মতানুযায়ী একজন মহিলার চিকিৎসা লাভের সুযোগ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে সেই পরিবারের পারিবারিক ব্যয়ের (Expenditure) Priority-র উপর। বলাবাহুল্য একজন বাংলাদেশী মা যিনি নিজের ভাগের অত্যাবশ্যকীয় আহার্যটুকু অন্যের পাতে দেয়াকে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে করেন, চিকিৎসার ব্যাপারে ব্যয়ের বিষয়টি তিনি নিজেই Priority -র সর্বনিম্নেই রাখেন। এর পরও চিকিৎসা গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়লে পরিবারটি কতগুলি প্রশ্নের মুখোমুখি হয়, যেমনঃ তারা আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাতায়াতের ব্যয়ভার বহনে সমর্থ কিনা, অন্যান্য শিশুদের তত্ত্বাবধানের জন্য বাড়ীতে অন্য কেউ আছে কিনা, না থাকলে এই সন্তানদের জন্য অতিরিক্ত যাতায়াত ভাড়া বহনে সক্ষম কিনা? বাড়ীর কাজ প্রধানতঃ শস্য মৌসুমে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গেলে তার অনুপস্থিতিতে পরিবারটিকে বাইরে থেকে শ্রম ক্রয় করতে হবে কিনা ইত্যাদি। এর পাশাপাশি সবচে বড় যে বাঁধা, মহিলাটির দূরবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একা যাওয়া সমীচীন নয় হেতু তাকে একজন পুরুষ সঙ্গী (প্রধানতঃ স্বামী/ভাই/সমর্থ পুত্র) সাথে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে এই পুরুষটিকে তার একদিনের মজুরী হারাতে হবে, যা স্বভাবতঃই কোন পরিবারে কাম্য নয়। এই অর্থনৈতিক ক্ষতির দীর্ঘ তালিকার সামনে বৈধ লালকার্ড হিসাবে পর্দাকে ব্যবহার করা অতি সহজ, বিশেষতঃ যেখানে আধুনিক চিকিৎসার বিকল্পরূপে সনাতনী চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে।

এবার আসা যাক পরিবারের বাইরের পুরুষটির অর্থনৈতিক স্বার্থের ব্যাপারে। গ্রাম্য এলিট শ্রেণীটির স্বার্থ সংরক্ষণের প্রধানতম হাতিয়ার হচ্ছে এই 'পর্দা'। পর্দা প্রথার মধ্য দিয়ে এই শ্রেণীটি নারীদেরকে কেবল পুরুষদের সান্নিধ্যে আসার পথ বন্ধ করে না বরং অন্যান্য নারীদের সংস্পর্শে আসার পথও বন্ধ রাখে। কারণ এই যোগাযোগ ও তথ্যের আদান-প্রদান গ্রামীণ মহিলাদেরকে এমন কিছু ক্ষমতার যোগান দেয় যা গ্রাম্য এলিটদের স্বার্থ সম্বলিত অচলায়তনের ধ্বংস ডেকে আনার পথ প্রশস্ত করে। যেমনঃ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একজন নারী চিকিৎসার পাশাপাশি আরো কিছু বিষয়ে তথ্য পেতে পারে, যথাঃ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আগত অন্যান্য নারীদের সংগে কথোপকথনে সে জানতে পারে নারী নির্যাতন বিরোধী বিভিন্ন আইন এবং তা প্রয়োগের প্রক্রিয়াসমূহ যা ক্রমে তাকে আইনের আশ্রয় নিতে উৎসাহিত করতে পারে। সে জানতে পারে উন্নয়ন সংস্থায় বা পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে কর্মনিয়োগের কথা, ক্রমে সে তাতে অংশ নিতে পারে। সন্তানহীনা মহিলারা আধুনিক চিকিৎসা কেন্দ্রেই জানতে পারে সন্তান ধারনে অক্ষমতার দায়-দায়িত্ব একমাত্র তার নয়, তার স্বামীরও হতে পারে।

পুরুষদের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলির প্রথম এবং শেষোক্তটি লিঙ্গভিত্তিক এবং দ্বিতীয়টি শ্রেণীভিত্তিক স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। যৌতুক বিরোধী আইন, মুসলিম পারিবারিক আইন, নারী নির্যাতন বিরোধী আইন ইত্যাদির প্রয়োগ স্বভাবতঃই পুরুষ স্বার্থ পরিপন্থী। শেষোক্ত তথ্যটি বহুগামী/একাধিক স্ত্রী গ্রহণকারী স্বামীদের জন্য হুমকী স্বরূপ। কারণ একাধিক বিবাহের প্রধানতম যুক্তি হচ্ছে বর্তমান স্ত্রী সন্তানধারনে সক্ষম নয়। এই যুক্তিখণ্ডনে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান/স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্রাম বাংলায় বা নিম্ন পেশাজীবী শ্রেণীর স্ত্রী ত্যাগ/একাধিক বিয়ের অন্য একটি অজুহাত হচ্ছে স্ত্রী যৌন রোগে আকান্ত, যা বস্তুতঃ সর্বক্ষেত্রে সত্য নাও হতে পারে। বাংলাদেশী মূল্যবোধে বেড়ে ওঠা একজন মহিলা এই বিষয়টির সত্যতা চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিতে পারেন না, উপরন্তু সনাতনী চিকিৎসা পদ্ধতিতে তা প্রমাণের কোন পথও নেই। আধুনিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এই প্রশ্নটির নিষ্পত্তি করতে পারে। উপরন্তু মহিলাটি রোগাগ্রস্থ হলেও তার চিকিৎসা ব্যবস্থাও এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সম্ভব। উভয় ক্ষেত্রেই একাধিক স্ত্রী গ্রহণের যুক্তি ধোপে টেকেনা।

পুনরায়, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ন্যায় কর্মক্ষেত্রগুলোও তথ্য আদান-প্রদানের একটি মাধ্যমরূপে কাজ করে, এটি স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যও হতে পারে। এই তথ্যটি যদি হয় বন্ধ্যাত্ব মোচন / পরীক্ষণ বা যৌন রোগ পরীক্ষণ বিষয়ক তবে তা স্বভাবতঃই বহুগামী স্বামীদের ক্ষেত্রে কাম্য নয়।

উপরন্ত এই 'কর্মক্ষেত্র' ও 'স্বাস্থ্যকেন্দ্র' পারস্পরিক বিষয়ে মহিলাদের অজ্ঞতা ও সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং পক্ষান্তরে দুটো সংস্থার সাথেই তাদের যোগাযোগ ঘটায়, যেমন-

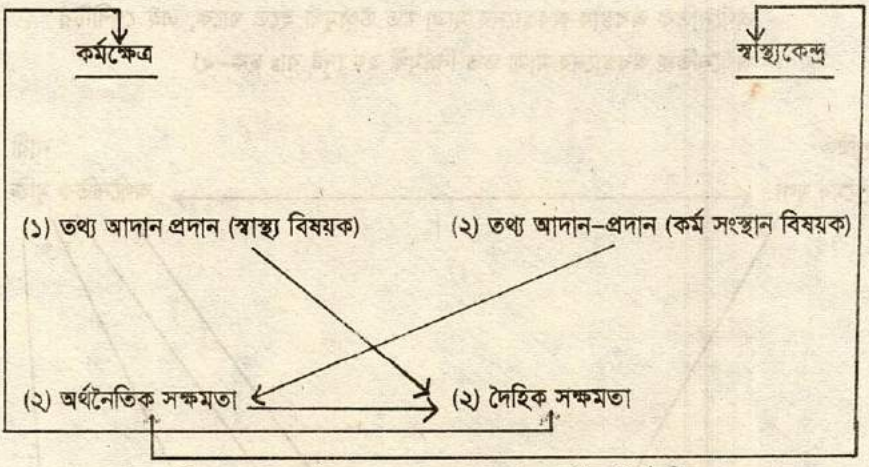

চিত্র নংঃ ১ঃ কর্মক্ষেত্র ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

উপরোক্ত বিষয়গুলি পুরুষদের লিঙ্গভিত্তিক সুবিধার পরিপন্থী হয়ে দেখা দেয়। এবার দৃষ্টি দেয়া যাক এগুলো কিভাবে শ্রেণী স্বার্থের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় সেই প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণে। একজন মহিলা উপার্জনে সক্ষম হলে তা বহুবিধ গ্রাম্য এলিটদের বিভিন্ন ধর্মী স্বার্থে আঘাত হানে, যেমনঃ

প্রথমতঃ একজন শ্রমিকের স্ত্রী উপার্জনক্ষম হলে 'চাহিদা যোগানের' তাত্ত্বিক নিয়মে শ্রমিকটি তার শ্রম বিক্রয়ের অনিবার্য তাগিদে যে কোন মূল্যে শ্রম বিক্রয়ে বাধ্য হয় না, সে তার শ্রমকেও একটি পণ্য রূপে বিবেচনা করতে সক্ষম হয়। কারণ একটি দিন সে শ্রমবিক্রয়ের মধ্য দিয়ে উপার্জন না করতে পারলেও তার ক্ষুধা নিবৃত্তির ব্যবস্থা তার বাড়ীতে আছে যেহেতু তার স্ত্রী উপার্জনক্ষম। এভাবে ক্রমান্বয়ে শ্রমিক শ্রেণীটি মজুরী বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়, যা কর্ম নিয়োগকর্তা, মূলতঃ ভূ-স্বামীর স্বার্থ পরিপন্থী।

দ্বিতীয়তঃ আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণে প্রধানতম বাধাটি হচ্ছে অর্থনৈতিক অক্ষমতা (Nichter, 1989, Sarder and Chen,1981)। স্বামী-স্ত্রী উভয়ই উপার্জনক্ষম হলে তাদের আয়ের একটি অংশ চিকিৎসাখাতে ব্যয় সহজতর হয়। ফলে তারা সনাতনী/আধ্যাত্মিক চিকিৎসার পরিবর্তে আধুনিক চিকিৎসার প্রতি ঝুঁকে পড়ে যা অনিবার্যভাবে একটি সুবিধাভোগী শ্রেণীর (পীর, ফকির, ওঝা, কবিরাজ প্রভৃতি) স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে ওঠে। সাধারণ জনগণের

অর্থনৈতিক অবস্থার অবস্থানের মাত্রা যত উর্ধ্বমুখী হতে থাকে, এই শ্রেণীটির অর্থনৈতিক অবস্থানের মাত্রা তত নিম্নমুখী হয় (দৃষ্ট বাঃ ছক-২)

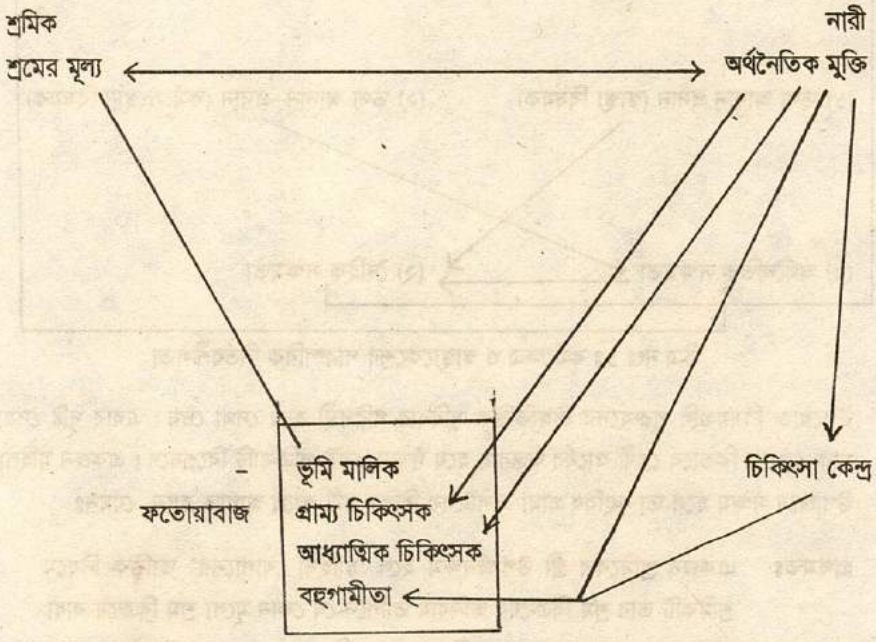

চিত্র নং ২ঃ নারী কর্ম সংস্থান ও ফতোয়াবাজদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

এখানে

– = ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থের পরিপন্থী

+ = ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ সংরক্ষণ।

এই অবস্থারোধে দুটো ইস্যুকে রক্ষা কবচ রূপে ব্যবহার করে তারা সচেষ্ট হয় নিজ অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণে। এই ইস্যুগুলো হল, প্রথমটি 'পর্দাপ্রথা' এবং দ্বিতীয়টি "উন্নয়ন সংস্থাগুলোর বিনাশ সাধন"। মুলতঃ দুটো ইস্যুই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং একে অন্যের পরিপুরক। পর্দা একদিকে তথ্য আদান-প্রদান হতে নারীদের বিরত রাখে, অন্যদিকে সামগ্রীকভাবে দরিদ্র শ্রেণীটির অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ রুদ্ধ করে।

একইভাবে উন্নয়ন সংস্থাগুলো দরিদ্র শ্রেণীটির অর্থনৈতিক উন্নয়ন, তথ্যের যোগান, চেতনাবোধের উন্মেষ ইত্যাদির মাধ্যমে একটি সুবিধাভোগী শ্রেণীর স্বার্থের ক্ষেত্রে যখন হুমকী স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়, এই শ্রেণীটি সচেষ্ট হয় বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এই উন্নয়ন সংস্থাগুলোর বিনাশ সাধনে। প্রথমে তারা নারীদের বাধা দেয় এই সব সংস্থার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে। এটি হলো সরাসরি প্রতিরোধ। পরবর্তী পর্যায়ে প্রচারণার মাধ্যমে এই সমস্ত উন্নয়ন সংস্থা হতে জনগণকে দূরে রাখার প্রচেষ্টা চালানো হয়। এই সংস্থা হতে পারে অর্থনৈতিক কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র। বিভিন্ন গ্রামে দেখা যায় এই মর্মে প্রচারণা চালানো হয় যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীদের খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার প্রাথমিক প্রস্তুতি চলে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো যেহেতু বৈদেশিক সাহায্যের অনুকুল্যে প্রতিষ্ঠিত হয় তাই এখানে প্রদত্ত ঔষুধে, বিশেষতঃ ইঞ্জেকশানে হারাম উপাদান বিদ্যমান ইত্যাদি (খানঃ ১৯৯৪)। সাম্প্রতিক এক রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় UNICEF-এর শেকড় পর্যায়ের প্রতিষেধক দান কর্মসূচীর আওতায় ১৯৯১ সনে ৮০% মাকে প্রতিষেধক দান কার্যক্রমের আওতায় আনা সক্ষম হয়েছিল। একইভাবে বগুড়ায় ৮৫% মা Antenatal Ckeck-up এর আওতায় আসেন। অথচ এক বছর পর সে এলাকায় ফতোয়াবাজদের ব্যাপক তৎপরতার পর এই হার কমে নেমে আসে ৬৫% এ (খানঃ১৯৯৪)। তৃতীয় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রত্যক্ষ প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে সুবিধাবাদী গ্রামীণ এলিট শ্রেণীটি নারী উন্নয়নের সকল সুচকসমূহকে নির্মুলে সচেষ্ট হয় যেমনঃ ব্র্যাক এর স্কুলে অগ্নি সংযোগ, ব্যাপক পর্যায়ে তুঁতের চারা উৎপাটন, জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণকারী/গ্রামীণ ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহীতা পরিবারগুলোকে সমাজচ্যুতকরণ ইত্যাদি (বিচিত্রা, ২২ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা)। এমনও দেখা গেছে যে এই পরিবারগুলোর কোন সদস্যর মৃত্যু হলে তার মৃতদেহ সৎকার বা জানাজা পড়াতে সম্মত হন না কোন ইমাম (ঐ)। এই ক্ষেত্রে গ্রামীণ এলিটদের হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হয় প্রথা প্রতিষ্ঠান, যার জলন্ত উদাহরণ নুরজাহান কেস। নুরজাহান সংশোধিত মুসলিম পরিবারিক আইনের আশ্রয়ে দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে গ্রামীণ এলিটদের প্রতিনিধিত্বে আয়োজিত "শালিস" সভায় তাকে মাটিতে অর্ধেক পুঁতে ১০১টি পাথর ছুড়ে মারা হয়। বিচার শেষে নূরজাহান অপমান ও গ্লানীতে আত্মহত্যা করে। নূরজাহানের ঘটনা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা দূর্ঘটনা নয়। এটি সুপরিকল্পিত এক চক্রান্তের জাল, যার বিস্তৃতি নারীর জীবনযাত্রার প্রত্যেকটি আঙ্গিককে স্পর্শ করে। নূরজাহানের শাস্তি আবহমান কাল ধরে চলে আসা বিবাহের প্রতিষ্ঠিত ধরন (যা মূলতঃ ইসলামিক আইন নয়, বরং ধর্ম বিকৃতকারী ফতোয়াবাজদের সৃষ্ট) কে লঙ্ঘন এর শাস্তি। এই শাস্তি সমগ্র নারী সমাজের সামনে একটি হুলুদ কার্ড, যা অন্য যেকোন প্রতিষ্ঠিত প্রথাকে লঙ্ঘনের পরিণামের ইঙ্গিত বহন করে। এই প্রথা হতে পারে পর্দা, হতে পারে নারীর কাছে প্রত্যাশিত

আচরণমালা তথা বিনয়, আত্ম-ত্যাগ ও আত্ম সমর্পন। একইভাবে এই ঘটনা নারীদের কে নিরুৎসাহিত করে যে কোন পরিবর্তনে। এই পরিবর্তনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে নতুন প্রচলিত নারী নির্যাতন বিরোধী আইন, পর্দালঙ্ঘনে সহায়ক আধুনিক চিকিৎসা বা সন্তান জন্মদানে অক্ষম স্বামীকে পরিত্যাগ করে নারীর পুর্নবিবাহ। এই সমস্ত রকমের সম্ভাবনা হতে নারীকে দূরে রাখার সহজতম পথ হচ্ছে বাইরের জগতের সংগে তার সকল রকমের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাখা। এই যোগাযোগের মাধ্যম- যেমন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, তেমনই তা বাড়ীর অভ্যন্তরে প্রবেশকারী স্বাস্থ্যকর্মী বা পরিবার পরিকল্পনা কর্মীও হতে পারে। এ কারণেই এ সমস্ত কর্মীর সংগে কোন ধরনের সংযোগ রক্ষা গ্রামীণ এলিটদের শালিসে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

উপরে বর্ণিত নিয়মাবলীর মাধ্যমে পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষ কর্তৃক চিকিৎসাকেন্দ্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি বিবৃত করা হয়েছে। এবার আমি দৃষ্টি ফেরাবো নারী জগতের অভ্যন্তরে নারী কর্তৃক আরোপিত স্বাস্থ্যসেবা/চিকিৎসালাভের প্রতিবন্ধকতার দিকে। এক্ষেত্রে আমি মহিলাদের গর্ভ ও প্রসবকালীন এবং প্রসবোত্তর সময়টাকে বেছে নেব।

গর্ভ ও প্রসবোত্তরকালীন ট্যাবুঃ বাংলাদেশী মহিলারা গর্ভ ও প্রসবোত্তর কালে বিশেষ কতগুলো বিষয়ে ট্যাবু মেনে চলেন, যেমনঃ গতিবিধিতে বিধিনিষেধ (Restriction on movement) চিকিৎসাবিধি (Treatment and Remedial Measures) এবং খাদ্য নির্বাচন প্রক্রিয়া (Food Taboo) মূলতঃ গতিবিধিতে বিধিনিষেধ চিকিৎসাবিধির ধারাকে নির্ধারিত করে দেয়।

উল্লেখিত সময়গুলোতে বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত ও ক্ষণে মহিলারা বাড়ীর বাইরে বের হননা, যেমনঃ প্রত্যুষকাল, ভরদুপুর ও সন্ধ্যা। মনে করা হয় গর্ভ ও প্রসবোত্তরকালে মহিলাদের জ্বীন/ভূত দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভবনা খুব বেশী কারণ জ্বীন/ভূত ভ্রুণ ও মায়ের দুধের ভক্ত (Blanchedt 1984)। দিনের এই তিনটি সময় জ্বীন/ভূতের বিচরণকাল, ফলে গর্ভবতী ও সন্তানদানকারী মায়ের তাদের দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশী (Islam, 1985)। এই কারণে অনেক সময় দেখা যায় প্রয়োজন বিশেষে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাওয়ার সময়গুলোতে যদি উপরোক্ত ক্ষণগুলি চলে আসে, মহিলারা তাদের যাত্রা বিরত রাখেন (Khanum, 1994)। এর পাশাপাশি সমাজে আরেকটি ধারণা প্রচলিত আছে যে সন্তান জন্মদান কালে মায়ের মৃত্যু হলে সে শহীদের মর্যাদা পায় (Blanchet, 1994, Islam, 1985)। পক্ষান্তরে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে প্রসবের সময় পুরুষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতির সম্ভাবনা থাকে, যা চিরাচরিত পর্দা প্রথাকে লঙ্ঘন করে। জীবন ও

মৃত্যুর সন্ধিক্ষণরূপে বিবেচিত প্রসবকালে অধিকাংশ মায়েরা ধর্মীয় বিধি লঙ্ঘনের চাইতে "শহীদের মর্যাদা"কে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করেন।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা স্বাস্থ্যকর্মীর সহায়তায় সন্তান জন্মদানে মায়েদের অনীহার আরেকটি কারণ হচ্ছে মনে করা হয় প্রসবের পর যে ইনজেকশন দেয়া হয় তা প্রসবোত্তর স্বাভাবিক রক্তপাতকে বন্ধ করে দেয়। এই দুষিত রক্ত শরীর হতে নির্গত না হবার কারণে পরবর্তীতে মায়েরা বিভিন্ন রকম স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জটিলতায় ভোগেন (Khanum, 1994)। পক্ষান্তরে দেশীয় সনাতনী চিকিৎসা পদ্ধতিতে এই দুষিত রক্তকে সম্পূর্ণরূপে নির্গত করার উদ্দেশ্যে তলপেটে গরম সেঁক দেওয়া হয়। চিকিৎসাবিধির বৈপরীত্যের মত গর্ভ ও প্রসবোত্তরকালে মায়েরা খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রেও কিছু ট্যাবু মেনে চলেন। এই ট্যাবুভুক্ত খাবারের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি (Begum, 1979, Rizvi, 1979)। এই নির্দিষ্ট সময়কালীন খাদ্য বিষয়ক ট্যাবু পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তেও পরিলক্ষিত হয়। যেমন ভারত (Nichter and Nichter, 1983), মালয়শীয়া (Wilson, 1975), তামিলনাড়ু (Ferro Luzzi, 1974)। গর্ভকালে পুষ্টিকর খাবার বর্জনের অন্যতম কারণ রূপে মনে করা হয় এর ফলে গর্ভস্থ সন্তান আকারে বড় হবে এবং প্রসবকালীন জটিলতার সৃষ্টি করবে। এছাড়াও গর্ভকালে মায়ের শরীরের আভ্যন্তরীণ উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। শারিরীক "উষ্ণ–শীতল ভারসাম্যতা" রক্ষার কারণে এ সময় উষ্ণতা বৃদ্ধিকারক খাবার বর্জনীয়। অন্য দিকে প্রসবোত্তরকালে পরিপাক যন্ত্রের দূর্বলতার কারণে গুরুপাক খাবার হতে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। উপরন্তু সন্তান ধারনের ফলে শরীরে যে অতিরিক্ত জলীয় পদার্থ বা রসের সঞ্চার হয়, রসালো খাবার সে রস শুষে নিতে বাধা দেয়। এজন্য এ সময় খাবার নির্বাচন করতে হয় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে। এ সময় গ্রহণযোগ্য খাবারের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে মুড়ি, রুটি, ভর্তা কালিজিরা, ছোট মাছ, গুড়, মধু, ঘি ইত্যাদি।

এই খাবারের পাশাপাশি উপশমকারী ব্যবস্থা রূপে রয়েছে বিভিন্ন গাছের পাতা, শেকড় ও রসের সমন্বয়ে তৈরী নানাবিধ খাবার। মনে করা হয় এ সব ব্যবস্থাদি গর্ভ ও প্রসবোত্তরকালীন যে দৈহিক স্ফীতি ঘটে, তা নিরাময়ে দ্রুত সাহায্য করে। অন্যদিকে আধুনিক চিকিৎসাবিধি অনুযায়ী প্রদত্ত ঔষধ শরীরে অতিরিক্তি পানির সঞ্চার করে এবং স্থূলত্ব বৃদ্ধি করে (Khanum, 1994).

এখানে উল্লেখ্য যে, গর্ভ ও প্রসবোত্তরকালীন এই 'ট্যাবু' সমূহ সমাজের বয়োবৃদ্ধ নারীদের দ্বারা পরিবার ও প্রতিবেশে ক্রমাগত পুনরুৎপাদিত হতে থাকে। বয়োজ্যেষ্ঠ নারীরা বয়োকনিষ্ঠ নারীদের এই সমস্ত ট্যাবু পালনে উৎসাহিত, প্ররোচিত বা ক্ষেত্র বিশেষে বাধ্য করেন। এক্ষেত্রে

সমাজের পুরুষ শ্রেণীটির ভূমিকা একেবারেই নেই। এবার আমি সচেষ্ট হব এই 'ট্যাবু' প্রচলন ও পুনরুৎপাদনের পেছনে ক্রিয়াশীল বিষয়টি বিশ্লেষণে।

গবেষণায় দেখা যায় যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত নগণ্য (Ahmed, 1993, Khan, 1988)। তবে ভিন্নতর 'পরিমণ্ডলের ধারণা অনুযায়ী' সন্তান জন্মদান এবং প্রসবকালীন সময়ে সহায়তাদানের ভূমিকা একমাত্র নারীর। নারী এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে (অর্থাৎ প্রসবকালীন সহায়করূপে) পুরুষের আধিপত্যের বাইরে নিজের মতামত ও আচরণের প্রতিফলন ঘটাতে পারে যে ক্ষেত্রটিতে পুরুষের অনুপ্রবেশের অধিকার নেই। নারীর নিভৃত, অচেতন মনে এই একটি ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্খা চূড়ান্ত হয়ে দেখা দেয়। এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে সে তার দক্ষতা, জ্ঞান ও ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ পায়। এ কারণেই দেখা যায় পরিবারের বয়োজ্যেষ্ট মহিলাটি একা, নয়তো প্রতিবেশী বয়োজ্যেষ্ট মহিলাটির সাহায্যে নিদেন পক্ষে সনাতনী দাইয়ের সহায়তায় বাড়ীতে তার পুত্রবধু / কন্যার সন্তান প্রসবে সচেষ্ট হন, তাকে চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তাদের চরম অনীহা। কারণ চিকিৎসা কেন্দ্রে স্বাস্থ্যকর্মী ও আধুনিক যন্ত্রপাতির সমাবেশে এই বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাটির দক্ষতা ও জ্ঞান অপাংক্তেয় রূপে প্রতিভাত হয়। উপরন্তু "Different Sphere" এর সীমারেখায় তার নিজস্ব পরিমণ্ডল "প্রসব" বিষয়টিও স্থানান্তরিত হয়ে যায় "পুরুষ পরিমণ্ডল" তথা বাইরের জগত 'স্বাস্থ্য কেন্দ্রের' আওতায়। পারিবারিক বা বর্হিজগতের সিদ্ধান্ত আরোপ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের অক্ষমতার কিছুটা বয়োজ্যেষ্ট নারীরা পুরনে সক্ষম হন এই একটি মাত্র ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে। এই ক্ষেত্রটি তাদের আওতা বহির্ভুত হয়ে পড়াটা স্বভাবতঃই তাঁদের কাম্য হতে পারে না।

এই একই ব্যাপার ঘটে গর্ভকালীন ও প্রসবোত্তর খাদ্য নিষিদ্ধকরণ প্রক্রিয়া (Food Taboo)। প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে পরিবার বা প্রতিবেসের বয়োঃজ্যেষ্ঠ মহিলারা সচেষ্ট হন পুত্রবধু, কন্যা বা তৎসম বয়োঃকনিষ্ঠ মহিলাটির উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখতে। "মূল্যবোধ জনিত খাদ্য নিষিদ্ধ প্রক্রিয়া" এর অন্যতম একটি কৌশল। এই সংগে যুক্ত হয় আধুনিক চিকিৎসার পরিবর্তে সনাতনী চিকিৎসা পদ্ধতি, যথা, সেঁক, বিভিন্ন মসলাদির সমন্বয়ে বাড়ীতে তৈরী ওষুধ ইত্যাদি। গর্ভ ও প্রসবকালীন এ সমস্ত প্রথা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশী নারীদের জীবনযাত্রা ও অস্তিত্বে এমনভাবে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে যে, অর্থনৈতিক সক্ষমতা, রাষ্ট্র প্রদত্ত চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা এবং প্রযুক্তি ভিত্তিক সমাজে বসবাস সত্ত্বেও বৃটেনের বাংলাদেশী মহিলারা পর্যন্ত আধুনিক চিকিৎসার পরিবর্তে এই সনাতনী চিকিৎসা পদ্ধতি এবং গর্ভ ও প্রসবকালীন ট্যাবু অবলম্বন করেন (Khanum, 1994)। Caldwell (1977) এর মতে এই সমস্ত মূল্যবোধ ও প্রথা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন রকম লোক গাঁথার মধ্য দিয়ে সমাজে পুনরুৎপাদিত হতে থাকে। সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলারা এতে

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বস্তুতঃ সংসারে নিজের আধিপত্যহীন অস্তিত্বকে কিছুটা সোচ্চার করার আকাঙ্খায় এই মহিলারা বয়োকনিষ্ঠ মহিলাদের আধুনিক চিকিৎসা, স্বাস্থ্যসেবা লাভের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন।

উপসংহারঃ

উন্নয়নে নারী বা নারী উন্নয়নের প্রধানতম সুচকটি হচ্ছে নারীর সম অধিকার সংরক্ষণ। এই দৃষ্টিকোন থেকে নারী নির্যাতনরোধে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ক্রমাগত আইনের পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এই আইনসমূহ প্রকৃতপক্ষে নারীর অধিকার সংরক্ষণে কতটুকু সক্ষম হয়েছে তা বিদগ্ধ জনগণের বিতর্কের বিষয় তবে নারী ও শিশুর স্বাস্থ্য সংরক্ষণে এই আইনের ভূমিকা একেবারেই গৌণ। প্রকৃতপক্ষে আইন প্রনয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবালাভের প্রতিবন্ধকতা সমূহ দুরীকরণ সম্ভবও নয়। কেননা মূল্যবোধ ও প্রথা-প্রতিষ্ঠানের আবরণে এই প্রতিবন্ধকতাসমূহ জনগণের জীবনযাত্রার একটি উপায় হিসাবে স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়ে আসছে। এই উপায়সমূহ ক্ষেত্র বিশেষে রূপান্তরিত হয় স্বীয়স্বার্থ সংরক্ষণের কৌশলরূপে। জীবন যাপনের অন্যান্য উপায়-উপকরণের ক্ষেত্রে যেমন চলে পরিমার্জন, পরিবর্তন ও গ্রহণ বর্জনের এক ভারসাম্যতা, তেমনই ভারসাম্যতা সৃষ্টি করা যেতে পারে মূল্যবোধ ও প্রথা প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও। এর যা কিছু শুভ, যা কিছু শাশ্বত তা আমাদের জীবনকে আরো ঐশ্বর্যময় করুক, সেই সংগে পরিবর্তিত হোক গ্রাম্য এলিট, ফতোয়াবাজ বা ক্ষমতা অন্বেষী পরিবার প্রধান মহিলাটি প্রদত্ত/পুনরুৎপাদিত প্রথা প্রতিষ্ঠানসমূহ। এই পরিবর্তন ও পরিমার্জনের ক্ষেত্রেও সমাজের পুরুষদের ভূমিকাই মূলতঃ মৌল। কেননা গৃহের অভ্যন্তরে নারী কর্তৃক সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতাসমূহ ও প্রকৃতপক্ষে নারী পুরুষের অসম ক্ষমতা বন্টনের একটি প্রতিফল মাত্র। মূল্যবোধ ও প্রথা প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন যেভাবে নারী পুরুষের সমঅধিকার সৃষ্টি করতে পারে, একইভাবে নারী পুরুষের সমঅধিকারও নিশ্চিত করতে পারে সুস্থ্য মূল্যবোধ ও প্রথা প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিকতা।

টীকাঃ

এলিটঃ এলিট বলতে সাধারণ অর্থে সেই সমস্ত ব্যক্তিবর্গকে বুঝায় যারা সমাজে প্রধান প্রধান পদগুলি নিজেদের অধিকারে রাখে এবং নিজ অবস্থানগত কারণে ক্ষমতা, সম্পদ ও মর্যাদা ভোগের সুবিধা পায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্য দেখুন Bottomore (1964); Dahl (1961); Mills (1959); Pareto (1935); Rose (1967); Karim (1991).

ট্যাবুঃ সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় ট্যাবু বলতে বুঝায় নিষিদ্ধকরণ। বর্তমান নিবন্ধে খাদ্য ও গতিবিধি বিষয়ক নিষিদ্ধকরণ বুঝানো হয়েছে। এ সম্পর্কিত ট্যাবুর জন্য দেখুন Begum (1979); Khanum (1994); Nichter and Nichter (1983). Rizvi (1979).

গ্রন্থপঞ্জী

Ahmed, A. (1991) *Women and Fertility in Bangladesh*, Columbia: Sage Publ.

Begum, R. (1979) Study of Food Habits, Food Practices and Taboos in Bangladesh: the Implication in Nutrition Education, *Bangladesh Medical Resarch Council Bulletin*, 5 (1): 1-33.

Blanchet, (1984) *Woman, Pollution and Marginality, Meaning and Rituals of Birth in Rural Bangladesh*, Dhaka: Dhaka Univ. Press.

Bottomore, T. (1964) *Elites and Society*, Harmondsworth: Penguin Books.

Cain, M. (1981) "Risk and Insurance: Perspectives on Fertility and Agrarian Change in India and Bangladesh," *Population Review*, 7 (3): 435-474.

Caldwell, J. C. (1983) "Direct Economic Costs and Benefits of Children in Bulatao," R. A. and Lee, R. D (eds), (1983), *Determinants of Fertility in Developing Countries*, New York: Academic Press.

..... (1979) "Education as an Factor in Mortality Declines: An Examination of Nigerian Data," *Population Studies*, 33 (3): 395-413. Dahl, R (1961) Who Governs New Haven; Yale Univ. Press.

Ferro-Luzzi, G. E. (1979) "Food Avoidences During the Puerperium and Lactationin Tamilnad," *Ecology of Food and Nutrition*, 3:7-15.

Hoodfar, H. (1984) *Hygienic and Health Care Practices in a Poor Neighbourhood of Cairo, West Asia and North Africa Regional Paper.*

ICCDR, B (1985) *Demographic Surveillance System*, Matlab, 14 (64).

Islam, M. (1985) *Woman, Health and Culture*, Dhaka: Woman for Women.

Jeffery, P., Jeffery, R. and Lyon, A. (1989) *Labour Pains and Labour Power: Women and Child Bearing in India:* London: Zed Books.

Kabeer, N. (1985) "Do Women Gain from High Fertility" in Afshar, H. (ed) (1985) *Women, Work and Ideology in the Third World*, London: Tavistock Publication.

Khalilullah, k. (1985) "Health Services for women in Bangladesh" in *Situation of women in Bangladesh*, Dhaka: Ministry of Social Welfare and women's Affairs, GOB.

Khan, S. (1988) *Fifty Percent Women in Development and Policy Making in Bangladesh*, Dhaka: Dhaka Univ. Press.

Khanum, S. M. (1994) "We Just Buy Illness in Exchange for Hunger" *Experiences of Health Care, Health and Illness Among Bangladesh Women in England*, Unpublished Ph. D. thesis Submitted to the University of Keele, UK.

Kotalova, J. (1993) *Belonging to Others: Cultural Construction of Womenhood in a Village in Bangladesh*, Sweden Uppasala University.

Mannan, M. A. (1988) *Preference for Son, Destre of Additional Children and Contraceptive Use, Bangladesh Develompent Studies*, 16(3): 31-57.

Mills, C. Wright (1959) *The Power Elite*, New York, Oxford Univ. Press.

Nichter, M. and Nichter, M. (1983) "The Ethnophysiology and Folk Dietetics of Pregnancy" *Human Organization*, 42(3): 235-246.

Pareto, V(1935) *The Mind and Society* (4 vols.) London; Jonathan Cape (English translation of Trattato di Sociologia Generale.)

Rose, A. M. (1967) *The Power Structure: Political Process in American Society*, New York; Oxford Univ Press.

Rizvi, N. (1979) *Rural and Urban Food Behaviour in Bangladesh: An Anthropological Perspective to the Problem of Malnutrition*, Unpublished Ph. D thesis, Los Angeles: University of California.

Sarder, A. M. and Chen, L. C (1981) *Are There Barefoot Doctors in Bangladesh: A Survey of Non Government Rural Health Practitioners*, Scientific Report No 42, Dhaka: ICDDR, B.

Schainberg, A. and Reed, D. (1974) Risk, *Uncertainty and Family Formation. The Social Concept of Poverty Group, Population Studies*, 28(3): 513-533.

UNICEF (1993) *The State of the World's Children*, Oxford

-------- (1994) *The Progress of Nations:* New York.

মিজানুর রহমান খান (১৯৯৪) "ফতোয়াবাজ", *বিচিত্রা*, ২২বর্ষ ৪৫ সংখ্যা

এ, এইচ, এম জেহাদুল করিম (১৯৯১) "বাংলাদেশের গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো ও নেতৃত্বের ধরন" *সমাজ নিরীক্ষণ*, সংখ্যা ৩৯, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা।

মূল্যবান পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রবন্ধকার সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ডঃ আব্দুল কাদির ভূঁইয়ার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষায় এবং সামাজিক গবেষণায় মাঠ পর্যায়ের তথ্যসংগ্রহে সমস্যাঃ একটি পর্যালোচনা

মোঃ ছাদেকুল আরেফিন

১.০ ভূমিকাঃ

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করার গৌরব অর্জন করলেও এ পর্যন্ত আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার বা উন্নয়নের স্বাক্ষর রাখতে পারিনি। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যে কোন দেশে সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নে সে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার এবং আধুনিক ও বাস্তবসম্মত প্রযুক্তি প্রয়োগের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সুতরাং শিক্ষাকে সর্বব্যাপী–সার্বজনীন না করে, সকল মানুষকে শিক্ষিত না করে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক না করে, কোন জাতি অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর হতে পারে না।[১] কিন্তু বর্তমানে সমগ্র বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় যে বিশৃংখলা ও সংকটময় অবস্থা বিরাজ করছে সেটি মোটেও কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বরং সমগ্র দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতারই প্রতিফলন। এই পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের আর্থ–সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু বর্তমান ও অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায়, বাংলাদেশের শিক্ষার অবস্থা কোন সুষ্ঠু ও ধারাবাহিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠেনি। শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন গঠিত হলেও তার সার্বজনীন গ্রাহ্যতা ছিল না। যেমনঃ ১৯৫৭ সালের পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সংক্রান্ত কমিশন, ১৯৫৯ সালের শরীফ কমিশন, ১৯৬৪ সালের হামদুর রহমান কমিশন, ১৯৬৯ সালের নুরখান শিক্ষা কমিশন, ১৯৭২ সালের কুদরত–ই–খুদা শিক্ষা কমিশন। এছাড়া ১৯৭৮ সালের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর উদ্যোগে একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়। ১৯৮৩ সালের মজিদ খানের শিক্ষা কমিশন এবং সর্বশেষে ১৯৮৭ সালে ডঃ মফিজউদ্দিনের শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। উল্লেখিত শিক্ষা কমিশনগুলোর রিপোর্টে বিভিন্নভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা পদক্ষেপ নেয়ার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এদেশের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তা কতখানি বাস্তবসম্মত ও বিজ্ঞানভিত্তিক ছিল তা বিতর্কের অবকাশ রাখে। কেননা শুধুমাত্র ১৯৭২ সালের কুদরত–ই–খুদা শিক্ষা কমিশন ব্যতীত অন্যকোন শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন সর্বজনগ্রাহ্যতা লাভ করেনি বরং উক্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের প্রতিবাদে ব্যাপক আন্দোলনের সুত্রপাত হয়। যদিও কুদরত–ই–খুদা শিক্ষা কমিশনে

বিজ্ঞানভিত্তিক ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয় তথাপি ঐ কমিশনের সুপারিশগুলো নানা কারণে ধামাচাপা দিয়ে পরবর্তীতে আবো নানা শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়।

মূলত সঠিক ও বাস্তবসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের ব্যাপারে উল্লিখিত এরকম সিদ্ধান্তহীনতা ও পরিকল্পনাহীন অবস্থার কারণে বাংলাদেশে শিক্ষার অগ্রগতি এখনও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। এছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দের অপর্যাপ্ততা, বাজটের সীমিতকরণ বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য। বলাবাহুল্য, এক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা তথা গবেষণার বিষয়টি নিতান্তই অনুল্লেখ্য ও গুরুত্বহীন অবস্থায় বিবেচিত হচ্ছে।

২.০ বাংলাদেশে শিক্ষার অবস্থাঃ

শিক্ষা ও স্বাক্ষরতা প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। মানবজাতির মনুষ্যত্বের বিকাশে, ব্যক্তিসত্ত্বা বিকাশে ও সৃজনশীল চিন্তাশক্তি বৃদ্ধিতে শিক্ষার প্রভাব অনস্বীকার্য। তাই Universal Declaration of Human Rights- এ শিক্ষাকে মানুষের একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তথাপি লক্ষ্য করা যায়, বাংলাদেশের শিক্ষার মান এখনও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়নি, যদিও শিক্ষাকে সার্বজনীন করার লক্ষ্যে ব্যাপক কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বর্তমানে দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী অর্থাৎ প্রায় সোয়া ১১ কোটি মানুষকে রাতারাতি শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব নয়। কেননা অতীতের তথ্যের দিকে তাকালে দেখা যায় শিক্ষার হার কম-বেশী একই রয়েছে কিন্তু পাশাপাশি জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি থেমে নেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে একদিকে ব্যাপকহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে শিক্ষার হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি অনড় অবস্থা বিরাজ করছে। অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির অধিকাংশ সংখ্যকই থাকছে নিরক্ষর। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ের আদমশুমারীর প্রেক্ষিতে সারণীর মাধ্যমে শিক্ষার হার উল্লেখ করা হলঃ

সারণী-১ঃ আদমশুমারীর বছরে বাংলাদেশে শিক্ষিতের হারঃ

আদমশুমারীর বছর	উভয়লিঙ্গ	পুরুষ	মহিলা
১৯৬১	১৭.০	২৬.০	৮.৬
১৯৭৪	২০.২	২৭.৬	১২.২
১৯৮১	১৯.৭	২৫.৮	১৩.২
* ১৯৯১	৩২.৪	৩৮.৯	২৫.৫

Source: Bangladesh Population Census 1981, (Analytical Findings and National Tables), Bangladesh Bureau of Statistics, August, 1984, p.80.

* ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী দৈনিক বাংলা, ২৪শে ডিসেম্বর, পৃঃ ৩-এর প্রতিবেদন অনুসারে (এখানে Adult Luteracy rate বুঝানো হয়েছে)।

সুতরাং উপরোক্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, এদেশের দীর্ঘ সময়ের পথ পরিক্রমায় শিক্ষা বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্য নয়। এছাড়া পুরুষ ও মহিলার শিক্ষার ক্ষেত্রেও শিক্ষার হারের তারতম্য বিরাজ করছে (যা উপরোক্ত সারণীতে লক্ষ্যণীয়)। আবার গ্রাম ও শহরের ক্ষেত্রেও শিক্ষার হারের তারতম্য রয়েছে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারীর তথ্যানুযায়ী দেখা যায়, গ্রাম এলাকায় শিক্ষার হার শতকরা ২৭.৯%, অপর দিকে পৌর এলাকায় ৫৭.০% আবার অন্যান্য শহর এলাকায় ৪০.৪%। পাশাপাশি এ শুমারী থেকে আর একটি তথ্যে দেখা যায় দেশে ৫ হতে ২৪ বৎসর বয়সের লোকসংখ্যার মধ্যে ৩৬.৫% বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে পুরুষের উপস্থিতির হার ৪০.৭% এবং মহিলাদের ৩২.২%।[২] প্রাসঙ্গিকভাবে উচ্চশিক্ষার বিষয়টি অবতারণা করা প্রয়োজন। উচ্চশিক্ষার মান হিসেবে যদি আমরা স্নাতক ও তদুর্দ্ধ ডিগ্রীধারীদের ধরি তাহলে দেখা যায় দেশে উচ্চশিক্ষার হার খুবই নগন্য। অর্থাৎ ১ ভাগও নয়। ১৯৯১ সালের শুমারী অনুযায়ী দেশে ডিগ্রী এবং তদুর্দ্ধ শ্রেণী পাস পুরুষের সংখ্যা ৭ লক্ষ ২ হাজার ৫৪ জন অর্থাৎ ০.৭৯ ভাগ এবং মহিলার সংখ্যা ১ লক্ষ ২৫ হাজার ৮ শত ১৭ জন অর্থাৎ ০.১৪ ভাগ।[৩] সুতরাং শিক্ষার সত্যিকারের বিকাশ ঘটাতে চাইলে আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষিতের হার বৃদ্ধিসহ আরও উপযোগী গবেষণার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

৩.০ সামাজিক গবেষণাঃ

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে সামাজিক গবেষণা অত্যাধিক গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের বিরাজমান নানা সমস্যাসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে উন্নয়নধর্মী বিষয়গুলি সামাজিক গবেষণায় প্রাধান্য পাচ্ছে এবং এসব নিয়ে গবেষণা করার জন্য এগিয়ে এসেছেন বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসহ অনেক সামাজিক গবেষকবৃন্দ যেটা বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে আশাব্যঞ্জক। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় সামাজিক গবেষণার বিষয়টি উচ্চশিক্ষার সাথে সম্পর্কিত। আর সে প্রেক্ষিতে দেশের বর্তমান উচ্চ শিক্ষার অবস্থা ও গবেষণার সুযোগের বিষয়টি পুঙ্খাণুপুঙ্খ বিবেচনার দাবী রাখে। এ প্রবন্ধে উচ্চ শিক্ষা বলতে এম, ফিল, পি এইচ-ডি ডিগ্রী অর্জন ও গবেষণা বলতে মৌলিক বিষয়ে গবেষণা কর্মকে বোঝানো হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে উচ্চশিক্ষার এই মানদণ্ড ধরে নিয়ে আলোচনা করলে সামাজিক গবেষণার বিষয়টি অবধারিতভাবে এসে যায়। এখন সামাজিক গবেষণার ধারণা সম্পর্কে এ প্রবন্ধের প্রেক্ষিতে বিষয়টি পরিষ্কার করে নেয়া প্রয়োজন। আমরা জানি, সামাজিক বিজ্ঞানের মুল বিষয়বস্তুই হচ্ছে সমাজ। আর তাই সমাজ নিয়ে বা সমাজের যে কোন বিষয় নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার গুরুত্ব অপরিসীম। এদিকে লক্ষ্য রেখে সমাজের কোন বিষয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বিজ্ঞানসম্মত করতে কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। আসলে বিজ্ঞান শব্দটির সাথে গবেষণা পদ্ধতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। গবেষণা পদ্ধতি বাদ দিলে বিজ্ঞান ও কল্পনার পার্থক্য থাকে সামান্য।[৪] সমাজবিজ্ঞানের মুল মনোযোগ বিন্দু মানুষ এবং প্রকৃতির আন্তঃক্রীড়া নয়। বরং

এই আন্তঃক্রীড়া ঘটাতে গিয়ে মানুষে মানুষে শুরু থেকে যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় সেটাই সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়।[৫] কিন্তু এই মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কের নানা দিক রয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখাগুলি এই বিভিন্ন দিকের এক একটি নিজের অধ্যয়নের বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছে। তবে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পরিবর্তিত সময়ে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষে মানুষে সম্পর্কের নতুন থেকে নতুনতর দিক উন্মোচিত হয়েছে এবং সে সাথে সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা দিক ও শাখা-প্রশাখা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর তাই বাংলাদেশে সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণায় একাডেমিক কার্যক্রমের মূল্যায়ন উচ্চতর শিক্ষার সাথে অনিবার্যভাবে সম্পৃক্ত। আর এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই নির্ধারণ করা সম্ভব কি ধরনের জ্ঞান সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এবং কিভাবে তা সংগঠিত করা যায়।[৬]

সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্ঞান অনুসন্ধানের বিষয়টি সুস্পষ্ট করার জন্য সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রগুলিকে সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপিত করা দরকার। কেননা কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় যোগ হয়েছে। আজ "সামাজিক বিজ্ঞানের" অধীনে পৃথক পৃথক জ্ঞান-কাণ্ডের সংখ্যা কমপক্ষে ৭টি, যথাঃ অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, সামাজিক মনস্তত্ব, সামাজিক ভূগোল এবং সামাজিক পরিসংখ্যান।[৭] অতএব সামাজিক বিজ্ঞানের উপরোক্ত শাখাগুলি যে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত সেটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাই সামাজিক বিজ্ঞানের শাখাগুলির পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও আলোচনা ছাড়া সার্বিক সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়টি পরিপূর্ণতা লাভ করে না। তবে এ কথা ঠিক যে সামাজিক বিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য বিজ্ঞানের পার্থক্য বিদ্যমান। কেননা একজন সমাজবিজ্ঞানী শুধু সমাজের বিভিন্ন বিষয় নিয়েই তার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান করেন। অন্যদিকে অন্যান্য বিজ্ঞানীরা তাদের স্ব-স্ব বিষয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধান চালিয়ে থাকেন। আর সমাজবিজ্ঞানীর এ ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান তথা সার্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে তাকে আশ্রয় নিতে হয় সামাজিক গবেষণা পদ্ধতির উপর। আমরা জানি, সামাজিক গবেষণাকে দু'টি ধারায় বিভক্ত করা হয়েছে। (১) মৌলিক (২) ফলিত। আর এই মৌলিক ও ফলিত গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যথাক্রমে কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন এবং কোন সমস্যার সমাধানে গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ। আবার, সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নানারকম গবেষণা হয়ে থাকে। যেমন- (ক) পরোক্ষ তথ্যনির্ভর গবেষণা (খ) প্রত্যক্ষ তথ্যনির্ভর গবেষণা।[৮] আর এই সামাজিক গবেষণায় সুনির্দিষ্ট ও উপযোগী গবেষণা পদ্ধতি নির্বাচন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন রকম গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহৃত হতে পারে। এক্ষেত্রে গবেষণা পদ্ধতির ভিন্নতা রয়েছে যেমনঃ সমাজের বড় কোন বিষয় সম্পর্কে গবেষণা করতে গেলে নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষণা সহজসাধ্য হয় তেমনিভাবে ছোট কোন বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যম

(নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। উপযোগী হয়। আবার কোন কোন লেখক সামাজিক গবেষণার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জরীপ পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।[৯] এমনিভাবে, সামাজিক গবেষণায় গবেষণা পদ্ধতির বিভিন্ন শ্রেণীভেদ রয়েছে। তবে সামাজিক গবেষণায় মূলত গবেষণা পদ্ধতির দু'টি সুস্পষ্ট ভাগ রয়েছে। একটি হলঃ Historical Method বা ঐতিহাসিক পদ্ধতি। অপরটি হলঃ Imperical Method বা প্রায়োগিক পদ্ধতি। ঐতিহাসিক পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষণা তথ্য সংগৃহীত হয় মূলত বিভিন্ন প্রকাশিত-অপ্রকাশিত পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থ, দলিল-দস্তাবেজ, বিভিন্ন প্রতিবেদন, নথিসহ প্রয়োজনীয় তথ্যের লিখিত বা অলিখিত উৎস থেকে। ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সামাজিক গবেষকগণ তাদের গবেষণার নতুনতর তত্ত্ব বা তথ্য উপস্থাপনের চেষ্টা করেন। অপরদিকে, প্রায়োগিক পদ্ধতির মাধ্যমে সামাজিক গবেষকগণ যে তথ্য সংগ্রহ করেন সেগুলি সংগৃহীত হয় সরাসরি মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে যা বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সামাজিক গবেষকগণ নিজে সরাসরি বা অপরের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট প্রশ্নমালার ভিত্তিতে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ ও কেসস্টাডির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত তথ্য নানা উপায়ে লিপিবদ্ধ করেন। এক্ষেত্রে দৈনিক রোজনামচা, প্রয়োজন বিশেষে অডিও-ভিডিও রেকর্ডিংসহ বিভিন্ন কৌশলাদি অবলম্বন করা হয়। আর এভাবেই সামাজিক গবেষকবৃন্দ Imperical method তথা প্রায়োগিক পদ্ধতির মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে গৃহীত তথ্য সংগ্রহ করেন (যেটাকে ক্ষেত্র বিশেষে Raw data বলা হয়)। তাদের গবেষণার কাংখিত সমস্যা চিহ্নিত করেন এবং প্রাপ্ত তথ্য বা উপাত্তের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা প্রতিবেদন তৈরী করেন।

বাংলাদেশের বাস্তব পরিস্থিতিতে গবেষণা ক্ষেত্রে সামাজিক গবেষকবৃন্দকে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এগুলো সুনির্দিষ্ট আকারে নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

৪.০ মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে সমস্যাঃ

৪.১ সামাজিক গবেষণায় মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে যেহেতু সমাজে বসবাসকারী মানুষের উপরই ব্যাপকভাবে নির্ভর করতে হয় সেহেতু বসবাসকারী ঐ সমস্ত জনসাধারণের যদি গবেষণা সম্পর্কে কোন ধারণা থাকে কিংবা সামাজিক গবেষণার উপকারিতা প্রয়োজনীয়তাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্যক জ্ঞান না থাকে- সর্বোপরি যে কোন তথ্য প্রদানে (যা কোন ক্ষতিকর নয়, একাডেমিক কাজেই যা ব্যবহৃত হয়) সহযোগিতার মনোভাব না থাকে সেক্ষেত্রে গবেষণা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। আর এই অবস্থার কারণ হল দেশের অধিকাংশ মানুষের যথাযথ ও প্রয়োজনীয় শিক্ষার অভাব।

৪.২ দেশে বিরাজমান ব্যাপক অংশের নিরক্ষরতা ও অশিক্ষা ছাড়াও যে অংশ শিক্ষিত বলে ধরা হয় সেই শিক্ষিত অংশ সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানেও তেমন আগ্রহ দেখায় না।

সুতরাং শুধু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত হলেই যে সমাজের জনসাধারণ তথ্য প্রদানে আগ্রহ দেখাবে এটা বলা যায় না। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গবেষককে সংশ্লিষ্ট সমাজের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে তথ্য প্রদানের মানসিকতা তৈরি করে নিতে হয়। তাছাড়া নিরক্ষরতার কারণে তথ্য সংগ্রহকারীকে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে বারংবার বোঝাতে হয় – যা গবেষণার ক্ষেত্রে সময়সাপেক্ষ ও কষ্ট সাধ্য ব্যাপার।

৪.৩ অশিক্ষার সাথে সম্পর্কিত আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল– সমাজের জনগণের মধ্যে বিরাজমান ও প্রতিষ্ঠিত কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস। অশিক্ষা ও অল্পশিক্ষার কারণে মানুষ একদিকে যেমন কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে থাকে, অন্যদিকে অন্ধ বিশ্বাসের কারণে শিক্ষিত হয়েও অনেক মানুষ গবেষণার জন্য তথ্য প্রদানে সহযোগিতার মনোভাব দেখায় না। তাই আমাদের দেশের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাস সামাজিক গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য সংগ্রহে একটি বড় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত।

৪.৪ প্রচলিত সমাজে বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা সুদৃঢ় না হবার ফলে তারা বিভিন্ন অনিশ্চয়তার সম্মুখীন। আর এই অনিশ্চয়তাকে সামনে রেখে গবেষণার জন্য তথ্য প্রদানকারী মানুষগুলো তথ্য সংগ্রহকারীকে নানারকম অবলম্বন ভাবতে চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে তারা সরকারী কোন কর্মী যেমনঃ রিলিফদাতা বা অন্যকোন সাহায্যদাতা কর্মী, বিভিন্ন এনজিও'র উন্নয়নকর্মী ইত্যাদি মনে করে। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় সঠিক তথ্য প্রদানের চেয়ে তাদের অভাব অভিযোগের কথা বলতেই তারা বেশি মনোযোগী হয়ে ওঠে। এ পর্যায়ে তাদের আয় ব্যয়ের তথ্য জানতে চাইলে তথ্য প্রদানকারীদের আয় কমিয়ে বলার এবং ব্যয় বাড়িয়ে বলার প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়। যা সঠিক তথ্য সংগ্রহ ও যথাযথ গবেষণার জন্য বড় একটি সমস্যা রূপে চিহ্নিত।

৪.৫ দেশের বিরাজমান সমাজ ব্যবস্থায় ও নানা ধর্মীয় অপব্যাখ্যার কারণে অনেক রক্ষণশীল ও গোঁড়া মানসিকতার লোক সমাজে রয়েছে। ফলে সামাজিক গবেষণার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহে নানা সমস্যার উদ্ভব হয়। যেমন রক্ষণশীল মনোভাবের কারণে তারা সঠিক সম্পদের তথ্য, জমিজমার হিসাব সংক্রান্ত তথ্য ও রোগব্যাধির তথ্যসহ অন্যান্য গোপনীয় তথ্য দিতে কুণ্ঠাবোধ ও অনীহা দেখায়। বিশেষ করে সম্পদের পরিমাণ বা জমিজমার হিসাব সংক্রান্ত তথ্যে কম করে বলার প্রবণতাও রয়েছে। ফলে গবেষণার জন্য যথাযথ তথ্য সংগ্রহ বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

৪.৬ মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আর একটি অন্যতম সমস্যা হল লিঙ্গভেদের সমস্যা। যেহেতু সমাজের প্রায় অর্ধেকই নারী সেহেতু কোন পুরুষ গবেষক যদি মহিলাদের কাছে কিংবা কোন মহিলা গবেষিকা যদি পুরুষদের কাছে তথ্য সংগ্রহ করতে যায় তখন নানা সমস্যা দেখা

দেয়। এক্ষেত্রে সমাজে বিরাজমান পর্দাপ্রথা, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সামাজিক বিধিনিষেধ প্রভৃতি বিষয়গুলি অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

৪.৭ আরও একটি বিশেষ সমস্যা হল- মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে, গবেষক যে এলাকায় তথ্য সংগ্রহ করেন সে এলাকায় সাধারণ মানুষের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি। কেননা গবেষক বা তথ্য সংগ্রহকারী যে এলাকায় বা সমাজে তথ্য সংগ্রহের জন্য যান সে এলাকাটিতে তিনি সম্পূর্ণরূপে বহিরাগত। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্থানীয় অধিবাসী গবেষককে বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে পারেন। এক্ষেত্রে সন্দেহ, কৌতুহলতাসহ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী উল্লেখ করা যায়। ফলে তথ্য সংগ্রহকারীর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দেয়।

৪.৮ গবেষক বা তথ্য সংগ্রহকারী এবং তথ্য প্রদানকারীর মধ্যে ভাষাগত সমস্যাও একটি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। কেননা তথ্য প্রদানকারীর ভাষার সাথে তথ্য সংগ্রহকারীর ভাষার পার্থক্য থাকলে উভয়ের কাছেই বিষয়টি কষ্টসাধ্য হয়। ফলে সংগৃহীত উপাত্ত সঠিক ও সুস্পষ্ট হওয়া জটিল হয়ে পড়ে।

৪.৯ প্রাসঙ্গিকভাবে আরও কিছু সমস্যার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেগুলো গবেষক বা তথ্য সংগ্রহকারী মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকালে প্রায়শঃই সম্মুখীন হয়ে থাকেন। তাহলো- গবেষক বা তথ্য সংগ্রহকারী তথ্য সংগ্রহ এলাকায় থাকা খাওয়া, যাতায়াত, আচার-আচরণসহ সংশ্লিষ্ট নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কেননা গবেষণার প্রয়োজনে ও সঠিক তথ্যের সংগ্রহের জন্য এমন সব অঞ্চলে যেতে হয় যেখানে গবেষক বা তথ্য সংগ্রহকারী অপরিচিত, কিংবা পরিবার-পরিজন বা আত্মীয়স্বজনবিহীন দূর-দূরান্তের কোন অঞ্চলও হতে পারে। আবার প্রয়োজনবোধে এমনও অঞ্চলে যেতে হতে পারে যেখানে গ্রামের মাটির কাঁচারাস্তা, পায়ে হেঁটে পথচলা ছাড়া কোন উপায় নেই। ফলে তথ্য সংগ্রহ এলাকায় থাকা-খাওয়া, যাতায়াত যেমন সমস্যার সৃষ্টি করে তেমনি অপরিচিত স্থান বিধায় আচার আচারণগত সমস্যার সম্মুখীনও হয়ে থাকেন।

৫.০ সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায়ঃ

সামাজিক গবেষণায় মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যাগুলো দূর করা না গেলে যথাযথ ও সঠিক গবেষণা করা বেশ কষ্টকর হয়ে উঠে। সুতরাং উপরোক্ত সমস্যাগুলো দূর করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। এই ব্যবস্থাগুলো বিভিন্ন উপায়ে নেয়া যেতে পারেঃ

৫.১ বাংলাদেশের সিংহভাগ মানুষের নিরক্ষরতা, অশিক্ষা দূর করে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করা। সেই সঙ্গে গবেষণার মত প্রয়োজনীয় বিষয়ে সহযোগিতার মনোভাব তৈরী ও যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা করা। মূলতঃ উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারলে শুধু সামাজিক গবেষণার তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রেই নয় বরং সার্বিক উন্নয়নেও সহায়ক হবে।

৫.২ জনসাধারণের (শিক্ষিত বা অশিক্ষিত) মধ্যে সমাজে প্রচলিত অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার দূর করে সমাজ তথা সার্বিক উন্নয়ন কাজে যে কোন রকম সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলার ব্যবস্থা নেয়া হলেও আলোচ্য সমস্যাগুলি নিরসনের পথ প্রশস্ত হবে। অর্থাৎ যথাযথ মনোভাব গড়ে তোলা বা উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়াও উল্লিখিত সমস্যাগুলো নিরসনের একটি উপায় হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

৫.৩ মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে উপরোক্ত সমস্যাগুলো সমাধানে বিশেষভাবে যে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় আনতে হবে তা হলো গবেষণা পরিচালনা ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা, অর্থের যোগান, লোকবল ও যথাযথ বাজেট, পরিকল্পনাসহ সঠিক ও নিয়মিত সহযোগিতার বিষয়টি নিশ্চিতকরণ। এই ব্যবস্থাগুলি নিশ্চিত করতে পারলে তথ্য সংগ্রহের সমস্যা অনেকাংশে দূর হবে বলে আশা করা যায়।

৫.৪ তথ্য সংগ্রহ অঞ্চলের স্থানীয় প্রশাসন ও প্রতিষ্ঠান যেমন থানা, ইউনিয়ন পরিষদ, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সমাজকল্যানমূলক প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রের সহযোগিতা বা সহযোগিতামূলক মনোভাব তৈরী বা নিশ্চিত করতে হবে এবং এই বিষয়ে উদ্যোগটি মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের সমস্যা নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

৫.৫ এছাড়া লিঙ্গভেদের কারণে ও ভাষাগত কারণে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে সমস্যা দেখা দেয় সেক্ষেত্রে এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য গবেষক বা তথ্য সংগ্রহকারীকে বেশী অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। যেমন লিঙ্গভেদের কারণে পুরুষ বা মহিলা তথ্য সংগ্রহকারীকে উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন কৌশলে সহজ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এবং তথ্য প্রদানকারীকে বোঝাতে সক্ষম হতে হবে যে এটা কোন ক্ষতিকর কিছু তো নয়ই বরং উন্নয়নমূলক কাজের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবে। আবার ভাষাগত সমস্যার ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহকারীকে অবশ্যই ধৈর্য্যশীল হতে হবে। তবে প্রথমেই যা করতে হবে তা হলো তথ্য প্রদানকারীর ভাষা অপরিচিত বা অস্পষ্ট হলে সে ভাষার সঙ্গে পরিচিত ও স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে হবে এবং তথ্য প্রদানকারীর কথা একেবারে বুঝতে না পারলে দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার প্রশ্ন করেও তথ্য জেনে নিতে হবে। এ পর্যায়ে তথ্য প্রদানকারী অনেকাংশে ধৈর্য হারালেও গবেষক বা তথ্য সংগ্রহকারীকে কোনভাবেই ধৈর্য হারানো চলবে না।

৫.৬ গবেষণা এলাকা বা তথ্য সংগ্রহ এলাকা অপরিচিত হলে সেখানে তথ্য সংগ্রহকারীর গ্রহণযোগ্যতার জন্য বা তথ্য প্রদানকারী জনসাধারণের সাথে সহজ সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনবোধে স্থানীয় প্রশাসন, ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, ইমাম ইত্যাদির সাহায্য নেয়া যেতে পারে। এদের মাধ্যমে গবেষণা এলাকার জনসাধারণ বা তথ্য প্রদানকারীদের সাথে

সহজ সম্পর্ক স্থাপন কিংবা তথ্য প্রদানের জন্য ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রাসঙ্গিকভাবে তথ্য সংগ্রহ এলাকায় থাকা-খাওয়া, যাতায়াত এমনকি আচার আচরণগত সমস্যার ক্ষেত্রে সমাধানের জন্য উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবর্গের উপদেশ, দিক নির্দেশনা সর্বোপরি সহযোগিতা নেয়ার চেষ্টা তথ্য সংগ্রহকারীকে নিজ উদ্যোগেই করতে হবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সামাজিক গবেষণায় মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে মূলতঃ গবেষণার প্রয়োজনে তথ্য প্রদানের জন্য মনোভাব গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া, তথ্য সংগ্রহ এলাকার স্থানীয় প্রশাসন, প্রতিষ্ঠান সমূহের সহযোগিতা বা এরকম মনোভাব নিশ্চিতকরণ, সমাজে বিরাজমান অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বিলোপের উদ্যোগ গ্রহণ সর্বোপরি দেশের বিরাজমান নিরক্ষর জনসাধারণকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগই বিশেষভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৬.০ উপসংহারঃ

অতএব সামগ্রিক এই আলোচনা থেকে একথা বলা যায় যে, সামাজিক গবেষণায় মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে উল্লিখিত সমস্যাগুলির সাথে দেশে বিরাজমান শিক্ষাব্যবস্থার যোগসূত্র রয়েছে। বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের বিষয়টি সঙ্গত কারণেই এসে পড়ে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যে কোন দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেশের বিরাজিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে সময়োপযোগী ও বিকাশমুখী করা প্রয়োজন। কেননা শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ করতে প্রযোজনীয় যে সহযোগিতা দরকার যেমন পর্যাপ্ত বাজেট, সুপরিকল্পিত নীতিমালা প্রনয়নসহ গবেষণার জন্য ব্যাপক সাহায্য সহযোগিতা প্রদান। কেননা যে কোন পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারণ বা প্রণয়নের জন্য সঠিক উপযোগী গবেষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদিও সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ রয়েছে, তথাপি সুষ্ঠু ও সঠিক তথ্যনির্ভর গবেষণা পরিচালনার জন্য বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। যেটা একদিকে যেমন আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কার্যকর হবে, অন্যদিকে বাংলাদেশের সার্বিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দিক নির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে।

তথ্য নির্দেশঃ

১। ডঃ মঃ আখতারুজ্জামান, "বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার ভাবাদর্শ।" *জাতীয় সেমিনার শিক্ষা ও শিক্ষার পরিবেশ।* আয়োজনে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন। ১৫ই মার্চ, ১৯৯০, পৃ. ১।

২। *দৈনিক বাংলা*, ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৯৩, পৃ. ৩। উল্লেখ্য যে ১৯৯১ সালের শিক্ষিতের হার বলতে Adult literacy rate বুঝানো হয়েছে।

৩। পূর্বোক্ত।

৪। মনিরুল ইসলাম খান, "সমাজ বিজ্ঞানে গবেষণা বিদ্যা এবং একটি গবেষণা ছক", *সমাজনিরীক্ষণ* (৪৯), আগষ্ট, ১৯৯৩, পৃ. ৪৮।

৫। এম. এম. আকাশ. "সমাজ বিজ্ঞানের গবেষণা পদ্ধতি" *সমাজনিরীক্ষণ* (৪৮) মে – ১৯৯৩, পৃ. ৩৯।

৬ Carven E. C. 1980, Editor's Notes. Directions for Institutional Research. No. 27, উদ্ধৃতি আমিন ইসলাম, "বাংলাদেশে সমাজ বিজ্ঞান চর্চাঃ সংকট এবং উত্তরণ," *সমাজনিরীক্ষণ* (৩৫), ফেব্রুয়ারী ১৯৯০, পৃ. ৬১।

৭। এম. এম. আকাশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০।

৮। *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৪।

৯। দেখুন, নাজমির নূর বেগম, *সামাজিক গবেষণা পরিচিতি*, ঢাকাঃ সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সেপ্টেম্বর, ১৯৮১, পৃ. ২০–২১।

তামাককলে কর্মরতা নারীশ্রমিকঃ মাঠপর্যায়ে তথ্যভিত্তিক একটি জরীপ প্রতিবেদন

ইসরাত জাহান রূপা

১.০ সারসংক্ষেপঃ

আলোচ্য জরীপ প্রতিবেদনটি মূলতঃ কুষ্টিয়া জেলার জুগিয়া গ্রামে গড়ে ওঠা তামাককলে কর্মরতা নারীশ্রমিক সম্পর্কিত। এখানে নারীশ্রমিক বলতে তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে যারা তামাক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানাদিতে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কর্মরত। এই গ্রামটিকে নির্বাচন করা হয় এজন্য যে, সেখানে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরবর্তীকালে তামাক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দ্রুত বিস্তৃতির ফলে এলাকার আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে প্রভাব ফেলে- যা নারী শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র গড়ে তুলতে সহায়ক হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে মূলতঃ নারীশ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে অন্তর্ভূক্তির মেয়াদ, তাদের পূর্বের অবস্থান, বর্তমান পেশায় অংশগ্রহণে সাহায্যকারী সদস্য, মজুরীর পরিমাণ, অর্জিত অর্থ ব্যবহারের ধরন, কর্মক্ষেত্রে সমস্যার ধরন, অর্থনৈতিক উন্নতি, কর্মক্ষেত্রে মালিকের পার্থক্যমূলক আচরণ, কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক ইউনিয়নের ভূমিকা ইত্যাদি বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে।

২.০ ভূমিকাঃ

একটা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারী সমাজের অবস্থান ও মর্যাদা একটা সমাজের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে। বাংলাদেশে জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক পুরুষ এবং অর্ধেক হল নারী। এই অর্ধেক জনশক্তি নারী সমাজের আর্থ-সামাজিক সমগ্র কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ ছাড়া দেশের উন্নয়ন ও প্রগতি একেবারে অসম্ভব। কিন্তু কোনভাবেই এটা পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় না যে শিক্ষায়, পুষ্টিতে, বিত্ততে, আইন, সামাজিক ও সংস্কৃতগতভাবে দেশের মহিলা জনগোষ্ঠী পিছিয়ে আছে।

নানা প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে মহিলারা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে গ্রামাঞ্চলের অতি দরিদ্র পরিবারগুলোর পারিবারিক আয়ের ২৫ থেকে ৩০ শতাংশই মহিলা সদস্যদের অবদান। কারণ দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত এসমস্ত নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়েরা যখন যেভাবে সম্ভব মজুরী-শ্রমিক হিসেবে কাজ করে পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করার জন্য শ্রম বিক্রি করে থাকে। তাদের এই আগমন বা আবির্ভাবকে কয়েকটি কারণে চিহ্নিত করতে পারিঃ

প্রথমতঃ যৌতুকের শিকার, তালাক, বিবাহ বিচ্ছেদ ও নির্যাতনের কারণে দূর্বিসহ জীবনযাপন।

দ্বিতীয়তঃ গ্রাম ও শহরাঞ্চলে মেয়েদের কর্মসংস্থানের সীমিত সুযোগ।

তৃতীয়তঃ গৃহপরিচারিকার অসম্মানজনক পেশার পরিবর্তে নিজস্ব স্বাধীন পেশা নির্বাচন।

চতুর্থতঃ বেঁচে থাকার তাগিদে বাধ্য হয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

আলোচ্য জরীপ প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে নির্বাচিত জুগিয়া গ্রামের তামাককলে কর্মকর্তা নারীশ্রমিকেরা অধিকাংশই মহিলা নির্ভর পরিবার। কারণ এদের অধিকাংশই স্বামী কর্তৃক বিতাড়িত কিংবা তালাকপ্রাপ্তা, অথবা স্বামী কর্তৃক বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করছে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী তামাককলে এদের সংখ্যা শতকরা ৫৬.৪৫ ভাগ। এছাড়াও বিবাহিতা অথচ যাদের স্বামী অক্ষম, পঙ্গু ও বেকার তারাও মহিলা প্রধান পরিবার। যখন এ সমস্ত মেয়েরা এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তখন তারা কাজ পাবার আশায় নিজ গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে কিংবা গ্রাম থেকে শহরে ধাবিত হয়। মূলতঃ কর্মসংস্থানের অভাবই তাদের বাধ্য করে একস্থান হতে আরেক স্থানে স্থানান্তরিত হতে। স্বভাবতঃই তারা ধাবিত হয় শিল্পাঞ্চলগুলির দিকে অর্থাৎ যেখানে আর্থ-সামাজিক অবস্থান পরিবর্তনে কিছু কলকারখানা গড়ে উঠেছে-সেখানে তারা বসতি স্থাপন করে। এখানে তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি যেমনি অনিশ্চিত তেমনি অনিশ্চিত তাদের পারিশ্রমিকের সঠিক প্রাপ্য মজুরী নির্ধারণ। মালিকের ব্যবসাকার্যে যখন তামাক চূর্ণ ও বাছাই কাজে শ্রমিকের প্রয়োজন হয় তখন দিনচুক্তি মোতাবেক নারীশ্রমিকেরা কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে থাকে। এদের কাজ হল তামাকের পাতা ঝাড়াই, বাছাই, তামাক পরিশোধন, বেলবাঁধা ও চূর্ণ করা। সকাল ৭টায় নিয়োগ হয় এবং ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কাজ করে। যখন বেশী কাজ থাকে তখন রাত ৮টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত কাজ করে। এক্ষেত্রে কোন ওভারটাইম মজুরী তারা পায়না। আলোচ্য জরীপ প্রতিবেদনটিতে শ্রমজীবী মেয়েদের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে-মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে। উল্লেখ্য যে, এ সকল তথ্যসমুহ গত ১৯৯১ সালের জুন হতে সেপ্টেম্বর মাস সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করা হয়।

৩.০ তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়াঃ

এ প্রবন্ধে যে সব তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে তার সবটুকুই সংগৃহীত হয়েছে কুষ্টিয়া জেলার জুগিয়া গ্রামে তামাককলে কর্মরতা নারীশ্রমিকদের উপর জরীপ থেকে। এ জরীপে ১৪টি তামাককলে মোট ২৮৫ জন শ্রমিক কাজ করে, যাদের মধ্যে ২৫০ জন নারীশ্রমিক। অর্থাৎ যার মোট শ্রমিকের শতকরা ৮৭.৭১ ভাগ নারী এবং শতকরা ১২.২৮ ভাগ পুরুষ। উল্লেখ্য যে, ২৫০ জন নারীশ্রমিক থেকে ২৫% হিসেবে ৬২ জন নারীশ্রমিককে নির্বিচারে নমুনায়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে। উত্তরদাত্রীদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল, তারা সবাই দৈনিক আয়ের ভিত্তিতে মজুরীসম্পন্ন শ্রমজীবী মহিলা এবং অধিকাংশই তালাকপ্রাপ্তা বা স্বামী পরিত্যাক্তা।

৪.০ প্রাপ্ত তথ্যের ফলাফলঃ

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ফলাফল দ্বারা একদিকে যেমন নারীশ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থান আমরা জানতে পারবো অন্যদিকে তেমনি তাদের সামাজিক অবস্থানও চিহ্নিত হবে। মূলতঃ এরা প্রথমে সামাজিক অবস্থার শিকার হয় এবং পরে আর্থিক দুর্দশায় পতিত হয়। অর্থাৎ সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনায় এটাই প্রতীয়মান যে, সামাজিক কারণ মূলতঃ অর্থনৈতিক কারণের সাথে সম্পর্কিত। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী পরিলক্ষিত হয় যে, কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণে তাড়ন প্রতিক্রিয়াই মুখ্য। কারণস্বরূপ, গ্রামীণ দারিদ্র্য বেড়ে গেছে। জনসংখ্যার চাপে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সংকুচিত হচ্ছে, বেকারত্ব বাড়ছে। শ্রমশক্তি সম্পদে পরিণত না হয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে অতিরিক্ত বোঝা হিসাবে। জুগিয়া গ্রামের তামাককলে শতকরা ৯৩.৫৫ ভাগ নারীশ্রমিক অভাব বা দারিদ্র্যতার কারণে বাধ্য হয়ে কর্মক্ষেত্রে এসেছে। পাশাপাশি কাজের সুযোগ থাকবার ফলে তামাককলের শতকরা ৩৮.৭০ ভাগ কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করছে। অর্থাৎ একদিকে অভাবের তাড়না অন্যদিকে কাজের সুযোগের আকর্ষণে তারা বাড়ীর বাইরে কাজ করতে বাধ্য হয়।

সারণী নং-৪.১ঃ কর্মক্ষেত্রে নারীশ্রমিকদের অন্তর্ভূক্তির মেয়াদঃ

কাজের মেয়াদ (বৎসরে)	সংখ্যা	শতকরা হার
১ বৎসর এর কম	১০	১৬.১২
১-২ ,, ,,	৭	১১.২৯
৩-৪ ,, ,,	১২	১৯.৩৫
৫-৬ ,, ,,	৫	৮.০৬
৭-৮ ,, ,,	৮	১২.০৯
৯-১০ ,, ,,	১৩	২০.৯৬
১০-এর উর্দ্ধে	৭	১১.২৯
মোট	৬২	১০০

কর্মক্ষেত্রে নারীশ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানই তাদের কর্মক্ষেত্রে অন্তর্ভূক্তির প্রধান কারণ। কাজ ভালবেসে কিংবা নিজস্ব একটি ব্যক্তি পরিচয় পাওয়ার জন্য তারা এ কাজ গ্রহণ করেনি।

অভাবের তাড়নায় বাধ্য হয়ে, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার জন্য তারা কাজে নিয়োজিত হয়েছে। কারণ বাংলাদেশের শ্রম বিশেষ করে নারীশ্রম দারুণ সস্তা। প্রাপ্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে ৯-১০ বৎসরে সর্বাধিক শতকরা অর্থাৎ ২০.৯৬ ভাগ নারী শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে অন্তর্ভূক্তির মেয়াদ হয়েছে। এমনকি ১০ বৎসরের উর্দ্ধেও কর্মরতা রয়েছেন অনেক নারীশ্রমিক। কর্মক্ষেত্রে তাদের কাজের মেয়াদ থাকলেও জীবনযাত্রার মানের কোন পরিবর্তন হয় না। যা আমরা পরবর্তী সারণীতে তুলে ধরবো।

এখন কর্মরতা নারীশ্রমিকদের পূর্বের অবস্থান কি ছিল তা জানার প্রয়াস থাকবে

সারণী নং-৪.২ঃ নারীশ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের পূর্বের অবস্থানঃ

পূর্বের অবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার
স্বামীর সংসারে	২৮	৪৫.১৬
বাবা-মা'র সংসারে	১১	১৭.৭৪
ঝি-এর কাজ	১১	১৭.৭৪
হস্তনির্মিত দ্রব্যাদি তৈরী	১০	১৬.১২
চাকুরী*	৩	৪.৮৩
ব্যবসা**	২	৩.২২
মাটিকাটার কাজ	২	৩.২২
মোট	৬২	১০০

(নোটঃ চাকুরী* অর্থে তারা পরিবার পরিকল্পনায় ঝাড়ুদারের চাকুরী, মোহিনিমিল ও বিস্কুট কারখানায় চাকুরীর কথা বুঝিয়েছে।

ব্যবসা** অর্থে ধানচালের ব্যবসা এবং একজন ভারতীয় শাড়ী ব্লাক করে বাড়ীতে বাড়ীতে ফেরী করে বিক্রির কথা বলেছে।)

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে বর্তমান পেশায় অংশগ্রহণের পূর্বে সর্বাধিক সংখ্যক অর্থাৎ শতকরা ৪৫.১৬ ভাগ নারীশ্রমিক স্বামীর সংসারে ছিল। বিয়ের পরই তারা আর্থিক দুরাবস্থায় পতিত হয়। এক্ষেত্রে যৌতুকের চাপ, অন্য মেয়ের প্রতি স্বামীর আসক্তি বাবা-মা'র সংসারে তাদের ফিরিয়ে আনে। ফলে বাধ্য হয়ে তখন কলকারখানায় কাজ নিতে হয়। বাসা বাড়ীতে ঝি-এর কাজ এবং হাতের তৈরী জিনিষ বিক্রির (যেমনঃ পাটের তৈরী শিকা, চালা, ডালা, কুলা, পুতুল, ফুলদানী এমনকি চিড়া, মুড়ি ভাজার কাজ করতে দেখা গেছে।) কাজ ও তামাককলের শতকরা ১৭.৭৪ ভাগ নারীশ্রমিককে করতে দেখা গেছে। উল্লেখ্য যে, স্বাধীনভাবে কাজ করতে তারা সবাই আগ্রহী, তাই বাসাবাড়ীতে কাজ কিংবা কোন পরিবার পরিকল্পনায় ঝাড়ুদারের কাজের চেয়ে তাদের মতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ পাওয়ায় দৈনিক চুক্তিতে তারা পূর্বের পেশা ছেড়ে কর্মে নিয়োজিত হচ্ছে। একথা নির্দিধায় বলা যায় যে, একমাত্র আর্থিক অস্বচ্ছলতায় এই পেশায় আসতে তাদের বাধ্য করছে।

তামাককলে বর্তমান পেশায় অংশগ্রহণে নারীশ্রমিকদের সাহায্যকারী সদস্যদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক (৪৮.৩৮ ভাগ) বলেছেন যে, প্রতিবেশী/আত্মীয়-স্বজনের সহায়তায় এবং শতকরা ৪০.৩২ ভাগ বলেছেন যে নিজেই সন্ধান করে নিয়েছেন এবং মাত্র ১১.২৯ ভাগ মালিককে অনুরোধ করে কাজ পেয়েছেন।

সারণী নং-৪.৩ঃ দৈনিক মজুরীর পরিমাণঃ

দৈনিক মজুরীর পরিমাণ (টাকায়)	সংখ্যা	শতকরা হার
১০-২০	২৯	৪৬.৭৭
২১-৩০	৩২	৫১.৬১
৩১-৪০	১	১.৬১
মোট	৬২	১০০

যেহেতু দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনই নারীমুক্তির অন্যতম শর্ত সেহেতু তামাককলে কর্মরতা নারীশ্রমিকদের আর্থিক মজুরীর পরিমাণ কত তা নির্ণয়ের জন্য তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী লক্ষণীয় যে তামাককলে কর্মরতা মেয়েদের দৈনিক মজুরী খুবই সামান্য। ৩২ জনের অর্থাৎ শতকরা ৫১.৬১ ভাগ নারীশ্রমিকের দৈনিক মজুরী ২১ থেকে ৩০ টাকার মধ্যে এবং

৪৬.৭৭ ভাগের ১০ থেকে ২০ টাকার মধ্যে। যেহেতু তারা দৈনিক চুক্তিতে কাজে নিয়োজিত এবং তাদের সংখ্যাও প্রয়োজনের তুলনায় অধিক সেহেতু আজ একজন কাজ হতে ছাঁটাই হলে মালিক তৎস্থলে আরেকজনকে নিয়োগ করে। ফলে আন্দোলন করে কিংবা ধর্মঘট করেও তারা দৈনিক মজুরীর পরিমাণ বাড়াতে পারেনি। কারণ তাদের মতে মালিকের ইচ্ছামত মালিক যা দেবে তাই তাদের জন্য যথেষ্ট। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় তামাককলে কর্মরতা নারীশ্রমিকেরা তীব্রভাবে মজুরী শোষণের শিকার। যার পরিমাণ পর্যাপ্ত তো নয়ই বরং অত্যন্ত অমানবিক।

এক্ষেত্রে তাদের প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, নারীশ্রমিকেরা তাদের উপার্জিত এই অর্থ কোন কোন খাতে ব্যয় করে থাকেন। তামাককলের সর্বাধিক সংখ্যক নারীশ্রমিক অর্থাৎ শতকরা ৫৬.৪৫ ভাগ বলেছেন যে সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদি ক্রয়ে তারা ব্যয় করে থাকেন। সন্তানের চাহিদা পুরণ করেন শতকরা ১৯.৩৫ জন, ১৬.১২ জন স্বামী কিংবা পিতা-মাতাকে সাহায্য করেন এবং নিজের জন্য খরচ করেন মাত্র ৫ জন।

পরবর্তী প্রশ্ন তাদের কাছে করা হয়েছিল যে, কাজ করতে এসে তারা কোন সমস্যায় পড়েছেন কি না। যেমন-নিয়োগকর্তা, পরিবারের লোকজন, সমাজের মাতব্বর কর্তৃক সমস্যার কথা এক্ষেত্রে বলা হয়েছে।

সারণী নং-৪.৪ঃ কাজ করতে এসে সমস্যার ধরনঃ

সমস্যার ধরন	সংখ্যা	শতকরা হার
নিয়োগকর্তা কর্তৃক	৫	৮.০৬
পরিবারের লোকজনঃ স্বামী, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, পিতা, ভাই	৪	৬.৪৫
সমাজের কর্তৃপক্ষঃ মৌলভী, মাতব্বর	২৬	৪১.৯৩
কোন সমস্যায় পড়তে হয়নি	২৭	৪৩.৫৪
মোট	৬২	১০০

মহিলাদের কাজ করা সম্পর্কে পুরুষদের মনোভাবের কথা স্মরণ করে ধারণা করা হয়েছিল যে, কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের ফলে মহিলারা তাদের পরিবারের লোকজন যেমন স্বামী, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী,

পিতা, ভাই নিয়োগকর্তা কর্তৃক সমালোচনার সম্মুখীন হবেন। তবে নমুনা অন্তর্ভূক্ত নারীশ্রমিকদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কাজ করতে এসে নারীশ্রমিকেরা তাদের পরিবার থেকে ও নিয়োগকর্তা থেকে কমই বাঁধার সম্মুখীন হয়েছেন। সর্বাধিক সংখ্যক শতকরা ২৭ জন (৪৩.৫৪%) কাজ করতে এসে কোন প্রকার সমস্যার কথা বলেননি। তবে সমাজের কর্তৃপক্ষ যেমন মৌলভী ও মাতব্বর কর্তৃক মেয়েদের বাইরে বের হওয়া শরীয়ত বিরোধী এ ধরনের সমস্যার কথা বলেছেন তামাককলে ২৬ জন (৪১.৯৩%)। কারণ তাদের অধিকাংশই আশে-পাশের গ্রাম হতে শহরের মধ্য দিয়ে সকাল ৭টার মধ্যে পায়ে হেঁটে দলবেঁধে কর্মক্ষেত্রে আসে। এরা বোরখা পরে না এবং চলাফেরায় থাকে স্বচ্ছন্দ গতি। এরা টিফিনের সময় স্থানীয় দোকান হতে নিজেরাই যেয়ে খাবার কিনে আনে। তাদের মতে, যেখানে বাঁচাই প্রধান সমস্যা সেখানে বোরখা কিনে পর্দা করার প্রশ্নই আসে না। তবে লক্ষ্যণীয় যে, কর্মক্ষেত্রে এসব মেয়েরা শাড়ী দিয়ে মাথায় ঘোমটা টেনে দেয় পর্দা হিসেবে। কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের পর থেকে নারীশ্রমিকদের আর্থিক অবস্থার কোন উন্নতি হয়েছে কি না তৎসম্পর্কিত তথ্য যাঁচাই করা হয়-যা নিম্নের সারণীর মাধ্যমে তুলে ধরা হল।

সারণী নং-৪.৫ঃ অর্থনৈতিক উন্নতিঃ

অর্থনৈতিক উন্নতি	সংখ্যা	শতকরা হার
কোন উন্নতি হয়নি	৩২	৫১.৬১
মোটামুটি	১৮	২৯.০৩
সামান্য	১২	১৯.৩৫
মোট	৬২	১০০

অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে মজুরী হারের উপর। অর্থাৎ মজুরীর পরিমাণ বেশী হলে আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হবে। তামাককলে একজন নারীশ্রমিকের দৈনিক মজুরী গড়ে ২১ থেকে ৩০ টাকার মধ্যে। এই অপর্যাপ্ত বেতনে শ্রমিকদের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা সর্বদাই অনিশ্চিত থাকে। প্রাপ্ত তথ্যে সর্বাধিক সংখ্যক নারীশ্রমিকই কোন উন্নতি হয়নি বলেছেন। এর প্রধান কারণ হল, দৈনিক দিনমজুরী শ্রমিক হিসাবে তারা যা আয় করেন সঙ্গত কারণেই তা বর্তমান বাজারদরে খুবই অপ্রতুল।বাজারেব উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই। বর্তমান বাজারদরে এ মজুরী কাঠামো যথেষ্ট তো নয়ই বরং অমানবিক।

সারণী নং-৪.৬ঃ কর্মক্ষেত্রে মালিকের পার্থক্যমূলক আচরণঃ

মালিকের পার্থক্যমূলক আচরণ	সংখ্যা	শতকরা হার
পুরুষশ্রমিকদের বেশী মজুরী দেয়া হয়	৫৩	৮৫.৪৮
নারীশ্রমিকদের বেশী খাটানো হয়	৪২	৬৭.৭৪
পার্থক্য নাই	৪	৬.৪৫
বুঝি না	৬	৯.৬৮

এক্ষেত্রে একের অধিক উত্তর ছিল।

প্রাপ্ত সারণীতে জুগিয়ার তামাককলে নারীশ্রমিকদের প্রতি মালিকের পার্থক্যমূলক আচরণ চোখে পড়ে। অর্থ উপার্জনের জন্য তাদের শ্রমকে পুরুষের শ্রমের মত করে দেখা হয় না। ফলে মজুরীক্ষেত্রে দেখা দেয় বৈষম্যমূলক আচরণ। একই কাজে নারীরা পায় কম মজুরী। ৫৩ জন অর্থাৎ শতকরা ৮৫.৪৮ ভাগ নারীশ্রমিক কর্মক্ষেত্রে পুরুষ শ্রমিকদের বেশী মজুরী দেয়া হয় বলেছেন। আর নারী হিসেবে তারা যেমন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে পরিগণিত হয় তাই তাদের শ্রমটাকে মালিক দ্বিতীয় শ্রেণী গোছের একটা কিছু মনে করে। কর্মক্ষেত্রে ৪২ জন অর্থাৎ শতকরা ৬৭.৭৪% ভাগ তাদের বেশী খাটানো হয় বলেছেন। আবার এ সম্পর্কে ৯.৬৮ ভাগ নারীশ্রমিকের কোন ধারণা নেই বলেছেন অর্থাৎ মালিকের পার্থক্যমূলক আচরণ তারা সঠিক বোঝে না বলেছেন। এদের মতে, "সকালে কাজে আসি কাজ শেষে মালিক যা দেয় তাতেই খুশী। অত বুঝতে গেলে কি চাকুরী থাকে?"

কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক ইউনিয়নের ভূমিকা সম্পর্কে নারীশ্রমিকদের মতামত কি-পরবর্তীতে তাদের কাছে এ সম্পর্কিত প্রশ্ন রাখা হয়েছিল।

মূলতঃ নারীশ্রমিকদের সস্তা শ্রমের উপর ভিত্তি করে তামাক প্রক্রিয়াজাত প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে। মহিলারা সাধারণতঃ নীরব শ্রমিক। এটাকেই মালিকেরা দুর্বলতা ভাবে। আর এই দুর্বলতাকে সম্বল করেই তারা মুনাফা করতে চায় বেশী। কাজেই মালিকের চোখে শ্রমিক ইউনিয়ন ব্যাপারটি একটি উট্‌কো ঝামেলা বলেই পরিগণিত হয়। শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে ওঠার মানেই কাজের সময়, ন্যায্য মজুরী, আরো নানা সুযোগ সুবিধা নিয়ে দরকষাকষি। এখন তামাক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের

নারীশ্রমিকেরা কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক ইউনিয়নের ভূমিকা সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করেন তা নিম্নোক্ত চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল।

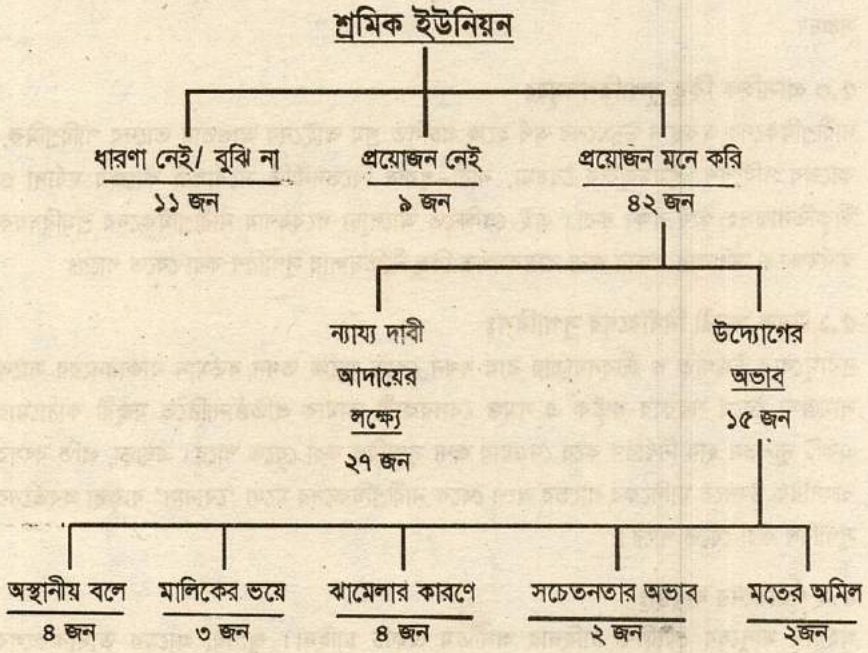

ছক অনুযায়ী, তামাককলের মোট ৬২ জন নারীশ্রমিকদের মধ্যে শ্রমিক ইউনিয়নের ভূমিকা সম্পর্কে ৪২ জন প্রয়োজন মনে করেন, ৯ জন মনে করেন প্রয়োজন নেই এবং বাকী ১১ জন শ্রমিক ইউনিয়ন সম্পর্কে কোন ধারণা নেই বা বোঝে না বলেছেন। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক ইউনিয়ন প্রয়োজন মনে করেন–ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য ২৭ জন, তবে এক্ষেত্রে উদ্যোগের অভাব রয়েছে ১৫ জনের। উদ্যোগের অভাব বলতে তারা বুঝিয়েছেন অস্থানীয় বলে, মালিকের ভয়ে, ঝামেলার কারণে, সচেতনতার অভাব ও মতের অমিল প্রভৃতি কারণে শ্রমিক ইউনিয়ন করা থেকে তারা বিরত রয়েছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, তামাককলে কর্মরতা নারীশ্রমিকেরা শ্রমিক ইউনিয়ন করার মত অনুকূল পরিবেশ পায় না। বাংলাদেশের আর্থ–সামাজিক অবস্থাও তাদেরকে শ্রমিক ইউনিয়ন করার ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহিত করে না। তবে গবেষিকা প্রত্যক্ষ করেছেন যে, অধিকাংশ নারীশ্রমিকই কর্মক্ষেত্রে ইউনিয়ন করার পক্ষে রয়েছেন, যদিও মালিক–শ্রমিক দ্বন্দ্বে শ্রমিকেরা

কোনভাবেই পেরে উঠেন না। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী পাওনার ব্যাপারটি নিশ্চিত করার জন্য তাদের নিজস্ব আন্দোলনই জরুরী। কারণ ইউনিয়ন করে তাৎক্ষণিক লাভ না হলেও এর মাধ্যমেই শ্রমিকদের সচেতনতার বিকাশ ঘটতে পারে। আর এ সচেতনতাই তাদের ভবিষ্যৎ আন্দোলনের সঞ্চয়।

৫.০ প্রাসঙ্গিক কিছু সুপারিশসমূহঃ

নারীশ্রমিকদের অবস্থান উন্নয়নের অর্থ হচ্ছে প্রচলিত শ্রম আইনের আওতায় তাদের পারিশ্রমিক, কাজের পরিবেশ, শ্রমমজুরীর বৈষম্য, নারী–পুরুষ বিভেদনীতি সর্বোপরি কাজের মর্যাদা ও স্বীকৃতিলাভসহ স্বার্থ রক্ষা করা। এই প্রেক্ষিতে আলোচ্য গবেষণায় নারীশ্রমিকদের শ্রমবিষয়ক স্বার্থরক্ষা ও অধিকার রক্ষার জন্য বাস্তবসম্মত কিছু নীতিমালার সুপারিশ করা যেতে পারেঃ

৫.১ উন্নত মজুরী নির্ধারণের সুপারিশঃ

দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি ও জীবনযাত্রার ব্যয় যখন বেড়ে যাচ্ছে তখন বর্তমান বাজারদরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকার কর্তৃক এ সমস্ত বেসরকারী তামাক প্রতিষ্ঠানাদিতে মজুরী কাঠামোর একটি ন্যুনতম হার নির্ধারণ করে দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে। এছাড়া, প্রতি বৎসর বাৎসরিক উৎসবে মালিকের লাভের অংশ থেকে নারীশ্রমিকদের মধ্যে 'বোনাস' ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করা যেতে পারে।

৫.২ গৃহায়নের ব্যবস্থাঃ

গৃহায়ন মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম একটি চাহিদা। জুগিয়া গ্রামের তামাককলের নারীশ্রমিকদের জন্য মালিক কর্তৃক ঘর তুলে দেয়ার কোন বন্দোবস্ত নেই। ফলে প্রতিদিন এ সমস্ত শ্রমিকেরা কুষ্টিয়া জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে পায়ে হেঁটে কর্মক্ষেত্রে আসছে। সুতরাং নারীশ্রমিকদের জন্য গৃহীত কার্যকর ও উপযোগী নীতিমালার আলোকে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে গৃহায়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে পারলে কর্মক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা লাভের বিষয়টি নিশ্চিত দাবী রাখবে বলা যায়। ফলে কর্মক্ষেত্রে মিল মালিকের সাথেও সদ্ভাব বজায় থাকবে।

৫.৩ কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাবিধানের সুপারিশঃ

৮ ঘন্টা কার্যক্রম আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হলেও তামাককলে কর্মরতা নারীশ্রমিকেরা এর আওতাবহির্ভূত। তাদের দৈনিক ১১ থেকে ১২ ঘন্টা কাজ করতে হয়–যা আইনতঃ নিষিদ্ধ। রাতে আমাদের দেশের পথঘাট নিরাপদ নয়– তবুও এই আইন লংঘিত হয়। এক্ষেত্রে তামাককলের নারীশ্রমিকদের জন্য মালিক কর্তৃক যাতায়াতের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অন্যদিকে, মালিকের ইচ্ছামত ছাঁটাইয়ের ভয়–মেয়েদের কাজের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হলেই যে মালিকের খেয়াল খুশীমত ছাঁটাই হবে তা ঠিক নয়;

নারীশ্রমিকদের ছাঁটাইয়ের যথার্থ কারণ থাকতে হবে। এক্ষেত্রে এমন আইন প্রবর্তিত হওয়া উচিৎ যা মালিক মানতে বাধ্য। আর মালিক যদি আইন অমান্য করে তবে সেক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

৫.৪ নারী পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণঃ

সরকার কর্তৃক দরিদ্র শ্রমজীবী নারীশ্রমিকদের জন্য মজুরী নির্দিষ্ট করে দেয়া উচিত যাতে কর্মনিয়োগীকারী ও গ্রামীণ সমাজের নেতা, চেয়ারম্যান, মাতব্বর এবং প্রতিষ্ঠানের মালিক দ্বারা শোষিত না হয়। জাতিসংঘ সনদের ১১ ধারায়, নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য অপনোদন সংক্রান্ত কনভেনশনে সম অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে–

(ক) নারী–পুরুষ নির্বিশেষে সব মানুষের কাজ করার অপ্রতিরোধ্য ও অনস্বীকার্য অধিকার;

(খ) কাজে নিয়োগের জন্য সমান সুযোগ–সুবিধার অধিকার, বাছাই বা নির্বাচন পর্বে অভিন্ন নীতির প্রয়োগ;

(গ) কাজের নিরাপত্তা, সমমানের সুযোগ–সুবিধা প্রদান;

(ঘ) সমতামূলক বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা, সমমানের কাজের মূল্যায়নের জন্য অভিন্ন নীতির প্রয়োগ;

(ঙ) অসুখ–বিসুখ, কর্মশক্তির অপচয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে বেতন ভাতাসহ ছুটির অধিকারভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা।[১]

অধিকারগুলো যাতে নারীশ্রমিকেরা পেতে পারে সেজন্য সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা উচিত।

৫.৫ শ্রমিক ইউনিয়ন সম্পর্কিত সচেতনতা সৃষ্টিঃ

গবেষিকা প্রত্যক্ষ করেছেন যে, তামাককলে কর্মরতা নারীশ্রমিকেরা তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মালিকের ভয়ে, কাজ হারাবার ভয়ে এবং পারিবারিক নানা ঝামেলার কারণে শ্রমিক ইউনিয়ন করা থেকে বিরত থাকে। তাছাড়া বর্তমান আর্থ–সামাজিক কাঠামোতে নারী যেভাবে লালিত–পালিত হয় এবং যেভাবে তাকে শিক্ষা ও জ্ঞান দেয়া হয় সে জ্ঞান ও শিক্ষা নিয়ে সে যে তার দাবী–দাওয়া, ন্যায্য মজুরী ও অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হবে সে সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। সুতরাং এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে,

(ক) বর্তমান আর্থ–সামাজিক প্রেক্ষাপটে সর্ব প্রথম নারীশ্রমিকদের কমপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে।

[১] দিলরুবা সাহানা ও রাখীদাস পুরকায়স্থ অনুদিত, *নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য অপনোদন সংক্রান্ত কনভেনশন*, জাতিসংঘ, তথ্যকেন্দ্র, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ঢাকা, ১৯৮৩

(খ) তাদের ন্যায্য দাবী বুঝে নিতে শিখতে হবে। এ ব্যাপারে শ্রমিকদের কল্যাণে নিয়োজিত বিভিন্ন সংগঠন বা রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে নারীশ্রমিকদের শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

(গ) যেহেতু এটি একটি বেসরকারী মালিকানাধীন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সেহেতু শ্রমিকের সুবিধা-অসুবিধাগুলি জানার জন্য মালিককে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। কারণ শ্রমিক ও মালিক উভয়ে উভয়ের পরিপূরক এ ধারণা তাদের আত্মস্থিত করতে হবে।

৬.০ উপসংহার

এই গবেষণা প্রতিবেদনটি স্বল্প পরিসরে হলেও তামাককলে কর্মরতা নারীশ্রমিকদের তথা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের দরিদ্রতম শ্রমজীবী নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের একটি চিত্র আমাদের সামনে ফুটে উঠেছে যার সাথে এই শ্রেণীর বৃহত্তর অংশের সমস্যা সমূহের মিল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। তবে এটা অত্যন্ত সত্যি যে নারীশ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের ফলে যুগ যুগ ধরে গৃহবন্দী দরিদ্র মহিলারা ঘরের কোণ থেকে বেরিয়ে এসে কিছু অর্থের যোগান পেয়েছে নিজের হাতের মধ্যে। এই অর্থ তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবে-যা তাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে পরিবর্তন করবে এবং নিজের সম্বন্ধে সচেতন করবে। উল্লেখ্য যে, মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকালে গবেষিকা লক্ষ্য করেছেন যে তীব্র অর্থনৈতিক টানাপোড়নে তামাককলে কর্মরতা নারীশ্রমিকেরা জর্জরিত যে, প্রচলিত রীতিনীতি, পর্দাপ্রথা, কুসংস্কার তারা কঠোরভাবে মানতে পারে না। একদিকে বোরখা কেনার মত আর্থিক সঙ্গতির অভাব অন্যদিকে জীবন ও জীবিকার তাগিদে তারা ঘরের বাইরে কাজ করতে যেতে বাধ্য হয়। তবে যতদুর সম্ভব তারা মাথায় ঘোমটা দিয়ে কর্মক্ষেত্রে চলাফেরা করে। একদিকে অর্থনৈতিক টানাপোড়ন অন্যদিকে অর্থ উপার্জনের চাহিদা এবং কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ তথা কর্মসুযোগ সৃষ্টির সাথে সাথে নারীশ্রমিকদের মধ্যে পর্দা মেনে চলার ব্যাপারে গবেষিকা যথেষ্ট নমনীয়তা লক্ষ্য করেন।

তবে যে কোন কর্মসূচীই সার্থক করে তুলতে হলে সংশ্লিষ্ট সরকারী এজেন্সীসহ শ্রমিক, মালিক, ইউনিয়ন, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার তথা সমগ্র নারীসমাজকে তাদের ন্যুনতম অধিকার আদায়ের জন্য উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। সর্বোপরি শ্রম আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশে তথ্যের অপর্যাপ্ততার জন্য কোটি কোটি টাকা উন্নয়ন পরিকল্পনায় মহিলাদের উন্নয়নের নামে অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ হচ্ছে। এই অর্থ যদি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে বিনিয়োগ হয়, তবে তা কেবল মহিলাদের জন্যই নয় দেশের জন্যও হবে মঙ্গলজনক এবং উন্নয়নের জন্য তা হবে ফলপ্রসু বিনিয়োগ।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography):

Abdullah, Taherunnessa, *Village Woman as I Saw Them*, The Ford Foundation, Dhaka: 1974.

Ahmed, Parven, *Income Earning as Related to the Changing Status of Village Womem in Bangladesh*, Dhaka: Women for Women Study and Research Group, 1980.

Arens, Jenneke and Beurdan, Jos Van, *Jhagrapur Poor Peasants and Women in a Village in Bangladesh*, Amsterdam, The Netherlands. (year unpublished).

Begum, Najmir Nur, *Pay or Purdah: Women and Income Earning in Rural Bangladesh*, Dhaka: Bangladesh Agricultural Research Council, 1988.

Chaudhury, R. Huda and Ahmed, N Rahman, *Female Status in Bangladesh*, Dhaka: BIDS, 1980.

Jahan, Rounaq and Papanek, Hanna, *Women and Development*, Dhaka: The Bangladesh Institute of law and International Affairs, 1979.

Noman, Ayesha, *Status of Women and Fertility in Bangladesh*, Dhaka: UPL,1983.

আবদুল মোমিন চৌধুরী, *মালিক-শ্রমিক কর্মচারী সম্পর্ক কার অধিকার কতটুকু*, ঢাকাঃ ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, জুলাই, ১৯৮৬।

দিলরুবা সাহানা ও রাখীদাস পুরকায়স্থ (অনুঃ), *নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য অপনোদন* সংক্রান্ত কনভেনশন, ঢাকাঃ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, জাতিসংঘ, তথ্যকেন্দ্র, ১৯৮৩।

মুহাম্মদ ইউনুস, *বেলতৈল গ্রামের জরিমন ও অন্যান্যরা*, ঢাকাঃ গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প, এপ্রিল, ১৯৮৪।

সুরাইয়া বেগম, *পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক অংশগ্রহণে গ্রামীণ নারী-একটি সমীক্ষা*, ঢাকাঃ সমাজনিরীক্ষণ কেন্দ্র, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯।

হাসিনা আহমেদ (অনুঃ), *বাংলাদেশের নারী ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, ঢাকাঃ সমাজনিরীক্ষণ কেন্দ্র, অক্টোবর, ১৯৮৯।

বি. আর. ডি. বি'র গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন প্রয়াসঃ একটি মূল্যায়ন

এ. এইচ. এম. মোস্তাফিজুর রহমান

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে অদ্যাবধি গৃহীত সকল উন্নয়ন প্রয়াস এবং উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের ধারণাসমূহ পর্যালোচনা করলে যে বিষয়টি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে তা হলো গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে যদি সঠিকভাবে সংগঠিত করা যায় তবে 'কার্যকর অংশগ্রহণের' মাধ্যমে তারা তাদের অভাব পূরণে সক্ষম হতে পারে। আর এ ক্ষেত্রে গ্রামের ভূমিহীনদের সমন্বয়ে গঠিত বিত্তহীন সমবায় সমিতিগুলো 'কার্যকর অংশগ্রহণের' জন্য প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করতে পারে। গ্রামের সহায় সম্বলহীন মানুষদের সংগঠন হিসেবে বিত্তহীন সমবায় সমিতিগুলো বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলাপমেন্ট বোর্ড (বি.আর.ডি.বি.) এর সাম্প্রতিকতম প্রয়াস। এই সমিতির উদ্ভব এবং বিকাশ এদেশের গ্রামীণ উন্নয়ন প্রচেষ্টার ইতিহাসের মধ্যে গভীরভাবে গ্রোথিত। গ্রামীণ উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭১ সালে প্রথম বারের মতো এদেশে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী একটি প্রকল্প হিসেবে গৃহীত হয়। প্রাথমিকভাবে এ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের কৃষকদের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা। কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর বিষয়টিই এ সময় এ কর্মসূচীতে প্রাধান্য পেয়েছিল। গ্রামের কৃষকরাই ছিল প্রকল্পটির এ পর্যায়ের সুবিধাভোগী শ্রেণী এবং পরবর্তীতে কুমিল্লায় গৃহীত পরীক্ষামূলক সংগঠনের অনুকরণে কৃষকদের সমন্বয়ে গঠিত সমবায় সমিতিগুলোকে টার্গেট গ্রুপ হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। কুমিল্লা মডেলের সমবায়গুলো ছিল দুইধাপ বিশিষ্ট। কৃষক সমবায় সমিতি (কে. এস. এস) নামে গ্রামের কৃষকদের সমন্বয়ে গঠিত সমিতিগুলো ছিল প্রথম ধাপের অন্তর্ভূক্ত। শুধুমাত্র জমির মালিকানা থাকলেই যে কোন কৃষক গ্রাম পর্যায়ের এ সমিতিগুলোর সদস্য হতে পারতো। জমির পরিমাণ এ ক্ষেত্রে কোন বিবেচ্য বিষয় ছিল না। গ্রাম পর্যায়ের সমিতিগুলো পরবর্তী ধাপে থানা পর্যায়ের সমবায় সমিতি ফেডারেশনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতো। এভাবে গ্রাম পর্যায়ে স্বতন্ত্র সমিতি গঠন এবং থানা পর্যায়ে উক্ত সমিতিগুলোর ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্তি এই দুই ধাপ কুমিল্লা মডেলের সমবায় সমিতির নবতর কাঠামো নির্মাণ করে। যা হোক, সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর (আই. আর. ডি. বি) অন্তর্ভুক্ত সমবায়গুলোর মূল্যায়নে দেখা গেছে যে, সংখ্যাগত বিকাশ কিম্বা সম্প্রসারণ ঘটলেও গুণগত দিক থেকে এ সমিতিগুলো সুদীর্ঘদিনের ত্রুটি কাটিয়ে তেমন উৎকর্ষতা লাভ করতে পারেনি। এক্ষেত্রে এ

কর্মসূচীর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় যে অভিযোগ ছিল তা হচ্ছে, এটা বরাবরই ক্ষুদ্র কৃষকদের স্বার্থ উপেক্ষা করে বড় বড় কৃষকদের স্বার্থকে সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট থেকেছে। সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী এবং পরবর্তীতে গৃহীত বহুমুখী (Multisectoral) সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর প্রকল্প সমূহের অপর যে ত্রুটিটি সকলের দৃষ্টিগোচর হয়েছে তা হলো গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে ভূমিহীনদের জন্য পৃথক কোন কর্মসূচী এগুলোর কোনটিতেই ছিল না। সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর এ ত্রুটিগুলো সামনে রেখে এবং দেশের ক্রমবর্ধমান ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর কথা বিবেচনা করে আই. আর. ডি. পি'র উত্তরসূরী এবং প্রধান সহযোগী হিসেবে বি. আর. ডি. বি. গ্রামের দরিদ্র পুরুষ এবং মহিলাদের সমবায়ের অধীনে সংগঠিত করা শুরু করেছিল। পরবর্তীতে এ সমবায়গুলোকে যথাক্রমে বিত্তহীন সমবায় সমিতি (বি. এস. এস) এবং মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি (এম. বি. এস. এস) নামে অভিহিত করা হয়। এ সমিতিগুলো সূচনালগ্ন থেকেই এতো দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে যে, ১৯৮৩ সালের জুলাই মাসে রুরাল পুওর প্রোগ্রাম (আর. পি. পি) নামে বি. আর. ডি. বি. একটি বিশেষ সেল প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৮৪ সালের প্রথম দিকেই আর. পি. পি. মাঠ পর্যায়ে তার কার্যক্রম শুরু করে দেয়। আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম (income generating activity) গ্রহণের মাধ্যমে আত্ম কর্মসংস্থান (Self-Employment) সৃষ্টিই ছিল গ্রামের ভূমিহীন তথা বিত্তহীনদের নিয়ে গঠিত এসব সমবায়গুলোর প্রধান উদ্দেশ্য। সংশ্লিষ্ট গবেষক এবং উন্নয়ন কর্মীদের মতে কৃষকদের সংগঠনের চেয়ে ভূমিহীনদের এ সংগঠনগুলো ইতিমধ্যেই অধিকতর কার্যকরী এবং সন্তোষজনক প্রমাণিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে পল্লী দরিদ্র্য কর্মসূচীর ও বিত্তহীন এবং মহিলা বিত্তহীন সমিতিগুলোর কার্যক্রম তথা গ্রামীণ দারিদ্র্য-পীড়িত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ সমিতিগুলোর ভূমিকা এবং সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণে এগুলোর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনার জন্য বর্তমান নিবন্ধটি প্রণীত হয়েছে।

রাজশাহী জিলার পুঠিয়া থানার অন্তর্গত পুঠিয়া ইউনিয়নের সর্বমোট ৮টি দৈবচয়িতভাবে নির্বাচিত পুরুষ ও মহিলা বিত্তহীন সমিতির মোট ১১৯ জন সদস্যের (৬৪ জন পুরুষ এবং ৫৫ জন মহিলা) উপর পরিচালিত একটি জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে বর্তমান নিবন্ধটি প্রণয়ন করা হয়েছে। ১৯৯২ সালের ২০শে ডিসেম্বর থেকে শুরু করে ১৯৯৩ এর ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সময়ে আমরা এ গবেষণার মাঠকর্ম পরিচালনা করি। মাঠকর্ম শুরু করার আগে আমরা পুঠিয়া থানা বি. আর. ডি. বি. অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে উক্ত থানাধীন বিত্তহীন সমিতিগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করি। পুঠিয়া ইউনিয়নের যে সব সমিতির মধ্যে আমরা জরিপ কার্য পরিচালিত করেছি সে সমিতিগুলো হচ্ছেঃ পুঠিয়া, বারইপাড়া, কান্দ্রা, কান্দ্রাগুচ্ছগ্রাম, পালোপাড়া, গোপালহাটি, গণ্ডগোহালী এবং তারাপুর। উত্তরদাতাদের কাছ থেকে আমাদের গবেষণার প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহের জন্য আমরা জরিপ পদ্ধতির সাক্ষাৎকার কৌশল অবলম্বন করেছি। বাংলায় লিখিত একটি কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার প্রশ্নমালা (structured questionnaire) প্রণয়ন করে আমরা

এর সাহায্যে উত্তরদাতাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে আমাদের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণে এবং সুদীর্ঘ দু'মাস তাদের জীবন যাত্রার বিভিন্ন দিক এবং সমিতির কার্যক্রম সম্পর্কে যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তা গবেষণার জন্য সংগৃহীত তথ্যকে সমৃদ্ধ করেছে বলে আমাদের মনে হয়েছে। শুধুমাত্র আটটি বিত্তহীন সমবায় সমিতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার ফলে এই গবেষণার উপাত্ত প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত ছিল না। এ ছাড়াও উত্তরদাতাদের জীবন যাত্রার বিভিন্ন দিক এবং সমিতি সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্বন্ধে অধিকতর বস্তুনিষ্ঠ ধারণা লাভের জন্য প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ বেশী ফলপ্রসূ হতে পারতো। কিন্তু, অর্থ ও সময়ের সীমাবদ্ধতা আমরা কাটিয়ে উঠতে পারিনি বলে জরিপ পদ্ধতির মধ্যেই আমাদের গবেষণাকে সীমিত রাখতে হয়েছে।

বিত্তহীন সমবায় সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাঃ

গবেষণাধীন পুঠিয়া ইউনিয়নের বিত্তহীন এবং মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতির সদস্যদের গড় বয়স ছিল পুরুষ ৩৭ বৎসর এবং মহিলা ৩৩.৩১ বৎসর। সর্বমোট ১১৯ জন সদস্যের মধ্যে ৩ জন হিন্দু সদস্য ছাড়া বাকী সকলেই ছিল মুসলমান। সদস্যদের ৮০% জনই ছিল নিরক্ষর এবং তারা কোনদিনই স্কুলে পড়তে যায়নি। ৫ জন পুরুষ এবং ২ জন মহিলা ছাড়া সকলেই বিবাহিত তবে মহিলাদের মধ্যে ৫ জন বিধবা মহিলা ছিল। সদস্যদের বিয়ের বয়স গড় বয়স ছিল যথাক্রমে ২১ বৎসর এবং ১৪ বৎসর যা বাংলাদেশের গ্রামীণ পুরুষ এবং মহিলাদের অল্প বয়সে বিয়ে করার প্রবণতাকে প্রমাণ করে। বিবাহিত সদস্যদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রবণতা তেমন দেখা যায়নি। সন্তান সংখ্যার দিক থেকে অধিক সন্তানের প্রতি অনাগ্রহ অধিকাংশ সদস্যদের মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে (পুরুষদের গড় সন্তান সংখ্যা ২.৮১ জন এবং মহিলাদের ২.৮৮ জন)। স্কুলে পড়ার উপযোগী ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানোর তাগিদ সদস্যদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে। বিত্তহীন সমিতির বিপুল সংখ্যক সদস্যবৃন্দ ছোট পরিবারের আদর্শ গ্রহণ করে পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন স্থায়ী এবং অস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। তবে, এক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের মধ্যে বেশী আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। এই সব সদস্যদের পরিবারের সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে তাদের পরিবারের গড় আকৃতি ছিল ৪.৬৪ জন যা বাংলাদেশের পরিবারের গড় আকৃতির (৫.৮৩) চেয়ে ছোট। সদস্যদের মধ্যে একক পরিবারের সংখ্যাধিক্য লক্ষণীয় (পুরুষ ৮৯.০৬% এবং মহিলা ৭৬.৩৬%)। এ তথ্য মূলতঃ সেন (১৯৬৫) এবং ইপস্‌টেন (১৯৭৩) এর ধারণাকেই (ভূমিহীনতা/বিত্তহীনতা এবং একক পরিবার ইতিবাচক ভাবে সম্পর্কিত) শক্তিশালী করে। বিত্তহীন সমিতির সদস্যরা জীবিকার জন্য কৃষি এবং কৃষি সম্পর্কিত কাজের উপর নির্ভরশীল। তবে কিছু কিছু সদস্য রিক্সা, ভ্যানগাড়ী চালনা, ক্ষুদ্রব্যবসা, কাঠের কাজ ইত্যাদি অকৃষি পেশায় নিয়োজিত। মহিলা বিত্তহীন সমিতির সদস্যদের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া গেছে। যেমন তাদের অধিকাংশই সমিতির সদস্য হবার আগে গৃহস্থালী কাজ ছাড়া অর্থ উপার্জনকারী

কোন কাজের সঙ্গে জড়িত ছিল না। অথচ সমিতির সদস্য হওয়ার পর থেকে ৫০% জনেরও বেশী সদস্য ধান চালের ব্যবসা, বাড়ীতে ছোট-খাট হাঁস-মুরগীর খামার, ক্ষুদ্র ব্যবসা, টেইলারিং ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত আছে। বিপুল সংখ্যক সদস্য তাদের বাড়ীতে গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী পালন করে থাকে এবং তাদের ৫০% জনেরও বেশী নিয়মিতভাবে এগুলো থেকে কিছু না কিছু আয় করতে সক্ষম হচ্ছে। মোট সদস্যদের প্রায় ৫০% জন বাড়ীর চার পাশের আঙ্গিনায় শাক-সবজীর আবাদ করছে এবং তা থেকে পরিবারের চাহিদা মেটানোর পরেও কিছু অর্থ উপার্জন করতে পারছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছে। বিত্তহীন সমিতির সদস্যদের ৫০% জনের বেশী শুধুমাত্র একটি উৎস থেকে আয় করতে পারে বলে জানায়। আয়ের স্থায়ী / নিয়মিত উৎস বলতে যা বোঝায় তাও অধিকাংশ সদস্যেরই নেই। তাদের গড় মাসিক আয় (পুরুষ ৯৪৬.৩৬ টাকা এবং মহিলা ৯১৮ টাকা) দারিদ্র্যের চিত্রকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। সংগত কারণেই বিপুল সংখ্যক সদস্যকে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন অথবা পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। লক্ষ্যণীয় যে, গ্রাম্য মহাজন অথবা জোতদারদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণের ব্যাপারটি সদস্যদের মধ্যে তেমন দেখা যায়নি। ভূমিহীনতার কারণ সম্পর্কে ৭১.৭২% পুরুষ এবং ৮৮.৮৮% মহিলা জানিয়েছে যে, উত্তরাধিকার সূত্রেই তারা ভূমিহীন অর্থাৎ বাবার কাছ থেকে আবাদযোগ্য কোন জমিই তারা পায়নি এবং তাদের দাদারও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কোন জমি ছিল না। সদস্যদের দারিদ্র্য সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ ধারণা তাদের খাবারের ধরন থেকে পাওয়া যেতে পারে। তিনবেলা কোনভাবে পেটপুরে খেতে পারে এমন একটা পরিবারও আমরা পাইনি। পরিবারের সদস্যদের জন্য কোনভাবে দিনে দুইবার অন্ন সংস্থান করতে পারে এমন সদস্য সংখ্যা অর্ধেকেরও কম। সদস্যদের মধ্যে ৪৬.৮৭% পুরুষ এবং ৩৯.৬% মহিলা দিনে মাত্র একবার খাবারের ব্যবস্থা করতে পারে। বিত্তহীন সমিতির এক-তৃতীয়াংশের কোন বসত ভিটা নেই এবং তারা তাদের নিকট আত্মীয় যেমন - চাচা, মামা অথবা শ্বশুরের বাড়ীতে অস্থায়ীভাবে একটা ঘর উঠিয়ে সেখানে বসবাস করছে। তাদের বাড়ী সাধারণভাবে মাটি ও খড়ের তৈরী এবং শতকরা ৮৮% জনের শুধুমাত্র একটি ঘর আছে। সুস্থ পারিবারিক পরিবেশের জন্য ন্যুনতম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদিও তাদের জীবনে অনুপস্থিত। যেমন- ৬৫% জনের বাড়িতে কোন ল্যাট্রিন নেই। গ্রামের সবচেয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে সরকার প্রদত্ত রিলিফ সামগ্রীও তাদের ভাগ্যে জোটে না বলে জানিয়েছে ৮৮% সদস্য।

বিত্তহীন সমিতির কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশে বি. আর. ডি. বি কর্তৃক গৃহীত উত্তর পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতাভুক্ত পুঠিয়া থানার বিত্তহীন এবং মহিলা বিত্তহীন সমিতির কার্যক্রম ১৯৮৪ সালে শুরু হয়েছিল। তাই ১৯৮৪ সাল থেকে শুরু করে বর্তমান গবেষণাকাল ১৯৯২ পর্যন্ত সমিতিগুলোর কার্যক্রমের ভিত্তিতেই

উত্তরদাতাদের প্রদত্ত তথ্য এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। ১৯৮৪ সালে এর কার্যক্রম শুরু হলেও পুঠিয়া থানার সকল বিত্তহীন সমিতিগুলো একই সঙ্গে গঠিত হয়নি বা তাদের কাজ শুরু করতে পারেনি। ফলশ্রুতিতে আমাদের জরিপকৃত মোট আটটি সমিতির সদস্যদের দেয়া তথ্য থেকে দেখা গেছে যে তাদের সমিতিভূক্ত হবার বিষয়টিও বিভিন্ন মেয়াদের। যেমনঃ বিত্তহীন সমিতির ২৫% সদস্য জানিয়েছে যে তারা ৬-৮ বৎসর যাবৎ এই সমিতির সঙ্গে জড়িত অপরদিকে একই সময়ের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মহিলা বিত্তহীন সমিতির সদস্য ছিল ৪১.৮১% জন। আবার ৩-৫ বৎসর যাবত সমিতির সংগে জড়িত পুরুষ এবং মহিলা যথাক্রমে ৭৫% এবং ১৪.৫৪%। প্রদত্ত তথ্য অনুসারে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সমিতির প্রভাব মূলতঃ ৩-৮ বৎসরের কার্যক্রমের ভিত্তিতেই করা হয়েছে বলাটাই যুক্তিসংগত। বিত্তহীন সমিতির নির্ধারিত বিধি মোতাবেক প্রতি দুই বৎসর অন্তর প্রতিটা সমিতি ঋণ গ্রহণের সুবিধা পেতে পারতো। এ নিয়মে মোট আট বৎসরে সদস্যদের সর্বাধিক চারবার ঋণ গ্রহণের সুযোগ থাকলেও মাঠ পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, কোন সদস্যই সেই সুযোগটি গ্রহণ করতে পারেনি। প্রায় অর্ধেক পুরুষ (৪৫%) এবং অর্ধেকের কিছু বেশী মহিলা (৫৪%) দুই থেকে তিন বার ঋণ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল। গৃহীত ঋণের পরিমাণ সঙ্গত কারণেই সকলের ক্ষেত্রে সমান ছিল না। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, বিভিন্ন ট্রেডের বিপরীতে সর্বমোট ৩ হাজার থেকে ৭ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেছে পুরুষদের মধ্যে ৫৪% জন এবং মহিলাদের মধ্যে ৭০% জন। সদস্যরা ১২টি বিভিন্ন ধরনের ট্রেডের বিপরীতে ঋণের আবেদন করতো। এই গবেষণার উত্তরদাতা পুরুষ এবং মহিলা কর্তৃক সর্বাধিক উল্লেখিত ট্রেডগুলো ছিল গরু-ছাগল পালন পুরুষ ৩৭ (৫৭.৮১%) জন; মহিলা ৩০ জন (৫৪.৫%) দুধেল গাভী পালন (পুরুষ ৪৩.৭%, মহিলা ৪৫.৪%)। এ ছাড়াও অপরাপর বিশেষ কিছু ট্রেডের কথা কিছু পুরুষ সদস্য উল্লেখ করেছে। যেমন, মাছের চাষ (২৩.৪%), কাঠের কাজ (৯.৩৭%), রিক্সা ভ্যান ক্রয় (১২.৫%)। মহিলাদের ক্ষেত্রেও এইরূপ বিশেষ কিছু ট্রেডের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমনঃ ব্লক প্রিন্টিং (৫.৪৫%), হাঁস মুরগী পালন (১৬.৩৬%), ধান ভানা (১৪.৫৪%), হস্তশিল্প (১২.৭২%) ইত্যাদি। উল্লেখিত বিভিন্ন ট্রেডের বিপরীতে ঋণের আবেদন এবং ঋণ গ্রহণ করলেও আমাদের মাঠ পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে বিপুল সংখ্যক উত্তরদাতা (পুরুষ ৮৪.১৭%; মহিলা ৭৬.৮%) তাদের ইচ্ছা এবং সুবিধা অনুযায়ী যে কোন আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমেই তা কাজে লাগিয়েছে। আসলে বিত্তহীন সমবায় সমিতির সদস্যরা তাদের ঋণের টাকা একেবারে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারে এ সত্যই প্রাপ্ত তথ্য থেকে প্রমাণিত হয়েছে। তবে যে চমকপ্রদ বিষয়টি এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তা হলো মোট ১১৯ জন সদস্যের মধ্যে ২/১ জন ছাড়া এমন কাউকে আমরা পাইনি যারা ঋণের টাকা লাভজনক কোন কাজে ব্যবহার না করে শুধুমাত্র পরিবারের তাৎক্ষণিক অভাব মেটানোর জন্য ব্যয় করেছে। উপরন্তু প্রায় সমস্ত সদস্য এবং সদস্যাকে খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে দেখেছি যাতে করে তারা সমিতি

থেকে প্রাপ্ত ঋণের সদ্ব্যবহার করে পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা আনতে পারে। আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে ঋণের টাকার সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি কিভাবে করা যেতে পারে সর্বোপরি কিছু কিছু ট্রেডের উপর (যেমন, কাঠের কাজ, হস্তশিল্প, সেলাই, পশু পালন ইত্যাদি) বিশেষ স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা স্থানীয় বি. আর. ডি. বি. অফিস নিয়মিতভাবে পরিচালিত করবে এটাই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু সদস্যদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, ৭৮.১২% পুরুষ এবং ৫৪.৫% মহিলা কখনোই কোন প্রশিক্ষণের সুযোগ পায়নি। এ তথ্য মূলতঃ বি. আর. ডি. বি. কর্মকর্তাদের অবহেলাকেই প্রকটভাবে তুলে ধরেছে বলে আমরা মনে করি।

পল্লী দরিদ্র কর্মসূচীর দারিদ্র্য দূরীকরণ কৌশলের মধ্যে বাইরের আর্থিক সহায়তার উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে সদস্যদের সঞ্চয়কৃত (শেয়ার খরিদ এবং সাপ্তাহিক সঞ্চয়) টাকা দিয়ে সমিতিগুলোর একটা নিজস্ব মূলধন গড়ে তোলার বিষয়টি খুবই গুরুত্বের সঙ্গে নেয়া হয়েছিল। বর্তমান গবেষণার পুরুষ এবং মহিলা উভয় উত্তরদাতাদের ক্ষেত্রে নিয়মিত সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমা দেয়া (কমপক্ষে ১ টাকা) এবং বৎসরান্তে দশটাকা মূল্যের শেয়ার খরিদ করার ব্যাপারে প্রায় সকলের মধ্যে বিপুল আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে এবং গবেষণা চলাকালীন সময়ে তাদের ব্যক্তিগত গড় সঞ্চয়ের পরিমাণ (পুরুষ ৩৭৬ টাকা, মহিলা ৪৯৫.৫৮ টাকা) আমাদের কাছে অত্যন্ত সন্তোষজনক মনে হয়েছে। তবে, সদস্যদের জমাকৃত মূলধনের উপর কোন সুদের ব্যবস্থা না থাকার ফলে এ বিষয়ে সচেতন পুরুষদের মধ্যে (৩৫%) নিয়মিত সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমা দেবার ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে অনাগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছিল বলে প্রতীয়মান হয়েছে। গৃহীত ঋণ নির্দিষ্ট কিস্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দেবার ব্যাপারে প্রায় সকল উত্তরদাতাদের নিষ্ঠাবান এবং যত্নশীল বলে মনে হয়েছে। বর্তমান গবেষণার অধীনে মাত্র ২০.৩১% পুরুষ এবং ২১.৮১% মহিলা হয় আংশিক অথবা পুরোপুরিভাবে তাদের ঋণের টাকা সময় মতো পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছিলো বলে জানিয়েছে। দেশের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে বিত্তহীন সমিতির সদস্য এবং সদস্যবৃন্দ ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বলে আমরা মনে করি। সমিতির সাপ্তাহিক সভায় উপস্থিতির হার আমাদের উত্তরদাতাদের ক্ষেত্রে খুবই সন্তোষজনক প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমান গবেষণা চলাকালীন সময়ে ১৯৯১-৯২ সনের হাজিরা খাতা অনুসারে এই বৎসরে অনুষ্ঠিত মোট ৫০টি সাপ্তাহিক সভার ৪৬টিতে ৯০% মহিলা এবং ৭৮% পুরুষ উপস্থিত ছিল। সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে সদস্যদের মধ্যে পুরুষদের চেয়ে মহিলাদেরকেই আমরা বেশী যত্নশীল এবং আগ্রহী দেখতে পেয়েছি। বিত্তহীন সমিতিগুলোর মূল চালিকাশক্তি, প্রতিটা সমিতির সাধারণ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত ম্যানেজারদের সহযোগিতা এবং দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে উত্তরদাতাদেরকে আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা গেছে যে ২৪.৫৬% পুরুষ এবং ৩০.৫৮% মহিলার মতে তাদের ম্যানেজার খুবই

সহযোগিতা প্রদান করেছে, ৩৭.৫% পুরুষ এবং ৪৩.৬০% মহিলা জানিয়েছে যে তাদের ম্যানেজার মোটামুটি সহযোগিতা দিয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও মহিলা বিত্তহীন সমিতির ম্যানেজারের সহযোগিতা সম্পর্কে বেশী সমর্থন লক্ষ্যণীয়। গ্রামের একেবারে দরিদ্র শ্রেণীর সংগঠন হিসেবে বিত্তহীন সমিতির নথিপত্র সংরক্ষণ এবং যাবতীয় হিসাব রেজিষ্ট্রার সংরক্ষণ ব্যবস্থা খুবই সন্তোষজনক হবে এটা আশা করা খুব সমীচীন নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে স্থানীয় বি. আর. ডি. বি. অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শকবৃন্দ এবং হিসাব নিরীক্ষণ কর্মকর্তাবৃন্দের যথেষ্ট করণীয় থাকলেও আমাদের মাঠ পর্যবেক্ষণে তা ধরা পড়েনি। মাসিক বেতনভূক্ত এ সব পরিদর্শকবৃন্দের প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার করে প্রতিটা সমিতির কার্যক্রম তদারকী, প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান এবং নথিপত্র ও হিসাব সংরক্ষণ যথাযথভাবে করা হচ্ছে কিনা তা দেখবার কথা থাকলেও আমাদের উত্তরদাতারা এ ব্যাপারে খুবই হতাশাব্যঞ্জক তথ্য প্রদান করেছে। যেমন মাত্র ৫৪.৫% পুরুষ এবং ৩০% মহিলা জানিয়েছে যে ২/৩ মাসে একবার পরিদর্শকবৃন্দ তাদের সমিতি দেখতে এসেছে এবং প্রায় ৬০% মহিলা জানিয়েছে যে পরিদর্শকবৃন্দ কদাচিৎ তাদের কার্যক্রম তদারক করতে এসেছে। বি. আর. ডি. বি. কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনে এই অবহেলা বিত্তহীন সমবায় সমিতিগুলোর লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে এক বিরাট অন্তরায় বলেই আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। যাই হোক, উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন অসুবিধা এবং প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সমিতিতে যোগদানের পর থেকে বর্তমান গবেষণা চলাকালীন সময় পর্যন্ত মোট ৩-৮ বৎসরে উত্তরদাতাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কোন ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করলে ৬৫.৬২% পুরুষ এবং ৮৯.৯% মহিলা তাৎক্ষণিকভাবে হাঁ সূচক জবাব ব্যক্ত করে অপরদিকে তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি এমন উত্তরদাতা ছিল যথাক্রমে ৩৪.৩৭% এবং ১০.৯০% জন। এখানে প্রদত্ত তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিত্তহীন সমিতিগুলো থেকে সুফলভোগী উত্তরদাতাদের মধ্যে পুরুষের চাইতে মহিলাদের সংখ্যাই বেশী। বর্তমান গবেষণার জরিপ কার্য পরিচালনার সময়ে আমাদের সরেজমিন পর্যবেক্ষণেও এ সত্য-ধরা পড়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচনে সমিতির অবদানঃ

বি. আর. ডি. বি. প্রবর্তিত পল্লী দরিদ্র কর্মসূচীর আওতাধীন বিত্তহীন সমিতি এবং মহিলা বিত্তহীন সমিতিগুলো মূলতঃ গ্রামীণ দরিদ্র জনসাধারণের ভাগ্য উন্নয়নে তথা দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে এর কার্যক্রম শুরু করে। আর আমাদের বর্তমান গবেষণা নিবন্ধটি এ ক্ষেত্রে বিত্তহীন সমিতিগুলোর ভূমিকা সম্পর্কে একটি বস্তুনিষ্ঠ চিত্র তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই প্রণীত। পুঠিয়া থানার মোট ৮টি নির্বাচিত সমিতির কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে এবং এগুলোর মোট ১১৯ জন সদস্যের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা দারিদ্র্য দূরীকরণে সমিতিগুলোর প্রভাব সম্পর্কে জানার প্রচেষ্টা নিয়েছিলাম। এতদুদ্দেশ্যে আমরা গবেষণাধীন পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নির্ধারক কতগুলো বিষয় নির্বাচন করি এবং এসব বিষয়ে সদস্যদের জীবনে ইতিবাচক কোন

পরিবর্তন হয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করি। নির্বাচিত পরিবর্তন নির্দেশক বিষয়গুলো ছিলো– (১) আয়ের উৎস; (২) সদস্যদের গড় মাসিক আয়; (৩) জমির মালিকানা; (৪) বাড়ীতে পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা; (৫) গবাদি পশু–পাখীর মালিকানা; (৬) খাবারের মান এবং ধরন; (৭) ছোট পরিবার গঠনের মানসিকতা এবং (৮) স্বাবলম্বী হবার ক্ষেত্রে সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিশ্বাস। সমিতির সদস্য হবার পূর্বের অবস্থা এবং সমিতিতে অর্ন্তভূক্ত হবার ৩ – ৮ বৎসর পরের অবস্থার মধ্যে একটা তুলনার মাধ্যমেই আমরা এ ব্যাপারে একটা উপসংহারে পৌছবার চেষ্টা করেছি। (সারণী–১)।

উত্তরদাতাদের জীবনে পরিবর্তনের দিকগুলো তথ্যের ভিত্তিতে দেখানো হয়েছে। এই সারণীতে প্রদত্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে বিত্তহীন সমিতিগুলোর ভূমিকা সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় তা মোটামুটিভাবে নিম্নরূপঃ

(ক) বিত্তহীন সমিতির ১৫ জন সদস্য (২৩.৪৩%) এবং মহিলা বিত্তহীন সমিতির ২০ জন সদস্যা (৩৬.৩৬) জানিয়েছে যে, কেবলমাত্র সমিতিতে যোগদানের পর তারা একাধিক আয়ের উৎস খুঁজে পেয়েছে। তাদের প্রদত্ত তথ্য অনুসারে সমিতিতে আসবার পূর্বে তাদের প্রত্যেকের শুধুমাত্র একটি আয়ের উৎস ছিল।

(খ) উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উত্তরদাতা (পুরুষ ৩৪.৩৭%, মহিলা ৩৬.৩৬%) জানিয়েছে যে, তারা প্রত্যেকে সমিতির মাধ্যমে প্রাপ্ত ঋণ বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে ব্যবহার করে তাদের মাসিক আয় নয়শত টাকার উপরে তুলতে সক্ষম হয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, সমিতির অর্ন্তভূক্তির আগে তাদের গড় মাসিক আয় নয়শত টাকার অনেক নীচে ছিল।

(গ) নিজস্ব কোন বসতভিটা ছিল না এমন উত্তরদাতারা প্রায় সকলেই সমিতির সদস্য হবার পর বসত ভিটার মালিক হয়েছে। আমাদের উত্তরদাতাদের মতে এটা তাদের জীবনের বিরাট উন্নতি যা বিত্তহীন সমিতিতে এসে তারা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এ ছাড়া সমিতিতে আসবার আগে কখনই জমি বর্গা অথবা বন্ধকী রেখে আবাদ করতে পারেনি অর্থাৎ জমির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না এমন কিছু পুরুষ এবং মহিলা সদস্য জানিয়েছে যে, তারা ঋণের টাকা থেকে জমি বন্ধকী রেখে অথবা কখনোও হালচাষ কিনে বর্গা আবাদ শুরু করে এবং তা থেকে পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

(ঘ) যদিও বর্তমান গবেষণাকর্মটি পরিচালনার সময়ও উত্তরদাতাদের বাড়ীতে নিজস্ব পায়খানার ব্যবস্থা আদৌ সন্তোষজনক ছিল না তবুও ১৮.৭৫% পুরুষ এবং ৪০% মহিলা জানিয়েছে যে, বিত্তহীন সমিতিতে আসবার পরই তারা এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়ীতে কাঁচা পায়খানার ব্যবস্থা করেছে।

(ঙ) সদস্যদের মধ্যে ৫০% পুরুষ এবং ৬০% মহিলা সমিতিতে আসবার আগে থেকেই বাড়ীতে গবাদি পশুপাখী পালন করে আসছিলো। বিত্তহীন সমিতির সদস্য হবার পর গবাদি পশু পাখী

পালন করছে এমন উত্তরদাতার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়ে গেছে যা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে গবাদি পশু-পাখী পালন এবং এ থেকে পরিবারের আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনার দিকটি সদস্যরা সমিতির সঙ্গে জড়িত হয়ে বেশী উপলব্ধি করতে পেরেছে।

(চ) যদিও আমাদের উত্তরদাতাদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহ সমিতিতে আসবার আগেও লক্ষ্যণীয় ছিল তবুও ১৭.১৮% পুরুষ এবং ২৩.৬৩% মহিলা আমাদেরকে জানিয়েছে যে, সমিতিতে আসবার পর তারা এ ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হয়েছে এবং পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

(ছ) উপরোল্লেখিত বিষয়গুলো ছাড়াও জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিকে বিত্তহীন সমিতিগুলো উত্তরদাতাদের উপর লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে বলে আমাদের কাছে মনে হয়েছে। উন্নয়ন সম্পর্কিত ধারণালাভ এবং স্বনির্ভর হবার জন্য আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও নিজের পরিবার এবং পাড়া-প্রতিবেশীদের ছাড়িয়ে বর্হিসমাজের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ ও আন্তঃক্রিয়া, সঞ্চয়ী মনোভাব, বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তা ও উন্নয়নকর্মীদের সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমে নবতর জীবনবোধ তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতেই হবে এমনি একটা প্রতিজ্ঞার ছাপ আমরা প্রায় প্রতিটি সদস্যের মধ্যে লক্ষ্য করছি। সর্বোপরি ভালোভাবে খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার জন্য অর্থ উপার্জন করতে হবে আর অর্থ উপার্জনের জন্য কর্মের সংস্থান করতে হবে এমনি প্রত্যয় বিত্তহীন সমিতির সদস্য-সদস্যাবৃন্দ এই সমিতি থেকেই অর্জন করেছে।

উপসংহারঃ

বাংলাদেশে গ্রামীণ দারিদ্র্য সর্বজনবিদিত। সাম্প্রতিক কালে এটা একক কোন সমস্যা নয় উপরন্তু আরও অসংখ্য সমস্যার উৎস হিসেবে চিহ্নিত। সংগত কারণেই এ দেশের সকল উন্নয়ন প্রয়াস দারিদ্র্যের পটভূমিতেই পরিচালিত হচ্ছে। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, ১৯৬২-৬৩ সাল থেকে ৮০'র দশকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত সময়কালে দারিদ্র্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু ৮০'র দশকের শেষভাগে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। ১৯৮১-৮২ সালের পুষ্টি জরিপ অনুসারে বাংলাদেশে গড়পড়তা খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ১৯৬২-৬৩ সালের ৮৮৬ গ্রাম থেকে ১৯৭৫-৭৬ সালে ৮০৭ গ্রামে নেমে আসে এবং ১৯৮১-৮২ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৬৫ গ্রাম। একইভাবে ১৯৬২-৬৩ সালের গড়পড়তা ক্যালোরী গ্রহণের পরিমাণ ২৩০১ কি. ক্যা. থেকে ১৯৭৫-৭৬ সালের ২০৯৪ কি. ক্যা. তে নেমে আসে এবং ১৯৮১-৮২ সালে এর পরিমাণ ছিল ১৯৪৩ কি. ক্যা. (আহমদ এবং হোসেন ঃ ১৯৮১-৮২)। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশনের মতে (১৯৮৫-৯০) ১৯৮১-৮২ সালের গড়পড়তা ১৯৪৩ কি. ক্যা. ১৯৮৪-৮৫ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৯৫০ কি. ক্যা. এবং দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থানকারী ১৯৮১-৮২ সালের ৭৬%

গৃহস্থালী ১৯৮৪-৮৫ সালে ৬৪% এ নেমে আসে (জি.ও.বি. ১৯৮৫-৯০)। পরিকল্পনা কমিশনের মতে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর অধীনে খাদ্যশস্য বিতরণের ফলে (১৯৭৫-৮০ সাল পর্যন্ত গড়ে প্রতি বৎসর ১১.৯৭ লাখ টন এবং ১৯৮৪-৮৫ সালে ২১.৩৭ লাখ টন) এই অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। যেহেতু এ কর্মসূচীটি ছিল খুবই সাময়িক তাই সামগ্রিকভাবে কর্মসংস্থানের পরিবর্তন হয়নি। অধিকন্তু ক্রমবর্ধমান ভূমিহীনতা, জনসংখ্যার চাপ এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থাকে আরও শোচনীয় করেছে। আতিক রহমানের মতে, ফলশ্রুতিতে দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত কিছুটা কমে গেলেও খুবই গরীব জনসংখ্যার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে (রহমান, ১৯৮৮)। (সারণী-২)

নির্ভরযোগ্যতা এবং ব্যাপক ভিত্তিক উপাত্তের অপর্যাপ্ততার জন্য উপরে আলোচিত দারিদ্র্যের প্রবণতা নির্দেশক বিষয়গুলোর সঙ্গে আরও কিছু বিষয় যোগ করা যেতে পারে। বাংলাদেশে আপেক্ষিক দারিদ্র্য কেমন বেড়েছে তা গ্রামীণ বাংলাদেশে জাতীয় আয়ের বন্টন থেকে বোঝা যায় (সারণী-৩)।

এই সারণীতে দেখা যাচ্ছে ১৯৭৩-৭৪ সাল থেকে ১৯৮৫-৮৬ সাল পর্যন্ত জাতীয় আয়ের অংশীদারীত্বের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩০% গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শেয়ার বেড়েছে অপরদিকে সর্বনিম্ন ৩০% এর শেয়ার কমেছে। জাতীয় আয়ের পাশাপাশি গ্রামীণ বাংলাদেশের ভূমিহীনদের সংখ্যা বৃদ্ধির চিত্রটিও সেখানকার ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের প্রবণতাকে নির্দেশ করে (সারণী-৫)।

বাংলাদেশে গ্রামীণ দারিদ্র্য নিরসন কল্পে এ যাবত বহু পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে এবং বাস্তবায়নও করা হয়েছে। সমবায় আন্দোলন (Co-oparative Program), পল্লী পুনর্গঠন কর্মসূচী (Rural Reconstruction Program), পল্লী কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন কর্মসূচী (ভি. এ. আই. ডি), আকতার হামিদ খান প্রবর্তিত বিখ্যাত কুমিল্লা মডেল, মাহবুব আলম চাষী প্রবর্তিত 'স্বনির্ভর আন্দোলন', সরকারী উদ্যোগে গৃহীত 'শাহজালালের শ্যামল সিলেট', 'স্বনির্ভর রংপুর', 'স্বাবলম্বী ফরিদপুর', 'উর্বরা ময়মনসিংহ' এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের (বি.আর.ডি.বি) 'সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী', কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর পাশাপাশি ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংকের মতো এনজিওগুলো পল্লী উন্নয়ন এবং গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু গ্রামীণ সমাজ কাঠামো আজও অনড় এবং অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। ফলশ্রুতিতে, গ্রামীণ দারিদ্র্য নির্মূল আজও সম্ভব হয়নি। এ ব্যাপারে যে সত্যটি উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের কাছে ধরা পড়েছে তা হলো এনজিওদের কার্যক্রম বাদ দিলে উপরোক্ত সকল কর্মসূচীগুলো পরিচালিত হয়েছিল পল্লী উন্নয়নকে সামনে রেখে এবং বাস্তবক্ষেত্রে গ্রামের কৃষি জোতের মালিকরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব কর্মসূচীর ফলভোগ করেছে। গরীব জনসাধারণের ভাগ্যে যা জুটেছে তা একেবারেই নগন্য।

আসলে বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্যের এবং বঞ্চনার মাত্রা এতো বেশী যে, এর সমাধানের জন্য প্রয়োজন ব্যাপক আকারের আর্থ-সামাজিক নীতি এবং গ্রামের মানুষের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। এ পরিকল্পনা মোতাবেক গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণকে বিভিন্ন ধরনের আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যকলাপে জড়িত করার ব্যাপারটি প্রাধান্য পায়। আশার কথা যে, গত দু'দশক ধরে বাংলাদেশে যে সকল সরকারী এবং বেসরকারী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো এ লক্ষ্যেই পরিচালিত হচ্ছে। মোটামুটিভাবে এ কর্মসূচীগুলোকে দু'টো ভাগে আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন - (ক) বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী (Growth oriented program) এবং (খ) Target group oriented program. প্রথমোক্ত কর্মসূচীতে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে দরিদ্র জনসাধারণের পারিবারিক আয় বৃদ্ধির ব্যাপারটিকে প্রাধান্য দেয়া হয় আর যেহেতু গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আয় প্রধানতঃ কৃষি নির্ভর তাই কৃষি উন্নয়ন গ্রামীণ দারিদ্র্য নিরসনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখতে পারে বলে এখানে বিশ্বাস করা হয়। এখানে যে যুক্তি দেয়া হয় তা হলো কৃষি সম্প্রসারণের ফলে কৃষিশ্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বাড়বে একই সংগে শ্রমের মজুরীও বাড়বে। অপরদিকে উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি কৃষিপণ্যের মূল্যকে স্থিতিশীল রাখবে এবং গ্রামীণ দরিদ্রদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে। এ প্রক্রিয়ায় দরিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যার হারও কমতে থাকবে। সত্তর এর দশকে তাই কৃষি উন্নয়নকে সবচেয়ে বেশী অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছিল। গ্রাম পর্যায়ে বিভিন্ন কৃষক সংগঠন সৃষ্টি এবং উন্নত কৃষি প্রযুক্তি সরবরাহের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন এবং আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল। এটা প্রত্যাশা করা হয়েছিল যে, কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে গ্রামীণ সংগঠনগুলো নতুন প্রযুক্তির প্রসারণ এবং ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে খুব যত্নশীল হবে এবং এভাবে প্রথাগত trickle down প্রক্রিয়ায় কৃষির উন্নয়নের বা প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে দারিদ্র্য দূরীকরণও সম্ভব হবে। ময়মনসিংহ জিলার ৮টি নির্বাচিত গ্রামে পরিচালিত একটি গবেষণায় আলম (১৯৮৬) এ কর্মসূচীর ইতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন অপরদিকে এ ব্যাপারে সিদ্দিকী (১৯৮২) জগৎপুরে পরিচালিত গবেষণায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। Target group oriented program গুলো ১৯৮০'র দশকে গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করেছিল। এ কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল targeted গৃহস্থালীর মধ্যে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। ১৯৯০ সালের মধ্যে প্রায় ৮০ লক্ষ targeted গৃহস্থালীর মধ্যে এক তৃতীয়াংশ বিভিন্ন দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীর অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছিল। এ কর্মসূচীর মূল প্রস্তাবনাগুলো হচ্ছেঃ (ক) যেহেতু গ্রাম সম্প্রদায়গুলো বিভিন্ন স্বার্থকে কেন্দ্র করে নানা উপদলে বিভক্ত তাই সমগ্র সম্প্রদায়ের জন্য গৃহীত কোন কর্মসূচী গ্রামের গরীব

ও অপরাপর অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে উপেক্ষা করে থাকে, (খ) গ্রামের দরিদ্ররা নিরক্ষর এবং সম্পদহীন তাই তারা নিজেরা তাদের দারিদ্র্য মোচন করতে পারে না। এ কারণে সরাসরি দরিদ্রদের কাছে গিয়ে তাদেরকে সংগঠিত করে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হয়; (গ) দারিদ্র্য ও বেকারত্ব পরস্পর সম্পর্কিত। তাই দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং আয় বৃদ্ধির জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে; (ঘ) যেহেতু ক্রমবর্ধমান গ্রামীণ শ্রমশক্তির তুলনায় কৃষি খাত কর্মসংস্থানের জন্য খুবই সীমিত তাই দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীতে অকৃষিখাতে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কাজে দক্ষতা প্রশিক্ষণ, প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের ধারণা প্রদান ইত্যাদি বিষয়গুলো অর্ন্তভূক্ত করতে হবে; (ঙ) যেহেতু গরীবরা বিভিন্নমুখী বঞ্চনার শিকার তাই অর্থনৈতিক কার্যকলাপের পাশাপাশি স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, গৃহস্থালীর ব্যবস্থাপনা, প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়গুলো দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীতে থাকতে হবে। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীর মধ্যে বি. আর. ডি. বি.'র পল্লী দরিদ্র কর্মসূচী (আর. পি. পি), পল্লী সমাজ সেবা (আর. এস. এস) এবং ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক ইত্যাদির মতো প্রথমসারির এনজিওগুলো target group oriented program অনুসরণ করে আসছে।

১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বি. আই. ডি. এস) পরিচালিত এক গবেষণা প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, গ্রামীণ দরিদ্র কর্মসূচী (RPP) গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। ফরিদপুর জেলার ভাংগা উপজেলার তিনটি গ্রামের ১৫০টি পরিবারের ওপর পরিচালিত উক্ত গবেষণা প্রতিবেদনের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গ্রামীণ দরিদ্র কর্মসূচীর অর্ন্তভূক্ত ৫০টি পরিবারের মধ্যে বিত্তহীন সমবায় সমিতি ও বিত্তহীন মহিলা সমবায় সমিতির অর্ন্তভূক্ত পরিবারগুলো গরু-ছাগল ও হাঁস-মুরগী পালন (৪০%) হস্ত ও কুটির শিল্প (৩২%), মৎস্য চাষ (১৬%) এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায় (১২%) প্রভৃতি অকৃষিজ আয়-বৃদ্ধিমূলক কাজে তাদের মধ্যে বিতরণকৃত ঋণের টাকা বিনিয়োগ করেছে (সারণী-৫)। শতকরা ১৫ টাকা সুদে এই ঋণের গড় পরিমাণ হচ্ছে ৪২০.০০ টাকা, যা ১৬-১৭% সুদে অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় ঋণের গড় পরিমাণের (২০০০.০০) চেয়ে অনেক কম। গবেষণায় দেখা যায়, বিত্তহীন সমবায় সমিতি এবং বিত্তহীন মহিলা সমবায় সমিতিভূক্ত পরিবারগুলো পূর্বে চিকিৎসা, কন্যার বিবাহ ও বিভিন্ন সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের সময় অপ্রাতিষ্ঠানিক সূত্র থেকে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণে বাধ্য হতো; গ্রামীণ দরিদ্র কর্মসূচী তাদের এই অধিক সুদে ঋণ গ্রহণ অনেকটা হ্রাস করেছে (রহমান, ১৯৮৬)।

আবার আয় ও সম্পদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, বিত্তহীন সমবায় সমিতি ও বিত্তহীন মহিলা সমবায় সমিতিভূক্ত পরিবারগুলোর মাথাপিছু আয় সমিতি বহির্ভূত পরিবারগুলোর চাইতে অধিক

এবং প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রাপ্তির শতকরা হারও সমবায় সমিতি বহির্ভূত পরিবারগুলোর শতকরা হারের চাইতে অধিক। সবচাইতে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হচ্ছে গত পাঁচ বৎসরে কর্মসূচী বহির্ভূত পরিবারগুলোর বিক্রিত সম্পদের পরিমাণ কর্মসূচীভূক্ত পরিবারগুলোর বিক্রিত সম্পদের পরিমাণের চাইতে অধিক। তবে গ্রামীণ দরিদ্র কর্মসূচীর অর্ন্তভূক্ত হওয়ার পরেও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সম্পদ বিক্রি অব্যাহত থাকার বিষয়টি এই ইংগিত প্রদান করে যে, পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের গ্রামীণ দরিদ্র কর্মসূচী দারিদ্র্য সৃষ্টি ও স্থায়ীত্বের প্রক্রিয়াকে কিছুটা হ্রাস করলেও দারিদ্র্য মোকাবেলার জন্যে তা যথেষ্ট নয়।

১৯৮৭ সালে আলম (আলম, ১৯৮৮) গ্রামীণ ব্যাংক এবং বি. আর. ডি. বি'র পল্লী দরিদ্র কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত কিছু নির্বাচিত সমিতির উপর একটি মূল্যায়নধর্মী গবেষণায় দেখান যে, উভয় সংগঠনই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর এ গবেষণায় দেখা যায় যে ৫০% - ৮৬% সদস্য সমিতিভূক্ত হবার ফলে তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধনে সক্ষম হয়েছে। অপরদিকে, সমিতি বহির্ভূত বিপুলসংখ্যক উত্তরদাতা একই সময়ে তাদের পারিবারিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পরিবর্তে অবনতির কথা ব্যক্ত করেছে।

দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচী হিসেবে বি. আর. ডি. বি. এর বিত্তহীন সমবায় সমিতি গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য অকৃষিমূলক বা খামার বর্হিভূত আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে তাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। আমরা মাঠ পর্যবেক্ষণকালে দেখেছি যে, পুঠিয়া থানার বিত্তহীন সমিতিগুলো ২৫টি বিভিন্ন ধরনের আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত। মূলতঃ গ্রামীণ অর্থনীতিকে কৃষিবৃত্তের বাইরে বহুমুখীকরণের একটি প্রয়াস এখানে লক্ষ্যণীয়। যা হোক, আমাদের গবেষণায় এ ব্যাপারে খুব আশাব্যঞ্জক চিত্র দেখতে পাইনি। অধিকাংশ আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের পরিবৃদ্ধির সুযোগ খুব কম এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে এগুলো তেমন উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন আনয়নে ব্যর্থ হয়েছে। স্বল্পমেয়াদী ঋণ সুবিধা দরিদ্র পরিবারগুলোর পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে কিছু সহায়তা প্রদান করলেও সার্বিকভাবে দারিদ্র্য নির্মূলের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ নয়। সমিতিতে যোগ দেবার আগে সদস্যদের দরিদ্রসীমার নীচের অবস্থানটি ৩-৮ বৎসর সমিতির কার্যক্রম চালানোর পরও পূর্ব অবস্থাতেই রয়ে গেছে। উল্লেখযোগ্য যে অবদান বিত্তহীন সমিতি রেখেছে তা হচ্ছে এটা গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে 'স্বাবলম্বী' হবার একটা তাগিদ সৃষ্টি করেছে; তাদেরকে উন্নয়নমূখী করেছে। তবে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, নিয়মিত এবং পর্যাপ্ত ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে এ সমিতিগুলো একদিন পল্লী দারিদ্র্য নির্মূলে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আমরা মনে করি।

সারণী-১

নির্বাচিত সূচকের ভিত্তিতে বিত্তহীনদের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন

		BSS			MBSS		
Selected socio-economic aspect	Indicator of change	Before	After	Difference	Before	After	Difference
1.Source of income	more than one source	9 (14.06)	24 (37.05)	15 (23.43)	7 (12.72)	27 (49.09)	20 (36.36)
2.Average monthly income	above 900 tk. a month	5 (7.81)	27 (42.37)	22 (34.37)	9 (16.36)	29 (52.72)	20 (36.36)
3.Access to land	a) Ownership of homestead land	20 (31.25)	42 (65.62)	22 (34.37)	13 (23.63)	35 (63.63)	22 (40)
	b) Share cropping and land mortgaging	7 (10.93)	15 23.43)	8 (12.5)	6 (10.90)	14 (25.45)	8 (14.54)
4. Access to toilet facility	Having access	7 (10.93)	19 (29.68)	12 (18.75)	9 (16.36)	31 (75.18)	22 (40)
5. Livestock and poultry raising	Ownership of livestock and poultry	32 (50)	47 (73.43)	15 (23.45)	29 (52.72)	43 (75.18)	14 (25.44)
6. Food intake	Taking meal twice a day	7 (10.93)	20 (31.25)	13 (20.31)	9 (16.36)	24 (43.60)	15 (27.27)
7. Contraceptive behviour	Use of contraceptives	18 (28.12)	29 (45.31)	11 (17.18)	23 (41.81)	36 (65.45	13 (23.63)

সারণী - ২

গ্রামীণ বাংলাদেশে চূড়ান্ত (Absolute proverb) দারিদ্র্যের প্রবণতা

বৎসর	জনসংখ্যা
১৯৬৩-৬৪	৫.০
১৯৬৮-৬৯	২৫.০
১৯৭৪-৭৫	৪১.০
১৯৮০-৮১	৫৩.৬
১৯৮৪-৮৫	৫৩.৮
উৎসঃ মান্নান (১৯৮৯)	

সারণী-৩

গ্রামীণ বাংলাদেশের বিভিন্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জাতীয় আয়ের অংশীদারীত্ব (%)

আয়ের ভিত্তিতে জনগোষ্ঠী		১৯৭৩/৭৪	১৯৮১-৮২	১৯৮৫-৮৬
সর্বনিম্ন	৩০%	১২.৮	১২.৫	১২.৫
মধ্যম	৪০%	৩১.২	৩২.৭	৩১.১
সর্বোচ্চ	৩০%	৫৬.০	৫৪.৮	৫৬.৪

উৎসঃ বি বি এস (১৯৮৬)

সারণী-৪

বাংলাদেশে ভূমিহীনতার প্রবণতা, ১৯৫১-৮৮

বৎসর	ভূমিহীন গৃহস্থালীর শতকরা হার
১৯৫১	১৪.৩
১৯৬১	১৭.৭
১৯৭৭	৩৭.৬
১৯৮৩-৮৪	৪৮.৮
১৯৮৮	৫৬.৭

উৎসঃ মান্নান (১৯৮৯)

সারণী-৫

বিভিন্ন আয়-বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে বিত্তহীন সমবায় সমিতির ও মহিলা সমবায় সমিতি থেকে প্রাপ্ত ঋণের বিনিয়োগ

আয়-বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম	পরিবারের শতকরা হার	গড় পরিমাণ (টাকা)
কৃষি, পশুপালন ও হাঁস-মুরগীর চাষ	৪০.০	৪০৫.০০
হস্তশিল্প ও কুটির শিল্প	৩২.০	৩০০.০০
মৎস্য চাষ	১৬.০	৪৫০.০০
ক্ষুদ্র ব্যবসা ও অন্যান্য	১২.০	৭৫৮.০০
মোট	১০০.০০	৪২০.০০

সূত্রঃ Atiq Rahman, The Socio-Economic Disadvantages and Development Perspectives of the Poor in Bangladesh Agriculture, BIDS, 1986.

তথ্য নির্দেশ

Ahmad Q.K and Hossain, M. 1983 :
Nutrition Survey of Rural Bangladesh, 1981-82, INFS, University of Dhaka (mimeo).

Alam, J 1988 : *Organizing the Rural Poor and Its Impact: The Experiences of selected Non Governmental and Governmental Organizations in Bangladesh in Study on Cooperatives in Bangladesh* (Unpublished research report) UNDP: BGD/85/223, Dhaka.

BBS 1986 : *Household Expenditure Surveys, 1986*, Bangladesh Bureau of Statistics, Dhaka.

Government of Bangladesh 1988 :
Socio-Economic Indicators of Bangladesh, BBS, Dhaka.

1985-90 : *The Third Five year Plan*, Planning Commission, Dhaka.

Hossain, M., 1984 :
Credit for the Rural Poor. BIDS, Dhaka.

Hossain, Z. R. and Hossain, M. 1992 :
Re-Thinking Rural Poverty, A case for Bangladesh (eds.), BIDS, Dhaka.

Hye, Hasnat. A. 1986 :
Rural Poverty; The continuing challenge, *The Journal of Social Studies*, No. 32, April.

Karim, AHM Zehadul 1991 :
The Comilla Co-operative Approach: Its problems and prospects for a comprehensive Agrarian Development in Bangladesh" *Asian Profile*, vol. 19, No. 5, Oct. 1991.

Mannan, M. A. 1989 :
Rural Poverty in Bangladesh and its Alleviation - An Assesment of Selected Programms Unpublished Ph. d. Thesis submitted to IBS, R. U.

Rahman, AHM Mustafizur 1992:
Impact of Landless Cooperatives on Poverty Alleviation research report (mimeo.) 1992.

Rahman, Atiq 1986 :
"Proverty Alleviation and the Most Disadvantaged Groups in Bangladesh Agriculture" *Journal of the Institute of Development Studies*, Vol. XIV, No. 1.

Siddiqui, Kamal 1982 :
The political Economy of Rural Poverty in Bangladesh, NILG, Dhaka.

'সিডঅ' কনভেনশনঃ নারী অধিকার ও বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন

ঝরণা নাথ

সারসংক্ষেপ

এই প্রবন্ধে, মূলতঃ 'সিডঅ' (CEDAW) সনদে উল্লেখিত প্রধান ধারাগুলোর প্রেক্ষিতে বেগম রোকেয়ার লেখা থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করে নারী পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণ ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় বেগম রোকেয়ার অবদানের পর্যালোচনা করা হয়েছে। বেগম রোকেয়ার অসামান্য রচনাগুলো শুধুমাত্র সাহিত্য জগতের অমূল্য সম্পদ নয়, প্রতিটি লেখাই নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারী পুরুষের বৈষম্য দুর করে, নারীকে ব্যক্তি হিসাবে একই মর্যাদার অধিকারী হিসাবে সচেতন করার উদ্দেশ্যে লিখিত। আমরা বিস্ময়ের সংগে লক্ষ্য করি, প্রায় শতাব্দীকাল পরে ১৯৭৫ সনের ১৮ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত নারী পুরুষের সম অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ক সনদ বা কনভেনশনে 'সিডঅ' বর্ণিত ধারাগুলোর সংগে বেগম রোকেয়ার রচনাবলীর আশ্চর্যরকম মিল।

সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে একটি প্রধান অন্তরায় হচ্ছে নারী ও পুরুষে বৈষম্য। এই বৈষম্য দূরীকরণে এবং নারীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে এ বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে সচেষ্ট হওয়ার জন্য জাতিসংঘের পক্ষ থেকে ১৯৭৫ সালকে 'বিশ্ব নারী বর্ষ' হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এরপর ১৯৭৫ সালের ১৮ই ডিসেম্বর নারী ও পুরুষের সম অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে নারীর প্রতি সবধরণের বৈষম্যমূলক আচরণের অবসান ঘটানোর জন্য জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ক সনদ বা কনভেনশন (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) বা সংক্ষেপে CEDAW (সিডঅ)। বাংলাদেশ এই দলিল অনুমোদন করে স্বাক্ষর করেছে ১৯৮৪ সালের ৬ই নভেম্বর। (এই দলিলের কয়েকটি ধারা বাদ দিয়ে একে আংশিক অনুমোদন দেয় বাংলাদেশ)।

জাতিসংঘ 'সিডঅ' সনদে মোট ধারা ৩০টি। তারমধ্যে ১ হতে ১৬ ধারা নারী পুরুষের সমতা সংক্রান্ত; ১৭ থেকে ২২ ধারা 'সিডঅ'র কর্মপন্থা ও দায়িত্ব বিষয়ক এবং ২৩ হতে ৩০ ধারা 'সিডঅ'র প্রশাসন সংক্রান্ত। মানবাধিকার সম্পর্কিত সার্বজনীন ঘোষণায় উল্লেখিত আছে সকল মানুষ সমান মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কাজেই কোন প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ

নয়। নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকে একই অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের দাবীদার। এই প্রেক্ষাপটে নারী পুরুষের মানুষ হিসাবে মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নে অনেক ক্ষেত্রে সমাজ ও পরিবার প্রচলিত বিশ্বাস ও ধারণারও পরিবর্তন প্রয়োজন। সর্বস্তরের মানুষ 'সিডঅ'র অধিকার সম্পর্কিত ধারাগুলো সর্বতোভাবে অনুধাবন করলেই তা সমাজজীবনে বাস্তবায়িত করার কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব। রাষ্ট্রীয়ভাবে সাংবিধানিক আইন প্রয়োগে আন্তরিক প্রচেষ্টা একাজ সফল করতে সহায়তা দান করবে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতবর্ষে অনেক সমাজ চিন্তাবিদ ও সমাজ সংস্কারক নারীপুরুষের বৈষম্য দূরীকরণে ও নারী সমাজের দুর্গতি মোচনে সচেষ্ট ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত প্রমুখ সমাজ সংস্কারক ও নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে বাংলায় নবজাগরণের সাড়া জাগে। বিশেষ করে ব্রাহ্ম সমাজের পৃষ্টপোষকতায় নারীরাও শিক্ষা দীক্ষায়, সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে যেতে থাকেন। তাঁদের মধ্যে কৈলাসবাসিনী দেবী, নিস্তারিণী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, স্বর্নলতা ঘোষ, হেমাংগিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, তরু দত্ত প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিবাহের পূর্বে শিক্ষার সুযোগ পান নাই। বিবাহ পরবর্তীতে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত স্বামীর সাহচর্যে ও প্রেরণায় শিক্ষিত হন এবং সাহিত্য সংস্কৃতিতে যথেষ্ট অবদান রেখে যান। এই সময়ে ব্রাহ্ম, হিন্দু ও খৃষ্টান সমাজে কিছু মহিলা শিক্ষা দীক্ষায় অনেকটা এগিয়ে গেলেও মুসলিম সমাজে মহিলাদের আরবী উর্দু ব্যতীত শিক্ষা লাভের সুযোগ ছিল না।

এই সময়ে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ভূ-স্বামী মুসলিম পরিবারে বেগম রোকেয়ার জন্ম হয়। তাঁরা ছিলেন দুই ভাই ও তিন বোন। দুই ভাই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হন। বড় বোন করিমুন্নেছা গোপনে ভাই এর সহযোগিতায় বাংলা পড়তে শেখেন মাটিতে আঁক কষে। এই ঘটনা প্রকাশ হয়ে গেলে তাঁকে মাতামহের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় যাতে তিনি বাংলা লেখা পড়া শিখতে না পারেন। ১৪ বৎসর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। ৯ বৎসর পর মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে দুই শিশুপুত্র নিয়ে তিনি বিধবা হন।

বেগম রোকেয়াকেও একই নিয়মে মাত্র ৫ বৎসর বয়সে অবরোধবাসিনী হতে হয়েছিল। বাড়ীতে উর্দু ও আরবী শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হতো। বাংলা ও ইংরেজী পড়া নিষিদ্ধ ছিল। বেগম রোকেয়ার অদম্য উৎসাহের কারণে তাঁর বড় ভাই ইব্রাহিম সাবের সবার অলক্ষ্যে বোন রোকেয়াকে লেখাপড়া শেখাতে থাকেন। তাঁর বড় বোন করিমুন্নেছা বাল্যকালে বেগম রোকেয়াকে বাংলাভাষা শিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট সহযোগিতা করেন। পরবর্তীকালে বেগম রোকেয়া তাঁর 'মতিচুর' (দ্বিতীয় খন্ড) করিমুন্নেছার নামে এবং 'পদ্ম-রাগ' উপন্যাসটি তার শিক্ষাগুরু ভ্রাতা ইব্রাহিম সাবেরের নামে উৎসর্গ করেন।

বেগম রোকেয়ারও বিয়ে হয় আনুমানিক ১৬ বৎসর বয়সে বিহারের অন্তর্গত ভাগলপুরের সৈয়দ সাখাওয়াৎ হোসেনের সংগে। তিনি ইংরেজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত ছিলেন। স্ত্রীর বিদ্যানুরাগ দেখে তিনি সর্বতোভাবে তাঁকে বিদ্যাচর্চায় সহায়তা দান করেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট উদারমনা স্বামীর সাহচর্যে এসে বেগম রোকেয়া বিদ্যাচর্চা ও সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হন। সাখাওয়াৎ হোসেন ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তাঁদের দুটি সন্তানও ইহধাম ত্যাগ করে। বেগম রোকেয়া তাঁর স্বামীর দেওয়া দশ হাজার টাকা সম্বল করে মাত্র পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে ভাগলপুরেই নারী শিক্ষার জন্য একটি স্কুল স্থাপন করেন। স্বামীর স্মৃতি রক্ষায় স্কুলের নামকরণ করেন সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল। কিন্তু স্বামীর প্রথম পক্ষের কন্যা ও জামাতাদ্বারা উত্যক্ত হয়ে তিনি অগত্যা ভাগলপুর ছেড়ে কোলকাতায় ১৯১১ খৃঃ মাত্র আটজন ছাত্রী নিয়ে সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের ভিত্তি স্থাপন করেন। এইভাবে একান্ত বিরুদ্ধ পরিবেশে থেকেও নারী শিক্ষা ও নারী জাগরণের জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করেন। বেগম রোকেয়া শুধুমাত্র সাহিত্য রচনা করে সুধী পাঠকবৃন্দের সাহিত্য পিপাসা নিবারণের চেষ্টা করেন নাই। তাঁর প্রতিটি লেখাই প্রধানতঃ নারীর সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নারী ও পুরুষ উভয়কেই সমাজে তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার উদ্দেশ্যে লিখিত। নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করে নারীকে একজন ব্যক্তি হিসাবে তার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি আন্তরিকতা ও সাহসের সংগে তাঁর মতামত প্রকাশ করে গেছেন। তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয়বহনকারী লেখাগুলো নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় ও নারী বৈষম্য দূরীকরণে এক বিশেষস্থান অধিকার করে আছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লেখা তাঁর রচনাগুলো এই শতাব্দীর শেষেও একই অর্থ বহন করে চলেছে।

তাই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মহিয়সী নারী বেগম রোকেয়ার নারী অধিকার ও নারী বৈষম্য সম্পর্কিত বিশ্লেষণাত্মক যুক্তিবাদী লেখাগুলো বর্তমানে জাতিসংঘের 'সিডঅ' সনদে উল্লেখিত নারী অধিকার সম্পর্কিত কনভেনশনের প্রেক্ষিতে পর্যালোচনার প্রয়াস এই প্রবন্ধে করা হয়েছে। এ যাবৎ 'সিডঅ' কনভেনশন উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে নারীদের শিক্ষার সুযোগ ও বিশেষ করে মুসলিম নারীদের অবস্থা এবং সেই সাথে বেগম রোকেয়ার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে যাতে বেগম রোকেয়াকে তৎকালীন সমাজ ও পরিবারের প্রেক্ষাপটে বোঝা সহজ হয়। বেগম রোকেয়ার বিভিন্ন লেখা থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করে নারী পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণে ও নারীকে ব্যক্তি হিসাবে তার অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেতন করে তোলার ব্যাপারে তার অবদানের উল্লেখ করা হয়েছে।

বেগম রোকেয়া তার বিভিন্ন লেখায় নানা উদাহরণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন নারী পুরুষের বৈষম্যের ফলে সমাজে উন্নতি সম্ভব নয়। নারী পুরুষ পরস্পর পরস্পরের সহযোগী হয়ে পাশাপাশি কাজ করে যেতে হবে। বেগম রোকেয়া তাঁর লেখা 'স্ত্রী জাতির অবনতি' প্রবন্ধে বলেছেন, "পুরুষের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে–একই। ..... কি আধ্যাত্মিক জগতে, কি

সাংসারিক জীবনের পথে সর্বত্র আমরা যাহাতে তাঁহাদের পাশাপাশি চলিতে পারি, আমাদের এরূপ গুণের আবশ্যক" (হোসেনঃ ২২) কিন্তু আজও পাশাপাশি চলারমত যোগ্যতা অর্জন করতে পারছেনা নারী সমাজ। তার কারণ একাধিক। পুরুষ শাসিত সমাজের পুরুষ সমাজকর্তাগণ কর্তৃক তৈরী আইন, সামাজিক নীতি, ধর্মীয় অনুশাসন এবং এর ফলস্বরূপ যুগ যুগ ধরে বঞ্চনার কারণে নারীদের নিজেদের একজন ব্যক্তি হিসাবে ভাবার অক্ষমতা। বেগম রোকেয়ার কথায়, "পুরুষ জাতি বলেন যে, তাঁহারা আমাদিগকে বুকের ভিতর বুক পাতিয়া বুক দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। ..... ফলতঃ তাঁহারা যে অনুগ্রহ করিতেছেন, তাহাতেই আমাদের সর্বনাশ হইতেছে। আমাদিগকে তাঁহারা হৃদয় পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া জ্ঞানসূর্যালোক ও বিশুদ্ধ বায়ু হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। তাহাতেই আমরা ক্রমশঃ মরিতেছি। .....বাস্তবিক অত্যাধিক যত্নে অনেক বস্তু নষ্ট হয়। যে কাপড় বহু যত্নে বন্ধ করিয়া রাখা যায় তাহা উই এর ভোগ্য হয়। কবি বেশ বলিয়াছেন–

'কেন নিভে গেল বাতি?
আমি অধিক যতনে ঢেকেছিনু তারে,
জাগিয়া বাসর রাতি
তাই নিভে গেল বাতি।'

সুতরাং দেখা যায় তাঁহাদের অধিক যত্নই আমাদের সর্বনাশের কারণ।" (হোসেনঃ১৪)

যে ব্যক্তি পরনির্ভরশীল এবং আত্মসচেতন নয় তার মুক্তি কিভাবে হবে? বেগম রোকেয়া প্রশ্ন করেছেন.... "কি করিলে আমরা দেশের উপযুক্ত কন্যা হইব? প্রথমতঃ সাংসারিক জীবনের পথে পুরুষের পাশাপাশি চলিবার ইচ্ছা অথবা দৃঢ় সংকল্প আবশ্যক এবং আমরা যে গোলাম জাতি নই, এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।" (হোসেনঃ২১) তার বক্তব্য... "একটি পরিবারের পুত্র ও কন্যায় যে প্রকার সমকক্ষতা থাকা উচিত, আমরা তাহাই চাই। যেহেতু পুরুষ সমাজের পুত্র, আমরা সমাজের কন্যা। আমরা ইহা বলিনা যে, কুমারের মাথায় যেমন উষ্ণীষ দিয়াছেন কুমারীর মাথায়ও তাহাই দিবেন। বরং এই বলি, কুমারের মস্তক শিরস্ত্রানে সাজাইতে যতখানি যত্ন ও ব্যয় করা হয়, কুমারীর মাথা ঢাকিবার ওড়নাখানা প্রস্তুতের নিমিত্ত ও ততখানি যত্ন ব্যয় করা হউক।" (হোসেনঃ ২১) 'স্ত্রী জাতির অবনতি' প্রবন্ধে বেগম রোকেয়া দেখিয়েছেন কিভাবে রমনীগণ ধীরে ধীরে মানসিক দাসত্বের (enslaved) স্বীকার হচ্ছেন। 'অর্ধাংগী' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন.... আশৈশব আত্মনিন্দা শুনিতেছি, তাই এখন আমরা অন্ধভাবে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করি এবং নিজেকে অতি তুচ্ছ মনে করি।" (হোসেনঃ৩৪) বেগম রোকেয়া নারীকে আত্মবিশ্বাসী হয়ে নিজের ক্ষমতার সদব্যবহার করার জন্য বারংবার যেন ধাক্কা দিয়ে সচেতন করাতে চাচ্ছেন। তাঁর মতে যদি একটি পরিবারকে একটি দ্বিচক্র বিশিষ্ট শকটের সংগে তুলনা করা হয় তবে "যে শকটের এক

চক্র বড় (পতি) এবং এক চক্র ছোট (পত্নী) হয়, সে শকট অধিক দূরে অগ্রসর হইতে পারে না, সে কেবল একই স্থানে (গৃহ-কোনেই) ঘুরিতে থাকিবে।" (হোসেনঃ ২৯) এই অবস্থায় দেশের উন্নতি সম্ভব নয়।

জাতিসংঘের 'সিডঅ' সনদে শিক্ষা ক্ষেত্রে সমান সুযোগের কথা বলা হয়েছে। বেগম রোকেয়াও বিশ্বাস করতেন মানুষ হিসাবে নিজের অবস্থান ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হলে তার প্রাথমিক শর্ত হলো শিক্ষিত হওয়া। আধুনিক যুক্তিবাদী শিক্ষাই একজন ব্যক্তিকে ব্যক্তি হিসাবে সচেতন করে তুলতে পারে। সেই যুগে মুসলিম নারীর শিক্ষা বিস্তারে তিনি প্রাণপাত করে চেষ্টা করেছেন। বহু প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছে। কিন্তু তিনি ছিলেন তাঁর সংকল্পে অটুট। তিনি শিক্ষাকে শুধুমাত্র চাকুরী লাভের পথ বলে মনে করেন নাই। তিনি বলেন, "শিক্ষার অর্থ কোন সম্প্রদায় বা জাতি বিশেষের 'অন্ধ অনুকরণ' নহে ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা (faculty) দিয়াছেন সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি (develop) করাই শিক্ষা। ঐ গুণের সদ্ব্যবহার করা কর্তব্য এবং অপব্যবহার করা দোষ। ..... যেখানে অশিক্ষিত চক্ষু কর্দম দেখে, সেখানে শিক্ষিত চক্ষু হীরা মানিক দেখে।" (হোসেনঃ ১৮) নারী শিক্ষার গুরুত্ব বুঝাইতে গিয়া তিনি 'অর্ধাংগী' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, "অনেকে বলেন, স্ত্রী লোকদের উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন নাই। মেয়েরা চর্বচোষ্য রাঁধিতে পারে, বিবিধ প্রকার সেলাই করিতে পারে, দুই চারিখানা উপন্যাস পাঠ করিতে পারে, ইহাই যথেষ্ট। আর বেশী আবশ্যক নাই। কিন্তু ডাক্তার বলেন আবশ্যক আছে। যেহেতু মাতার দোষগুণ লইয়া পুত্রগণ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়।" (হোসেনঃ ৩০) সুতরাং সংসারে স্বামীর সুখ দুঃখের অংশীদার হয়ে সুষ্ঠুভাবে সংসার পরিচালনা সর্বোপরি ভবিষ্যৎ বংশধরদের দেশ ও দশের জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে মায়ের ভূমিকা সর্বাগ্রে।

'সিডঅ'-র কনভেনশনে 'মাতৃত্ব'কে সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলা হয়েছে। শিশুর স্বার্থ মূখ্য বিবেচনায় এনে সন্তান পালনে পারিবারিক শিক্ষায় নারী পুরুষের অভিন্ন দায়িত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বতোভাবে সচেষ্ট হওয়ার প্রতিশ্রুতি আছে। মেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বেগম রোকেয়া মেয়েদের ব্যায়াম করার কথা বলেছেন। তিনি 'মতিচুর' প্রথমখন্ডে 'অর্ধাংগী' প্রবন্ধে বলেছেন, "যারা কন্যার ব্যায়াম করা অনাবশ্যক মনে করেন, তাঁহারা দৌহিত্রকে হৃষ্টপুষ্ট 'পাহলোয়ান' দেখিতে চাহেন কিনা? ..... যদি সেরূপ ইচ্ছা করেন, তবে বোধ হয়, তাঁরা সুকুমারী গোলাপ লতিকায় কাঁঠাল ফলাইতে চাহেন।" (হোসেনঃ ৩১)

সিডঅ কনভেনশনের ১৬ নং ধারায় বলা হয়েছে শিশুকালে বাগদান ও শিশু বিবাহের আইনগত কার্যকারিতা থাকবে না। বাল্যবিবাহ রোধকল্পে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ৬ই এপ্রিল কলিকাতা টাউন হলে স্বাস্থ্য ও শিশু প্রদর্শনীতে বেগম রোকেয়া একটি মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। শিশু পালনে নারীর

ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনাকালে তিনি বলেন, "কেবল শিশু রক্ষার চেষ্টা করলে কোন ফল হবে না–শিশুর মা'দের স্বাস্থ্যেরও যত্ন করা দরকার। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশ রক্ষার জন্য দুটি বিষয় দরকারী হয়ে পড়েছে দেখছি। প্রথম স্ত্রী শিক্ষার বহুল প্রচার, দ্বিতীয়, বাল্যবিবাহ রহিত করা। অর্থাৎ মেয়েদের বেশ করে পড়া–লেখা শিখতে হবে, যাতে তারা নিজের শরীরের যত্ন করতে শিখে; আর অল্প বয়সের ছেলে মেয়ের বিয়ে বন্ধ করতে হবে।..... শিশু রক্ষা করতে হলে আগে শিশুর মা'দের রক্ষা করা দরকার।.....মেয়েদেরও খাওয়া দাওয়ার একটু যত্ন করবেন। মেয়ের বিয়েতে অনেক টাকা খরচ করতে হয় বলে বেচারীদের শুকিয়ে মারবেন না। তারাই হচ্ছে ভবিষ্যৎ গৃহের গৃহিনী; তারাই হচ্ছে ভবিষ্যৎ বংশধরের জননী।" (হোসেনঃ ১৯৭) 'মতিচুর' দ্বিতীয় খণ্ডে 'সুলতানার স্বপ্ন' আখ্যানে ভগিনী সারা বলেছেন, পরীস্থানে "শিক্ষার বিমল জ্যোতিতে কুসংস্কার, অন্ধকার তিরোহিত হইতে লাগিল, এবং বাল্য বিবাহ প্রথাও রহিত হইল। একুশ বৎসর বয়সক্রমের পূর্বে কোন কন্যার বিবাহ হইতে পারিবেনা।" (হোসেনঃ ১২৮) সেই যুগে ২১ বৎসরের পূর্বে কোন কন্যার বিবাহ হতে পারবে না–এটা স্বপ্নে ভাবাও বাতুলতা ছিল। কিন্তু বেগম রোকেয়ার দুরদর্শিতার ফলেই এ ধরনের চিন্তা তিনি করতে পেরেছিলেন।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে 'সিডঅ' কনভেনশনে ১১ নম্বর ধারায় বলা আছে শরীক রাষ্ট্রসমূহ নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে সকল মানুষের মৌলিক কর্মসংস্থানের অধিকার, বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাসহ সমান পারিশ্রমিক, একই মানের কাজে একই মূল্যায়নের ব্যবস্থা করবে। এছাড়া ১৪নং ধারাতে পল্লী এলাকাতে পল্লী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ ও তাঁদের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা করবে। বেগম রোকেয়া চেয়েছেন মহিলারা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে যোগ দিয়ে তাঁদের নিজের পায়ে দাঁড়াক অর্থাৎ স্বাবলম্বী হবার জন্য সচেষ্ট হউক। 'স্ত্রী জাতির অবনতি' প্রবন্ধে বেগম রোকেয়া লিখেছেন, "পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদের যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডী–কেরানী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডী ম্যাজিষ্ট্রেট, লেডী ব্যারিষ্টার, লেডী জজ সবই হইব। .... যে পরিশ্রম আমরা স্বামীর গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসা করিতে পারিব না?..... আমরা যদি রাজকীয় কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারি, তবে কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করিব। ভারতে বর দুর্লভ হইয়াছে বলিয়া কন্যাদায়ে কাঁদিয়া মরি কেন? কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কার্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জন করুক।" (হোসেনঃ ২১) তিনি ক্ষোভের সাথে এও লক্ষ্য করেন যে নিম্নশ্রেণীর পুরুষ ও স্ত্রীলোক একই কাজ করে পুরুষ যদি পায় দুই টাকা স্ত্রীলোক পায় এক টাকা।

পল্লী উন্নয়নেও নারী পুরুষের অংশ গ্রহণের কথা বেগম রোকেয়া বলে গেছেন। উত্তর বংগে বিশেষ করে রংপুরে এন্ডি চাষ করে এন্ডির কাপড় তৈয়ারীতে আগে গ্রামের মহিলারা নিয়োজিত থাকত। সেই কাপড় দেশের একটা বড় চাহিদা মিটত। বর্তমানে সেই শিল্প লুপ্ত হয়েছে। সেইজন্য দেশের

প্রধানতঃ পল্লী অঞ্চলের উন্নতির জন্য বেগম রোকেয়া 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে দেশীয় শিল্প বিশেষ করে "নারী শিল্পের পুনরুদ্ধারের কথা বলেছেন।" জেলায় জেলায় পাটের চাষ কম করিয়া তৎপরিবর্তে কার্পাসের চাষ প্রচুর পরিমাণে হওয়া চাই এবং চরকা ও এন্ডি সুতার প্রচলন বহুল পরিমাণে হওয়া বাঞ্ছনীয়। আসাম ও রংপুরবাসিনী ললনাগণ এন্ডি পোকা প্রতিপালনে তৎপর হইলে সমগ্র বঙ্গ দেশের বস্ত্র ক্লেশ লাঘব হইবে। পল্লীগ্রামে সুশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হওয়া চাই। গ্রামে গ্রামে পাঠশালা আর ঘরে ঘরে চরকা ও টেকো হইলে চাষার দারিদ্র ঘুচিবে।" (হোসেনঃ ২৪৩)

'পদ্ম রাগ' উপন্যাসের নায়িকা সিদ্দিকার আত্মসম্মান প্রখর। সিদ্দিকা বলেন, "তোমরা পদাঘাত করিবে আর আমরা তোমাদের পদলেহন করিব, সে দিন আর নাই।.....আমি আজীবন তারিনী ভবনের সেবা করিয়া নারী জাতির কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিব।..... আমি সমাজকে দেখাইতে চাই, একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারী জন্মের চরম লক্ষ্য নহে, সংসার ধর্মই জীবনের সার ধর্ম নহে।" (হোসেনঃ ৪১৪) অর্থনৈতিক দিক দিয়া নারীর স্বাবলম্বনকে তিনি নারীমুক্তির একটি প্রধান উপায় বলে মনে করেছিলেন। আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম নামক সমিতি গঠনের মাধ্যমেও বেগম রোকেয়া নিপীড়িত মহিলাদের জন্য অনেক কাজ করে গেছেন।

প্রতিটি মানব স্ব-মহিমায় মর্যাদার সংগে তার অধিকার পূর্ণভাবে ভোগ করে সমাজ ও দেশের তথা বিশ্বের উন্নয়ণ প্রচেষ্টায় শরীক হোক-এটাই সকলের কাম্য। জাতি সংঘও কয়েক দশক ধরে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ করে নারীদের পূর্ণ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে। বিস্ময়কর যে প্রায় একশ বছর আগে বেগম রোকেয়া ঐ সব লক্ষ্যকেই চিহ্নিত করেছেন এবং আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন নারী স্বাধীনতা ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায়। তিনি যুক্তি বুদ্ধি দ্বারা যা সত্য বলে জেনেছেন তাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তার চরিত্রে ও কর্মে যেমন ছিল মেধার প্রাখর্য তেমনি দৃঢ়তা। সেই জন্যই তিনি একজন ব্যতিক্রমী মহিলা, মহিয়সী নারী।

সহায়ক গ্রন্থ

১। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ঃ *রোকেয়া রচনাবলী*, আব্দুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী (২য় মুদ্রন) ১৯৮৪।

২। গোলাম মুরশিদ ঃ *সংকোচের বিহ্বলতাঃ আধুনিকতার অভিঘাতে বংগরমনীর প্রতিক্রিয়া*, বাংলা একাডেমী ১৯৮৫।

৩। মালেকা বেগম ঃ *বাংলার নারী আন্দোলন*, ইউনিভারসিটি প্রেস লিঃ ঢাকা ১৯৮৯।

৪। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ঃ *ইউনিফরম ফ্যামিলি কোড, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও আইন সহায়তা কমিটি*, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৯৩

৫। ইউনিসেফ ঃ *জাতিসংঘ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ*, জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) ঢাকা)।

জাতীয় বাজেট ১৯৯৫-৯৬ ও কতিপয় প্রস্তাবনা

এম. জয়নুল আবেদীন

১। ভূমিকা

Budgetary operations mainly include a Government's revenue raising and spending performance. Both the level and the composition of public expenditure directly or indirectly influence the economic activities of a country. So, it is very important for any country. In short, the national budget is a systematic statement of the anticipated income and expenditure of a financial year of a nation. জাতীয় বাজেট হল জাতীয় সরকারের আগামী অর্থবছরের প্রাক্কলিত / অনুমিত আয় ও ব্যয়ের বিধিবদ্ধ বিবরণ। এটি একটি জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। শুধু তাই নয়– এটি হল সুন্দর ভবিষ্যত রচনার শক্ত ভিত। জাতীয় অর্থনীতির সুষ্ঠু ও গতিশীল বিকাশের জন্যে বাজেট হল একটি উত্তম হাতিয়ার। জাতীয় আয়ের আকাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে ও এর যথাযথ বন্টনে, ভোগ নিয়ন্ত্রণে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বর্ধনে এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করার জন্যে বাজেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন কর আরোপের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব সংগ্রহ করা হয়। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা উচিৎ যে যাদের কর পরিশোধের ক্ষমতা নেই তাদের উপর যেন করের বোঝা না পড়ে। আবার সরকারী ব্যয় এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা উচিৎ যাতে করে তা থেকে সর্বাধিক সামাজিক উপকারিতা পাওয়া যায়, অপচয় রোধ হয়, উৎপাদনে ও বন্টনে সাফল্য বয়ে আনে এবং প্রয়োজনে যেন তাকে সম্প্রসারিত ও সংকোচিত করা যায়। অর্থাৎ রাজস্ব সংগ্রহ ও রাজস্ব ব্যয় করতে হবে অত্যন্ত দক্ষতা ও সুবিবেচনার সাথে।

বাজেট বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। সমন্বিত বাজেট, উদ্বৃত্ত বাজেট ও ঘাটতি বাজেট। একটি সরকার কোন ধরনের বাজেট প্রণয়ন করবেন তা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট দেশের বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থার উপর। মূলধনের সরবরাহ সীমিত বলে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে ঘাটতি বাজেটই অধিক পছন্দনীয় হয়ে থাকে। তবে এ ঘাটতি বাজেট কি সীমাহীন হতে পারে? নিশ্চয়ই নয়। সর্বাধিক ঘাটতি বাজেট ঐ পর্যন্ত হতে পারে যে পর্যন্ত হলে মুদ্রাস্ফীতির হার দুই ডিজিট না হয়ে এক ডিজিটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে অর্থাৎ ০ (শূন্য) থেকে ৯ (নয়) এর মধ্যে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এ নীতি মানা হয় না বলে মুদ্রাস্ফীতি যেমন বেড়ে যায় লাগামহীনভাবে তেমনি অর্থনীতিতে নেমে আসে ধ্বস ও অশনিসংকেত।

অর্থের টানাটানির কারণে বাংলাদেশ তার জন্মলগ্ন থেকেই ঘাটতি বাজেট করে এসেছে। এ ঘাটতি কখনো নিয়ন্ত্রণে ছিল আবার কখনো বেসামাল হয়ে পড়েছিল। এর সুবিধে এবং অসুবিধে দু'টোই রয়েছে। সে আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। আমরা উপরোক্ত ভূমিকা দিয়েই বাংলাদেশের ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরের বাজেটের উপর আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

২। এবারের বাজেট

বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরের বাজেটের মূল লক্ষ্যগুলো হলঃ (১) জিডিপি'র শতকরা ৬ ভাগ প্রবৃদ্ধি; (২) মূদ্রাস্ফীতি (৪%) ও বাজেট ঘাটতি সীমিত রাখা; (৩) স্বনির্ভরতা (৪৩%) বৃদ্ধি করা ও বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমানো; (৪) দেশীয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা (১৬%); (৫) দক্ষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা; (৬) বাংলাদেশের সম্পদ দক্ষ খাতে প্রবাহিত করা; (৭) জি.ডি.পি'তে কাঠামোগত পরিবর্তন আনা; (৮) শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া; (৯) পরিবেশ উন্নয়ন; (১০) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, দারিদ্র্য বিমোচন ও মহিলা উন্নয়ন; (১১) সমষ্টিক অর্থনৈতিক সংস্কার ও লিবারালাইজেশন ইত্যাদি।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যেগুলো বাস্তবায়নের জন্যে সরকার রাজস্ব খাতে ও উন্নয়ন খাতে নিম্নরূপ বরাদ্ধ রাখার ব্যবস্থা করেছেন।

সারণী -১

রাজস্ব ও উন্নয়ন বরাঁদ্ধ

(কোটি টাকায়)

খাত	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৪-৯৫	প্রবৃদ্ধি (%)
ক) রাজস্ব বাজেট			
১। আয়	১৫৪৫০	১৪২১০	৮.৭২
২। ব্যয়	১১০৭০	১০৩০০	৭.৪৭
৩। উদ্বৃত্ত	৪৩৮০	৩৯১০	১২.০২
খ) উন্নয়ন বাজেটঃ প্রাপ্তিঃ			
৪। উদ্বৃত্ত	৪৩৮০	৩৯১০	১২.০২
৫। বৈদেশিক অনুদান	৩৫৬৯	২৬২৫	৩৫.৯৬
৬। বৈদেশিক ঋণ	৪৪২২	৪৩৬৯	১.২১
৭। অভ্যন্তরীণ মূলধন বাজেটের নীট	৪৬৪	৪০২	১৫.৪২
৮। স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থার সম্পদ	১৫০	১৮২	(+) ১৭.৫৮
৯। টি.এ্যাণ্ড টি. বণ্ড	৪৩৫	২৩৫	৮৫.১০
১০। ব্যাংক ঋণ	–	৪৭০	–
মোট	১৩৪২০	১২১৯৩	১০.০৬

ব্যয়

১১। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী	১২১০০	১১১৫০	৮.৫২
১২। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী	৭০৫	৬৯০	২.১৭
১৩। বাঃ উন্নয়ন কর্মসূচী বহির্ভূত প্রকল্প ব্যয়	২০১	৮৯	১২৫.৮৪
১৪। খাদ্য ব্যয়	৪১৪	২৬৪	৫৬.৮১
মোট	১৩৪২০	১২১৯৩	১০.০৬

১৫। রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে মোট ব্যয়	২৪৪৯০	২২৪৯৩	৮.৮৭
১৬। সার্বিক বাজেট ঘাটতি (রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয় থেকে রাজস্ব আয় বাদে অর্থাৎ ১৫-১)	৯০৪০	৮২৮৩	৯.১৩

গত বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় রাজস্ব আয় শতকরা প্রায় ৯ ভাগ, রাজস্ব ব্যয় শতকরা ৭ ভাগের উপরে এবং উন্নয়ন বাজেট শতকরা প্রায় ১০ ভাগ বেশি। রাজস্ব ও উন্নয়ন খাত মিলে ব্যয় বাড়বে শতকরা প্রায় ৯ ভাগ এবং বাজেট ঘাটতি বৃদ্ধি পাবে শতকরা প্রায় ৯ ভাগ। রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে সরকারের মোট ব্যয় হবে ২৪,৪৯০ কোটি টাকা যা স্বাধীনতা পূর্ব ও উত্তরকালের মোট টাকার অংকের দিক থেকে সর্ববৃহৎ বাজেট। এই বাজেটে,প্রাক্কলিত / অনুমিত ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ৯০৪০ কোটি টাকা। এবারের উন্নয়ন বাজেটের শতকরা ৪৩ ভাগ যোগান দেওয়া হবে আভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে। এবারের বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচী বর্হিভূত প্রকল্প ব্যয় ও খাদ্য ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণী-২ এ খাতওয়ারী বরাদ্ধের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে যে গত বছর এবং এ বছর সর্বাধিক অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে শিক্ষা খাতে। তারপরে পরিবহন, জনপ্রশাসন, প্রতিরক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো, যোগাযোগ, কৃষি ও অন্যান্য বিষয়গুলো রয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য খাতগুলোতে মোট রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্ধের শতকরা হার উল্লেখ করা হল।

সারণী-২
খাতওয়ারী বরাদ্দের চিত্র

খাত	১৯৯৫-৯৬ এ মোট রাজস্ব ও উন্নয়ন বরাদ্দের শতকরা হার (%)	১৯৯৪-৯৫ এ মোট রাজস্ব ও উন্নয়ন বরাদ্দের শতকরা হার (%)ঃ সংশোধিতঃ
১। শিক্ষা ও ধর্ম	১৫.১৯	১৫.৪২
২। পরিবহন	১২.৩৫	১৩.৭৫
৩। জনপ্রশাসন	৮.৬১	৭.৮৭
৪। প্রতিরক্ষা	৭.৮৩	৮.১৭
৫। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা	৭.০৪	৭.০৮
৬। ভৌত পরিকল্পনা, পানি ও গৃহায়ণ	৫.৪৮	৪.৮৫
৭। পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান	৪.৯৩	৫.১৮
৮। বিদ্যুৎ	৪.৮৫	৫.৮১
৯। পানি সম্পদ	৪.২৭	৪.৩৩
১০। যোগাযোগ	৪.২০	৪.৩১
১১। কৃষি	৪.১২	৪.০৮
১২। পুলিশ ও বি.ডি.আর.	২.৯৮	৩.১৪
১৩। অন্যান্য	১৮.০১	১৬.০১
মোট	১০০.০০	১০০.০০

গত বছরের তুলনায় এ বছরে মোট বাজেট বরাদ্দের শতকরা হিসেবে বরাদ্দ বেড়েছে জনপ্রশাসন, ভৌত পরিকল্পনা, পানি ও গৃহায়ণ খাতে এবং অন্যান্য খাতে। এই প্রেক্ষিতে বরাদ্দ কমেছে পরিবহন, প্রতিরক্ষা, বিদ্যুৎ, পল্লী উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে।

৩। আলোচনা ও প্রস্তাবনাঃ

এখানে উল্লেখ্য যে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষার গুণগত মান কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে, শিক্ষা প্রশাসনে কতটা জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং শিক্ষাকে কতটা কর্মমুখী করা হয়েছে তা সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী তেমন কিছু বলেননি। ইতোমধ্যে বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপ এসব প্রশ্ন উপস্থাপন করে বলেছেন যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ দৈনিক গড়ে মাত্র ২ ঘন্টা ছাত্রদের সাথে কাটান যেখানে অন্যান্য দেশের শিক্ষকগণ ৫ ঘন্টা কাটিয়ে থাকেন। তাই শিক্ষাখাতে বরাদ্দ

বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষা প্রশাসনে সততা, দৃঢ়তা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করার জন্যে আমরা সুপারিশ করছি।

প্রতিরক্ষা খাতের ব্যয়ের সঠিক ব্যবহার নিয়ে ইতোমধ্যেই জাতীয় সংসদে প্রশ্ন উঠেছে। আমরা অবশ্যই আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করতে চাই। কিন্তু প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ের নামে দুষ্প্রাপ্য সম্পদের যেন অপব্যবহার না হয় সেদিকে অবশ্যই সরকারকে সতর্ক নজর রাখতে হবে।

কৃষিখাতে স্থবিরতা দূরীকরণের জন্যে আমরা এখাতে আরো বরাদ্ধ বৃদ্ধি করার সুপারিশ করছি। কৃষি অবকাঠামো ও কৃষি গবেষণা বৃদ্ধির জন্যে অবশ্যই বর্ধিত বরাদ্ধ প্রয়োজন। তার সাথে সাথে কৃষি গবেষণার ফলাফল কৃষকগণের নিকট সহজলভ্য করার ব্যবস্থা গ্রহণ করাও প্রয়োজন। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদি জোরদার করার জন্যে এখাতেও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা দরকার। অর্থ মন্ত্রী দাবী করেছেন যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২% থেকে ১.৮৭% এ নেমে এসেছে। এ নিয়েও অনেকের মনে সন্দেহ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করেও খাদ্য ঘাটতি কমানো যাবে না।

অর্থমন্ত্রী আরো উল্লেখ করেন যে, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে দ্বিমুখী কৌশল গ্রহণ করা হবে। (১) শুধু ধান উৎপাদনের পরিবর্তে অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন এবং (২) কৃষি উপকরণ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ। সাধারণভাবে ঋণের সুবিধে বৃদ্ধিকরণ এবং ২.৫ একর এর নীচে যাদের জমি রয়েছে তাদেরকে কম সুদে বিশেষ ব্যবস্থায় ঋণ দেয়ার ব্যবস্থাকরণ। এছাড়া মৎস্য ও পশু পাখির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে উন্নত জাতের পশুপাখি আমদানিকরণ ইত্যাদি। ট্রাকটরের উপর ৭.৫% শুল্ক ছাড়া সকল কৃষি উপকরণ থেকে শুল্ক তুলে দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। এটা প্রশংসনীয় উদ্যোগ-- তবে আমাদের প্রস্তাব হল সেচযন্ত্র, সার ও কীট নাশকের বর্তমান উচ্চ মূল্যের কারণে এবং কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আনার জন্যে এগুলোতে আগের মত সাবসিডি (৫% থেকে ১০%) প্রদান করা হউক। এর সাথে সাথে ভোজ্য তেল, লবণ, ডিজেল ও কেরোসিনের মূল্য কৃষক সমাজের স্বার্থেই কমানো হউক।

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বর্তমান ক্যাপাসিটি রয়েছে ২,৮৭৮ মেগাওয়াট। যদিও পুরাতন যন্ত্রপাতির কারণে প্রকৃত উৎপাদন হচ্ছে মাত্র ১,৯০০ মেগাওয়াট। দেশে বিদ্যুৎ ঘাটতি কতটা তা অর্থমন্ত্রী না বললেও আমরা তা প্রতিদিনই লোডশেডিং এর যাঁতাকলে পড়ে হাঁড়ে হাঁড়ে অনুভব করছি। কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতসহ সকল ক্ষেত্রে সরকারের জরুরী ভিত্তিতে কিছু একটা করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। এখানে আমি অর্থমন্ত্রীর বেসরকারীকরণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রস্তাব করতে চাই যে অন্তত সকল মেট্রোপলিটন সিটিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের দায়িত্ব আংশিক ব্যক্তিমালিকানায় আপাততঃ পরীক্ষামূলকভাবে ছেড়ে দিয়ে ফলাফলটা দেখা যেতে পারে। এছাড়া সকল খাতেই সম্পদ বরাদ্ধের পাশাপাশি সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করার জন্যে আমরা সুপারিশ করছি।

আগামী অর্থ বছরে সরকার কোন নতুন কর প্রস্তাব করেননি। পক্ষান্তরে আমদানী শুল্ক হ্রাস, নির্বাচিত পণ্যের উপর থেকে কর প্রত্যাহার ও আয়কর ক্ষেত্রে পরিবর্তনের জন্যে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হবে প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা। সরকার সর্বোচ্চ শূল্ক হার শতকরা ৬০ ভাগ থেকে কমিয়ে ৫০ ভাগ পুনঃনির্ধারণ করেছেন এবং ১,০২৮টি পণ্যের শুল্ক হর হ্রাস করেছেন। এতে শিল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন কাঁচামালের দাম কমবে বলে আশা করা যায়।

টি.ভি, ফ্রিজ, সেলাই মেশিন ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশের শুল্ক হার হ্রাসের ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভোক্তাগণের কিছুটা সুবিধে হবে বটে কিন্তু এতে করে দেশীয় ইলেকট্রনিক্স শিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাব হল দেশীয় ইলেকট্রনিক্স শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশের শুল্ক সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করা ও সরাসরি আমদানীকৃত পণ্যের উপর শুল্ক হার কিছুটা বৃদ্ধি করা। এখানে উল্লেখ্য যে, দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো যেন পণ্যের গুণগতমান রক্ষা করে তার প্রতি সরকারকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

কর বৃদ্ধি না করেও সরকার রাজস্ব খাতে বর্ধিত আয় ধরেছেন ১৫,৪৫০ কোটি টাকা। এ লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে না বলে আমাদের ধারণা। এছাড়া রাজস্ব ব্যয় ধরা হয়েছে ১১,০৭০ কোটি টাকা যা প্রয়োজনের তুলনায় কম বলেই মনে হয়। কারণ গত বছরের বাজেটে রাজস্ব ব্যয় ধরা হয়েছিল ৯,৯৪৮ কোটি টাকা কিন্তু সংশোধিত বাজেটে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১০,৩০০ কোটি টাকায়। আয় ব্যয়ের এই প্রাক্কলিত লক্ষ্য অর্জিত না হলে বাজেট ঘাটতি ৯,০৪০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে যার ফলে মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যাবে; যদিও অর্থমন্ত্রী বর্তমান বছরে মুদ্রাস্ফীতি ৪% বলে দাবী করেছেন তথাপি আমরা যারা নিয়মিত বাজারে যাতায়াত করি তাদের পক্ষে এ হিসেব মেনে নেওয়া সত্যিই কষ্টকর।

৪। উপসংহারঃ

সর্বোপরি অর্থমন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরে জিডিপি'র শতকরা ১৫ ভাগ বিনিয়োগ হওয়ার পরও জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ৫% এর মত। সেক্ষেত্রে আগামী বছরে জিডিপি'র শতকরা ১৬ ভাগ (যা অর্জন করার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে) বিনিয়োগ করে জাতীয় আয়ের ৬% অর্জন সম্ভব নাও হতে পারে।

প্রচলিত নিয়মে বর্তমান বাজেট নিঃসন্দেহে একটি ভাল এবং গণমুখী বাজেট। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে এটা কতটা কার্যকর হবে ও জনকল্যাণে আসবে তা বলা মুশকিল। তাছাড়া ব্যাপক দারিদ্র বিমোচনের কোন বৈপ্লবিক কর্মসূচী এ বাজেটে নেই বললেই চলে। তবুও এর সফল বাস্তবায়ন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সুদুর প্রসারী পরিবর্তন আনবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা এ বাজেটের সাফল্য কামনা করি।

IBS PUBLICATIONS

The IBS, established in 1974, is an advanced interdisciplinary centre for study and research on the history and culture of Bangladesh and such other subjects as are significantly related to the life and society of Bangladesh leading to M. Phil and Ph.D. degrees.

The IBS has a number of publications: Two annual journals, seminar volumes, books and monographs to its credit.

PUBLICATIONS

1. *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies* edited by S. A. Akanda, Vols. I-VI (1979-82); M. S. Qureshi, Vols, VII-XII (1983-89); S. A. Akanda, Vols, XIII - XV (1990-92); M. S. Qureshi, Vols XVI - XVIII (1995)
2. *Reflections on Bengal Renaissance* (seminar volume I) edited by David Kopf and S. Joarder (1977).
3. *Oitijya, Sangskriti, Shahitya* (seminar volume 3 in Bengali) edited by M. S. Qureshi (1979).
4. *Studies in Modern Bengal* (seminar volume 2) edited by S. A. Akanda (1981)
5. *The New Province of Eastern Bengal and Assam* (1905-1911) by M. K. U. Mollah (1981).
6. *Provincial Autonomy in Bengal* (1937-1943) (seminar volume 7) by Enayetur Rahim (1981)
7. *The District of Rajshahi: Its Past and Present* (seminar volume 4) edited by S. A. Akanda (1983).
8. *Tribal Cultures in Bangladesh* (seminar volume 5) edited by M. S. Qureshi (1984).
9. *Bankim Chandra O Amra* (seminar volume 6) by Amanullah Ahmed (1985)
10. Bangalir Atmaparichaya (seminar volume 7) edited by Safar A. Akanda (1991).
11. *Rural Proverty and Development Strategies in Bangladesh* (seminar volume 8) edited by Safar A. Akanda & Aminul Islam (1991).
12. *History of Bengal: Mughal Period*, Vol. I & Vol. II. by Abdul Karim.(1992, 1995)
13. *The Institute of Bangladesh Studies, an introduction*, (1994).
14. *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies: An up-to-date Index* by Md. Shahjahan Rarhi (1994)
15. *IBS Journal* Annual Review in Bangla edited by M. S. Qureshi; 1400 - I, 1401-2

For IBS Publications, please write to:

The Librarian
Institute of Bangladesh Studies
Rajshahi University
Rajshahi- 6205, Bangladesh.